যলযালা

www.Yqadri.blogspot.com

কলম সম্রাট

আল্লামা আরশাদুল কাদেরী

মুহাম্মদী কুতুবখানা

আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

যল্‌যালা

এ গ্রন্থে দেওবন্দী কিতাবাদির বিভিন্ন উদ্ধৃতি দ্বারা এটা প্রমান করা হয়েছে যে, যে সব বিষয়কে দেওবন্দী আলেমগণ নবী ও ওলীগনের শানে শিরক সাব্যস্ত করেন, সে সব বিষয়কে আপন বুযুর্গদের বেলায় একেবারে ঈমান ও ইসলাম সম্মত মনে করেন। এ গ্রন্থখানা অধ্যয়নে তাঁদের তওহীদবাদের সমস্ত জারিজুরি ফাঁস হয়ে যাবে।

মূলঃ কলম সম্রাট—
হযরাতুল আল্লামা আরশাদুল কাদেরী

অনুবাদঃ অধ্যাপক মুহাম্মদ লুৎফুর রহমান

মুহাম্মদী কুতুব খানা

৪২, শাহী জামে মসজিদ শপিং কমপ্লেক্স (২য় তলা)

আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

ফোন ঃ ৬১৮৮৭৪

প্রকাশনায়ঃ
নিশান প্রকাশনী
জামে মসজিদ মার্কেট,
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

প্রকাশকালঃ ১লা জানুয়ারী, ১৯৯৪ ইংরেজী।
২য় সংস্কারণ- ১লা জানুয়ারী ১৯৯৬ইং
পূনমুদ্রণ - ২ মার্চ ২০০০ইং
পূনমুদ্রণ - ৫ জানুয়ারী ২০০৩ইং
পূনমুদ্রণ - ৮ আগষ্ট ২০০৬ইং

হাদিয়াঃ সাদা ঃ ১৫০ টাকা
নিউজঃ ৯০ টাকা

কম্পোজঃ শাহ্ আমানত কম্পিউটার

সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত

মুদ্রণেঃ আনন প্রেস
ফিরিঙ্গীবাজার, চট্টগ্রাম।

www.Yqadri.blogspot.com

উৎসর্গ

শ্রদ্ধেয় আব্বাজান মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাইল সাহেবের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনার্থে গ্রন্থখানা তাঁরই নামে উৎসর্গ করলাম। বিগত ৪/৫/'৯২ ইং তিনি ইন্তেকাল করেন।

প্রকাশক—

অনুবাদকের কথা

উপমহাদেশের প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ হযরাতুল আল্লামা আরশাদুল কাদেরী বিরচিত 'যল্‌যালা' (ভূমিকম্প) একটি অনন্য ও ব্যতিক্রমধর্মী গ্রন্থ। গ্রন্থখানার কয়েক পাতা উল্টালেই নামকরণের স্বার্থকতা সহজে বুঝে আসবে। লিখক নিজেই বলেছেনঃ

"এ গ্রন্থখানার নাম 'যলযালা' রাখার সময় যলযালার ভাবার্থ আমার মনে সুস্পষ্টভাবে জাগরুক ছিল। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এ গ্রন্থখানা পাঠে ধ্যান ধারনা ও কল্পনা জগতে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবে, চিন্তাধারার পুরানো কাঠামো ভেঙ্গে পড়বে, দৃষ্টি ভঙ্গীর ভিত প্রকম্পিত হবে, অনুসৃত বিশ্বাসের ইমারতে ফাটল ধরবে এবং মনমানসিকতার পরিবর্তন ঘটবে।" (যল্‌যালা- ।

বাস্তবিকই নিরপেক্ষ মনে এ গ্রন্থখানা অধ্যয়ন করলে, প্রভাবান্বিত না হয়ে কেউ থাকতে পারে না। দেওবন্দী জমাতের জাদরেল সাংবাদিক ও সাহিত্যিক, দেওবন্দী জামাতের মুখপাত্র মাসিক তজল্লীর সম্পাদক জনাব আমের উসমানী গ্রন্থখানা পাঠ করে বলতে বাধ্য হয়েছেনঃ

"বিষয়টা নিঃসন্দেহে উদ্বেগজনক। লিখক এ রকম কক্ষনো করেননি যে, এদিক ওদিক থেকে ছোট খাটো বাক্যাংশ নিয়ে অভিযোগ তৈরী করেছেন, বরং পুরাপুরি ইবারত উদ্ধৃত করেছেন এবং নিজের থেকে কোন অর্থ করেন নি। যদিওবা আমি দেওবন্দী জমাতের সাথে সম্পর্ক রাখি, কিন্তু এটা স্বীকার করতে আমার কোন দ্বিধা নেই যে, আপন বুযুর্গগণের ব্যাপারে আমার জ্ঞান এ গ্রন্থ দ্বারা বৃদ্ধি পেয়েছে। আমি আশ্চর্যান্বিত! রদ কি ভাবে করা যায়: রদের কোন প্রশ্নই উঠে না। যত বড় যুক্তিবাদী হোক না কেন, এমন কি আল্লামা দাহর আসলেও সে সব অভিযোগ খন্ডন করতে পারবেনা যেগুলো এ গ্রন্থে বিভিন্ন দেওবন্দী বুযুর্গদের বেলায় উথাপন করা হয়েছে। আমি যদি সাধারণ লোকদের মত অন্ধ বিশ্বাসী ও ফেরকা পূজারী হতাম, তাহলে গ্রন্তের পয্যালোচনা না করে নিশ্চুপ থাকতে পারতাম। কিন্তু খোদা রক্ষা করুন, আমি ব্যক্তি পূজা ও দলীয় ভ্রান্ত ধ্যান ধারনা থেকে মুক্ত হয়ে সত্যকে সত্য বলা ফরয মনে করি এবং ত্য হচ্ছে এ গ্রন্থে দলীল - প্রমান সহকারে দেওবন্দী আলেমগনের বেলায় স্বজন প্রীতির যে অভিযোগসমূহ উথাপন করা হয়েছে, তা সঠিক।" (তজল্লী, দেওবন্দ)

দেওবন্দীদের প্রসিদ্ধ কিতাব আরওয়াহে সালাসা, তযকিরাতুর রশীদ, সওয়ানেহে কাসেমী, আশরাফুস সাওয়ানেহ ইত্যাদির নাম উল্লেখ করে আর এক জায়গায় তিনি (আমের উসমানী) লিখেনঃ

"সত্যিই অশ্লীল নোবেলও পাঠকদের ততটুকু ক্ষতি করতে পারে না, যতটুকু ওই কিতাব সমূহ দ্বারা হয়েছে। .....

আমার মতে আত্মরক্ষার জন্য একমাত্র পথ হচ্ছে, তকবিয়াতুল ঈমান, ফত্ওয়ায়ে রশিদিয়া, ফত্ওয়ায়ে এমদাদিয়া, বেহেশতী জেওর এবং হিফজুল ঈমানের মত কিতাবসমূহ চৌরাস্থায় রেখে যেন আগুন লাগিয়ে দেয়া হয় এবং সুস্পষ্টভাবে ঘোষনা করা হয় যে, ওগুলোর বিষয়বস্তু কুরআন সুন্নাহের বিপরীত।" (তজল্লী, দেওবন্দ)

শুধু আমের উসমানী নয়, আরও অনেকে এ গ্রন্থখানা পাঠ করে সত্যের সন্ধান পেয়েছেন। আশা করি, বাংলায় অনুদিত এ গ্রন্থখানা পাঠ করেও অনেকের টনক নড়বে এবং সত্য উপলব্ধি করতে সক্ষম হবেন।

উর্দু ভাষায় যে কয়েকটি কিতাব বহুল জনপ্রিয়তা লাভ করেছে, এর মধ্যে 'যলযালা' অন্যতম। আশা করি, বাংলা ভাষাভাষীদের কাছেও গ্রন্থখানা সমাদৃত হবে। লিখক যে মহত উদ্দেশ্য নিয়ে গ্রন্থখানা রচনা করেছেন, আল্লাহ তাআলা যেন তাঁর উদ্দেশ্য পূর্ণ করেন এবং আমাদেরকেও যেন হক কবুল করার তৌফিক দান করেন। আমীন।

অনুবাদক

সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
০ গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য	১
প্রথম পর্ব	
০ নাটকের প্রথম দৃশ্য	৩
দ্বিতীয় পর্ব	
০ নাটকের দ্বিতীয় দৃশ্য	১০
প্রথম অধ্যায়	
০ দারুল উলুম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা জনাব মওলভী মুহাম্মদ কাসেম নানুতুবী সাহেব প্রসঙ্গে	১২
দ্বিতীয় অধ্যায়	
০ দেওবন্দী জমাতের ধর্ম্মীয় নেতা জনাব মওলভী রশীদ আহমদ গাঙুহী সাহেব প্রসঙ্গে	৫০
তৃতীয় অধ্যায়	
০ দেবওন্দী জমাতের ধর্ম্মীয় নেতা জনাব মওলভী আশরাফ আলী থানবী সাহেব প্রসঙ্গে	৮৩
চতুর্থ অধ্যায়	
০ শেখে দেওবন্দ জনাব মওলভী হোসাইন আহমদ (মদনী) সাহেব প্রসঙ্গে	৯৮
পঞ্চম অধ্যায়	
০ হযরত মাওলানা হাজী এমদাদুল্লাহ সাহেব (মুহাজেরে মক্কী) প্রসঙ্গে	১১৩
ষষ্ঠ অধ্যায়	
০ অন্যান্যদের প্রসঙ্গে	১২০
০ বিবেকের রায়	১৬১

www.Yqadri.blogspot.com

গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য

বিস্‌মিল্লাহির রহমানির রাহিম

নাহমুদুহু ওয়া নুসাল্লী আলা রাসূলিহিল করীম

আমার এ গ্রন্থটি কোন একটি বিশেষ বিষয়ের উপর রচিত হয়নি বরং এটা একটি আবেদন, যা আমি জনতার আদালতে পেশ করেছি। আবেদনের বিষয়বস্তু হচ্ছে, পাক-বাংলা ভারতে অধিকাংশ মুসলমান নবী ও ওলীগণের ব্যাপারে এ আকীদা পোষণ করেন যে, আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রিয় নবী ও ওলীগণকে অদৃশ্য জ্ঞান এবং কোন কিছু উপলব্ধি করার বিশেষ ক্ষমতা দান করেছেন, যার বদৌলতে ওনাদের কাছে গোপন বিষয়সমূহ ও অপ্রকাশিত অবস্থাসমূহ জানা হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা তাঁদেরকে দুনিয়াবী কাজকর্মের উপরও হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতা দান করেছেন, যার বদৌলতে তাঁরা বিপদগ্রস্তদের সাহায্য এবং সৃষ্টিকুলের মকসূদ পূর্ণ করেন।

কিন্তু এ ব্যাপারে দেওবন্দী আলেমগণের বক্তব্য হচ্ছে, 'নবী ও ওলীগণের ব্যাপারে এ ধরণের আকীদা পোষণ করা শিরক ও কুফ্‌রী। আল্লাহ তাআলা ওলীদেরকে অদৃশ্য জ্ঞান দান করেননি এবং হস্তক্ষেপ করার কোন অধিকার প্রদান করেন নি। ওনারা (মাযাল্লা) একেবারে আমাদের মত অসহায়, অজ্ঞ ও সাধারণ বান্দা, খোদার ছোট-বড় কোন মখলুকের বেলায় যে এধরণের কোন ক্ষমতা স্বীকার করে, সে যেন খোদার গুণাবলীতে ওকে অংশীদার সাব্যস্ত করলো। এ রকম ব্যক্তি একত্ববাদের বিরোধী, ইসলামের অস্বীকারকারী এবং কুরআন হাদীছের বিরুদ্ধাচরণকারী।' দেওবন্দী আলেমদের এ ধারণা যদি কুরআন হাদীছ ভিত্তিক হয়ে থাকে, তাহলে যে কোন অবস্থায় সেটার উপর ওনাদের অটল থাকাটা উচিত ছিল, অর্থাৎ যে আকীদাসমূহকে ওনারা নবী ও ওলীগণের বেলায় শিরক মনে করে, ওগুলোকে সমস্ত মখলুকের বেলায় শিরক মনে করাটা উচিত ছিল। কিন্তু এটা কেমন স্বেচ্ছাচারিতা ও একত্ববাদ বিরোধী জঘন্য ষড়যন্ত্র যে একদিকে ওরা যেসব বিষয়সমূহকে কুরআন হাদীছের উদ্ধৃতি দ্বারা নবী ও

ওলীগণের বেলায় শিরক ও একত্ববাদের বিরোধী প্রমাণ করে, অন্যদিকে ওরা ওসব বিষয়গুলোকে আপন বুযর্গদের বেলায় সম্পূর্ণ ইসলাম সম্মত মনে করে।

এ গ্রন্থে উল্লেখিত বিষয়সমূহের মাধ্যমে মুসলিম জনতার আদালতে কেবল এ বিষয়ে নিরপেক্ষ রায় কামনা করছি, যে বিষয়সমূহকে দেওবন্দী আলেমগণ নবী ও ওলীগণের বেলায় শিরক সাব্যস্ত করে, তা যদি বাস্তবিকই কুরআন-হাদীছের আলোকে শিরক হয়ে থাকে, তাহলে ওরা স্বীয় বুযর্গদের বেলায় ওগুলো কেন জায়েয মনে করে? আর যদি কুরআন-হাদীছের আলোকে ওগুলো শিরক না হয়ে থাকে, তাহলে ওরা নবী ও ওলীগণের বেলায় ওগুলোকে কেন শিরক সাব্যস্ত করে?

এ গ্রন্থকে আমি দু'টি পর্বে বিভক্ত করেছি। প্রথম পর্বে দেওবন্দী কিতাবাদির বিভিন্ন উদ্ধৃতি দ্বারা এটা প্রমাণ করা হয়েছে যে, দেওবন্দীরা নবী ও ওলীগণের শানে অদৃশ্য জ্ঞান, হস্তক্ষেপ ও বিশেষ ক্ষমতার আকীদা পোষণ করাকে শিরক ও একত্ববাদের বিপরীত মনে করে এবং দ্বিতীয় পর্বে ওদের কিতাব সমূহের উদ্ধৃতি দিয়ে এটা প্রমাণ করা হয়েছে যে দেওবন্দী আলেমগণ স্বীয় আপন বুযর্গদের বেলায় অদৃশ্য জ্ঞান, হস্তক্ষেপ ও বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার বিশ্বাসকে শিরক ও একত্ববাদের বিপরীত মনে করে না। গ্রন্থখানা অধ্যয়ন করলে ওদের একত্ববাদের সমস্ত গোমর ফাঁস হয়ে যাবে।

আরশাদুল কাদেরী
১লা রবিউল আওয়াল
১৩৯২ হিজরী

বিঃ দ্রঃ উভয় পর্বে দেওবন্দী কিতাব সমূহের যতগুলো উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে, ওগুলো থেকে একটি উদ্ধৃতিও ভুল প্রমাণ করতে পারলে দশ হাজার টাকার (ভারতীয়) ঘোষণা দেয়া হলো।

প্রথম পর্ব

নাটকের প্রথম দৃশ্য

৩

দেওবন্দী জামাতের প্রথম ইমাম মওলভী ইসমাঈল সাহেব ফরমানঃ

(১) "যে এ কথা বলে যে খোদার পয়গম্বর বা কোন ইমাম বা বুযর্গ অদৃশ্যের বিষয় জানতেন এবং শরীয়তের সম্মানে মুখ দিয়ে বলতেন না, সে বড় মিথ্যুক এবং অদৃশ্যের বিষয় আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না।'' (তকবিয়াতুল ঈমান ২৭ পৃঃ)

(২) "কোন নবী, ওলী, ইমাম ও শহীদদের বেলায় কক্ষণো এ আকীদা পোষণ করবেন না এবং ওনাদের প্রশংসায় এ ধরণের কথা বলবেন না।" (তকবিয়াতুল ঈমান ২৬ পৃঃ)

(৩) " যে এ রকম দাবী করে যে আমার কাছে এমন কিছু জ্ঞান আছে, এর দ্বারা আমি যখন ইচ্ছে করি অদৃশ্য বিষয় জ্ঞাত হই এবং ভবিষ্যতের বিষয়সমূহ জেনে নেয়াটা আমার ক্ষমতাধীন, সে বড় মিথ্যুক, সে খোদায়ী দাবী করে এবং যে ব্যক্তি কোন নবী, ওলী বা জ্বিন, ফিরিশতা, ইমাম, ইমামজাদা, পীর, শহীদ, জ্যোতিষী, গণক, ভবিষ্যদ্বর্তা, ফালনামা বর্ণনাকারী, ব্রাহ্মণ ও ভূত-পরীকে এ রকম মনে করে এবং ওদের বেলায় এ রকম আকীদা রাখে, সে মুশরিক হয়ে যায়।" (তকবিয়াতুল ঈমান-২১ পৃঃ)

(৪) "এবং এ বিষয়ে (অদৃশ্য বিষয় না জানার বেলায়) ওলী, নবী, শয়তান এবং ভূত-পরীর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। (তকবিয়াতুল ঈমান-৮ পৃঃ)

(৫) "যে ব্যক্তি কারো নাম উঠ্‌তে-বসতে বলে থাকে এবং দূর ও কাছ থেকে আহবান করে ----- বা ওর আকৃতি ধ্যান করে এবং মনে করে যে, যখন আমি মুখে বা অন্তরে ওনার নাম লই বা ওনার আকৃতির অথবা কবরের ধ্যান করি, তখন ওখানে ওনার জানা হয়ে যায় এবং ওনার কাছে আমার কোন বিষয় লুকায়িত থাকতে পারে না এবং আমার যে অবস্থাদি অতিবাহিত হয়, যেমন অসুস্থতা, সুস্থতা, স্বচ্ছলতা ও অভাব, জীবন, মরণ, আনন্দ-বেদনা সব বিষয়ে সব সময়ে ওনার জানা থাকে এবং আমার মুখ থেকে যে কথা বের হয়, তিনি সব শুনেন এবং যে খেয়াল ও ধারণা আমার মনের মধ্যে আসে তিনি সব

বিষয়ে জ্ঞাত, এ সব কথা দ্বারা মুশরিক হয়ে যায় এবং এ রকম কথাসমূহ সবই শিরক--- যদিওবা এ বিশ্বাস নবী ও ওলীগণের বেলায় রাখা হোক বা পীর ও শহীদের বেলায়, বা ইমাম ও ইমামজাদার বেলায় অথবা ভূত পরীর বেলায় হোক, অথবা এ রকম মনে করে যে, এ বিষয়টা ওনাদের সত্বাগত বা খোদা প্রদত্ত। মোট কথা এ ধরণের বিশ্বাস দ্বারা সর্ব ক্ষেত্রে শিরক প্রমাণিত হবে। (তকবিয়াতুল ঈমান ১০ পৃঃ)

(৬) " এ বিষয়ে ওনাদের গর্ব করার কিছুই নেই যে, আল্লাহ সাহেব অদৃশ্য জ্ঞানের ক্ষমতা দিয়েছেন এর দ্বারা যখন ইচ্ছে অন্তরের অবস্থা জেনে নেয় অথবা যে অদৃশ্য বিষয়ের অবস্থা যখন ইচ্ছে করে জেনে নেয় যে, সে জীবিত আছে কিনা মরে গেছে বা কোন্ শহরে আছে অথবা যে কোন ভবিষ্যত বিষয়কে যখন ইচ্ছে করে জেনে নেয় যে, অমুকের ঘরে সন্তান হবে কিনা বা ওর ব্যবসায় লাভ হবে কিনা, যুদ্ধে জয়যুক্ত হবে, নাকি পরাজয়। এসব বিষয়সমূহে সকল বান্দা, বড় হোক বা ছোট হোক সমানভাবে অনবহিত ও অজ্ঞ।" (তকবিয়াতুল ঈমান-২৫ পৃঃ (সংক্ষিপ্তকরণ)

(৭) "আল্লাহ সাহেব পয়গম্বর (সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহে ওয়াসিহি ওয়াসল্লিম)কে বলেছেন, লোকদেরকে এটা বলে দিন যে, অদৃশ্য বিষয় আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ জানে না, ফিরিশতা, না মানুষ, না জ্বিন, না অন্য কেউ অর্থাৎ অদৃশ্য বিষয় জেনে নেয়াটা কারো ইখ্‌তিয়ারে নেই।"

(তকবিয়াতুল ঈমান ২৫ পৃঃ)

(৮) "সুতরাং তিনি (অর্থাৎ রসূলে খোদা (দঃ) ঘোষণা করেছেন যে, আমার কোন ক্ষমতা নেই, না কোন অদৃশ্য জ্ঞান। আমার ক্ষমতার অবস্থা হচ্ছে স্বীয় আত্মারও লাভ ক্ষতির অধিকারী নই, তাই অন্যদের কি আর করতে পারবো? আর অদৃশ্য জ্ঞান যদি আমার কব্জায় হতো, তাহলে প্রথমে প্রত্যেক কাজের পরিণাম জেনে নিতাম। অতঃপর যদি ভাল হলে এতে হাত দিতাম আর যদি মন্দ জানতে পারলে এর প্রতি পাও রাখতাম না। মোট কথা, কোন ক্ষমতা বা অদৃশ্য জ্ঞান আমার মধ্যে নেই এবং আমার মধ্যে কোন খোদায়ী দাবী নেই। কেবল পয়গম্বরীর দাবীদার। (তকবিয়াতুল ঈমান ২৪ পৃঃ)

(৯) যেটা আল্লাহর শান, সেখানে কোন মখলুকের অধিকার নেই। তাই সে ব্যাপারে আল্লাহর সাথে কোন মখলুককে শরীক করো না। সে যত বড় হোক না

কেন এবং যত নিকটতর হোক না কেন। উদাহরণ স্বরূপ এরকম বল না যে, আল্লাহর রসূল ইচ্ছে করলে অমুক কাজ হয়ে যাবে। কারণ দুনিয়ার সমস্ত কাজকর্ম আল্লাহর ইচ্ছায় হয়ে থাকে, রসুলের ইচ্ছায় কিছুই হয় না। বা কোন ব্যক্তি যদি জিজ্ঞাসা করে অমুকের মনে কি আছে বা অমুকের বিয়ে কবে হবে বা অমুক বৃক্ষে কতটি পাতা আছে বা আসমানে কত তারা আছে, তাহলে ওর জবাবে এরকম বল না যে আল্লাহ ও রসূলই জানেন। কেননা অদৃশ্য বিষয় আল্লাহই জানেন, রসূল কি জানে? (তকবিয়াতুল ঈমান-৫৮)

দেওবন্দী জমাতের ধর্মীয় নেতা মওলভী রশিদ আহমদ সাহেব গাঙ্গুহী লিখেনঃ

(১০) "যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলা জাল্লা শানুহু ব্যতীত অন্য কারো জন্য অদৃশ্য জ্ঞান প্রমাণিত করে--, সে নিঃসন্দেহে কাফির। ওর ইমামত, ওর সাথে সংশ্রব, মুহাব্বত ও সদ্ভাব সব হারাম। (ফত্‌ওয়ায়ে রশিদিয়া ২য় খণ্ড ১৪১ পৃঃ)

(১১) "অদৃশ্য জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ জাল্লা শানুহুর বৈশিষ্ট্য।" (ফত্‌ওয়ায়ে রশিদিয়া ১ম খন্ড ২০ পৃঃ)

(১২) "এবং এ ধরণের বিশ্বাস রাখা যে তাঁর (অর্থাৎ হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর অদৃশ্য জ্ঞান ছিল, সুস্পষ্ট শিরক।" (ফতওয়ায়ে রশিদিয়া ২য় খন্ড ১৪১ পৃঃ)

(১৩) "আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো জন্য অদৃশ্য জ্ঞান প্রমাণিত করা সুস্পষ্ট শিরক।" (ফতওয়ায়ে রশিদিয়া ৩য় খন্ড ১৭ পৃঃ)

(১৪) "যে ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী হওয়ার বিশ্বাসী, সে হানাফী ইমামদের মতে পরিপূর্ণভাবে মুশ্‌রিক ও কাফির।" (ফতওয়ায়ে রশিদিয়া ৩য় খন্ড ৪২ঃ)

(১৫) অদৃশ্য জ্ঞান আল্লাহ তাআলারই খাস বৈশিষ্ট্য। এ শব্দটা ব্যাখ্যা করে অন্যের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করাটা শিরকের সম্ভাবনা থেকে মুক্ত নয়। (ফত্‌ওয়ায়ে রশিদিয়া ৩য় খন্ড ৪৩ পৃঃ)

(১৬) যে ব্যক্তি রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহে ওয়া সাল্লামের জন্য অদৃশ্য জ্ঞান, যা হক তাআলারই বৈশিষ্ট্য, প্রমাণ করে, ওর পিছনে নামায দুরস্ত নয়। কেননা এটা কুফরী। (ফত্‌ওয়ায়ে রশিদিয়া ৩য় খন্ড ১২৫ পৃঃ)

(১৭) যেহেতু নবীগণের অদৃশ্য জ্ঞান নেই, সেহেতু ইয়া রসুলাল্লাহ্ বলাটা না জায়েয হবে। (ফত্‌ওয়ায়ে রশিদিয়া ৩য় পৃঃ)

দেওবন্দী জামাতের ধর্মীয় নেতা মওলভী আশরাফ আলী সাহেব থানবী লিখেনঃ

(১৮) কোন বুযর্গ বা পীরের ব্যাপারে এ বিশ্বাস রাখা যে আমাদের সব রকমের অবস্থার খবর ওর কাছে সব সময় থাকে (কুফর ও শিরক)। (বেহেশতি যেওর ১ম খন্ড ২৭ পৃঃ)

(১৯) কাউকে দূর থেকে ডাকা এবং এটা মনে করা যে ওনার জানা হয়ে যাবে। (কুফর ও শিরক) (বেহেশতি যেওর ১ম খন্ড ৩৭ পৃঃ)

(২০) অনেক বিষয়ে তাঁর (অর্থাৎ হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) একান্ত মনোযোগ ও চিন্তা ভাবনার পরও অজ্ঞাত থাকাটা প্রমাণিত আছে। ইফাকের ঘটনায় তাঁর চেষ্টা সাধনার কথা সীহাহ সিত্তায় বর্ণিত আছে। কিন্তু কেবল মনোনিবেশ করার দ্বারা প্রকাশিত হয়নি। (হিফজুল ঈমান ৭ পৃঃ)

(২১) "ইয়া শেখ আবদুল কাদের; ইয়া শেখ সোলায়মান" ওয়াজিফা পাঠ করা, যেমন সাধারণ লোকদের অভ্যাস, এরকম করার দ্বারা একেবারে ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যায়, মুশরিক হয়ে যায়। (ফতওয়ায়ে ইমদাদিয়া ৪ খন্ড ৫৬ পৃঃ)

দেওবন্দী জমাতের ধর্মীয় নেতা মওলভী আবদুশ শাকুর সাহেব কাকুরবী লিখেনঃ

(২২) হানফী ফিক্‌হ শাস্ত্রের নির্ভরযোগ্য কিতাব সমূহেও আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে অদৃশ্য জ্ঞানী মনে করা ও বলাকে নাজায়েয লিখেছে। বরং এ আকীদাকে কুফর অবহিত করেছে। (তুহফায়ে লাছানী ৩৭ পৃঃ)

(২৩) হানফীগণ স্বীয় ফিক্‌হের কিতাব সমূহে ওই ব্যক্তিকে কাফির লিখেছে, যে এ আকীদা পোষণ করে যে নবী গায়ব জানতেন। (তুহফায়ে লা ছানী ৩৮ পৃঃ)

(২৪) 'রসুলে খোদা (অর্থাৎ হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর ব্যক্তিত্বে আমরা অদৃশ্য জ্ঞানের গুণ বিশ্বাস করি না এবং যে বিশ্বাস করে, ওকে নিষেধ করি। (নাসরতে আসমানী ২৭ পৃঃ)

(২৫) "আমরা এটা বলি না যে, হুযুর (দঃ) গায়ব জানতেন বা অদৃশ্য জ্ঞানী ছিলেন। এবং এটা বলি যে, হুযুরকে গায়বের বিষয় সমূহের ব্যাপারে অবহিত করা হয়েছে। হানাফী মাযহাবের ফকীহগণ কুফরের প্রয়োগ এ গায়ব জানার উপর করেন, অবহিত হওয়ার উপর নয়। (ফত্‌হে হাক্কানী ২৫ পৃঃ)

দেওবন্দী জমাতের ধর্মীয় নেতা ক্বারী তৈয়ব সাহেব মুহতামিম দারুল উলুম দেওবন্দ লিখেনঃ

(২৬) "রসূল এবং রসূলের উম্মত ওই সীমা পর্যন্ত এক বরাবর যে উভয়ের অদৃশ্য জ্ঞান নেই।" (ফারান কা তাওহীদ নং ১১৪ পৃঃ)

(২৭) "হযরত নবী করীমের জন্য অদৃশ্য জ্ঞানের দাবী করা এবং তাও পূর্ণ জ্ঞান ও مَا كَانَ وَمَا يَكُوْنُ (যা হয়েছে ও হবে) এর জ্ঞানের শর্ত সহকারে শুধু দলীল ও সনদবিহীন নয় বরং দলীলের বিপরীত, কুরআনের বিরোধী এবং তাওহীদী শরীয়তের আদর্শের বিপরীত হওয়ার কারণে অগ্রাহ্য।" (তাওহীদ নং ১১৭ পৃঃ)

(২৮) مَا كَانَ وَمَا يَكُوْنُ (যা হয়েছে ও হবে) এর জ্ঞান আল্লাহর একটি বিশেষ গুণ। সৃষ্টিকূলের কেউ এটার সাথে সংশ্লিষ্ট হতে পারে না। (তাওহীদ নং- ১২৯ পৃঃ)

(২৯) কুরআন-সুন্নাহকে সামনে রেখে জ্ঞানের বিভাজন এ রকম হবে না যে, আল্লাহর জ্ঞান সত্বাগত এবং রসূলগণের জ্ঞান প্রদত্ত অর্থাৎ আকৃতিগত পার্থক্য সহকারে উভয়টা সমান। যেন একটি বাস্তব খোদা এবং অন্যটি রূপক খোদা।" (তাওহীদ নং-১২১ পৃঃ)

(৩০) এ আয়াত কিয়ামত পর্যন্ত এটাই ঘোষণা করতে থাকবে যে, তাঁর অদৃশ্য জ্ঞান ছিল না। এর অর্থ হচ্ছে, কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর ইলমে গায়ব হবে না। (তাওহীদ নং ১২৬ পৃঃ)

দেওবন্দী জমাতের ধর্মীয় নেতা মওলভী মনজুর নোমানী লিখেনঃ

(৩১) "যেভাবে খৃষ্টবাদের প্রতি মহব্বতের অন্তরালে ঈসার প্রতি খোদায়ীত্বের বিশ্বাস গড়ে উঠে ছিল এবং যেভাবে আহলে বায়তের প্রতি মহব্বতের নামে রাফেজীদের প্রসার ঘটেছিল, সে ভাবে নবীর মহব্বত ও ইশকে রিসালতের আবরণে অদৃশ্য জ্ঞানের বিষয়টাকেও গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে এবং নিরীহ সাধারণ

লোকেরা মুহাব্বতের বাহ্যিক দৃশ্য দেখে এটার প্রতি আস্থা রাখতেছে। (আল কুরআন শুমারা নং ৫ম ও ৬ষ্ট খন্ড ১১ পৃঃ)

(৩২) যেহেতু অদৃশ্য জ্ঞানের আকীদার এ মহব্বতের বিষ দুধের সাথে মিশ্রিত করে উম্মতের কণ্ঠনালিতে প্রবেশ করানো হচ্ছে, সেহেতু এটা ও সমস্ত গোমরাহকারী বিশ্বাসসমূহ থেকে অধিক মারাত্মক এবং মনোযোগের অভাবে যেগুলো মুহাব্বত ও বিশ্বাস দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়নি। (আল কুরআন শুমারা নং ৫, ৬ষ্ট খন্ড ১৩ পৃঃ)

(৩৩) "সহীহ বুখারী শরীফে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাদি আল্লাহ তাআলা আনহুমা) থেকে বর্ণিত, হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) ফরমায়েছেন, গায়বের চাবিসমূহ যেগুলো আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ জানেনা, ওগুলো হচ্ছে পাঁচটি বিষয়, যা সুরা লুকমানের শেষ আয়াতে বর্ণিত আছে- অর্থাৎ কিয়ামতের নির্দিষ্ট সময়, বৃষ্টিপাতের নির্দিষ্ট সময় যে কখন বৃষ্টিপাত হবে, مَا فِي الْأَرْحَامِ অর্থাৎ মহিলার পেটে কি আছে শিশু পুত্র, নাকি শিশু কন্যা, ভবিষ্যতের ঘটনাবলী, মৃত্যুর সঠিক সময়।" (ফত্‌হে বেরলী কা দিলকশ নয্‌যারা ৫৮ পৃঃ)

দেওবন্দী জমাতের ধর্মীয় নেতা মওলভী খলীল আহমদ সাহেব আম্বটুবী লিখেনঃ

(৩৪) "মৃত্যুর ফিরিশতা থেকে আফজল হওয়ার কারণে এটা অপরিহার্য হয় না যে, তাঁর জ্ঞান ও সমস্ত দুনিয়াবী বিষয় সমূহের ব্যাপারে মৃত্যুর ফিরিশতার বরাবর বা অধিক।" (বারাহিনুল কাতেয়া-৫২ পৃঃ)

(৩৫) "শেখ আবদুল হক রেওয়ায়েত করেন, "আমার (অর্থাৎ রসূলে খোদা) কাছে দেওয়ালের পিছনের জ্ঞানও নেই।" (বরাহিনুল কাতেয়া ৫১ পৃঃ)

(৩৬) বাহারে রায়েক, আলমগীরী, দুর্রে মুখতার ইত্যাদিতে উল্লেখিত আছে যে যদি কেউ হক তাআলা ও রসুল আলাইহিস সালামের সাক্ষ্যে বিয়ে করে, তাহলে রসুলে খোদার প্রতি অদৃশ্য জ্ঞানের বিশ্বাসের কারণে কাফির হয়ে যায়। (বারাহিনুল কাতেয়া ৪২ পৃঃ)

দেওবন্দী জমাতের বিভিন্ন নেতাদের উদ্ধৃতি সমূহঃ

(৩৭) ও সমস্ত লোকদের মগজ ধোলাই করা উচিত, যারা এ নিকৃষ্টতর ও নির্বোধসূলভ দাবী করে যে, রসুলুল্লাহর অদৃশ্য জ্ঞান ছিল। (আমের উছমানী, মাসিক তজল্লী, দেওবন্দ, সেপ্টেম্বর ১৯৬০ইং)

(৩৮) "খোদায়ীত্ব ও অদৃশ্য জ্ঞানের মাঝখানে এমন এক গভীর সম্পর্ক আছে যে, আদি যুগ থেকে মানুষ যে বিষয়ে খোদার অস্তিত্ব কল্পনা করেছে, এর সাথে এ ধারণা নিশ্চয় করেছে যে, তাঁর (আল্লাহ) কাছে সবকিছু সুস্পষ্ট এবং কোন জিনিস তাঁর থেকে লুকায়িত নেই।' (মওলানা মওদুদী, আল হাসনাত, রামপুর)

(৩৯) হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম উচ্চস্তরের পয়গম্বর ছিলেন। কিন্তু অনেক বছর পর্যন্ত তিনি তাঁর প্রিয় ও আদরের ছেলে ইউসুফ (আঃ) এর খবর জানতে পারেননি যে, তাঁর নয়নের মনি কোথায় আছে এবং কোন্ অবস্থায় আছে।" (মাহেরুল কাদেরী, ফারান কি তাওহীদ নং ১৩ পৃঃ)

(৪০) "যদি হুযুর অদৃশ্য জ্ঞানী হতেন; তাহলে হুদায়বিয়ায় হযরত উছমানের শাহাদতের গুজব শুনা মাত্র বলে দিতেন যে এ খবর ভুল, উছমান মক্কায় জীবিত আছে। সাহাবায়ে কিরামের এতবড় জমাতের কাছেও আসল ঘটনাটা কাশফ হলো না। (মাহেরুল কাদেরী, ফারান কা তাওহীদ নং ১৩ পৃঃ)

www.Yqadri.blogspot.com

দ্বিতীয় পর্ব

নাটকের দ্বিতীয় দৃশ্য

যদি সন্দেহ করার কোন সুযোগ দেয়া না হয়, তাহলে প্রথম পর্বে অদৃশ্য জ্ঞান, রূহানী ক্ষমতা এবং হস্তক্ষেপের বিষয়ে দেওবন্দী আলেমগণের যে ইবারত সমূহ উদ্ধৃত করা হয়েছে, ওগুলো পড়ার পর একজন সহজ-সরল ব্যক্তি এটা বিশ্বাস না করে থাকতে পারবে না যে রসুলে মুজতবা (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এবং অন্যান্য নবী ও ওলীগণের ব্যাপারে অদৃশ্য জ্ঞান, রূহানী ক্ষমতা ও হস্তক্ষেপের বিশ্বাস নিশ্চয়ই তাওহীদের বিপরীত এবং সুস্পষ্ট কুফর ও শিরক এবং অবশ্যই ওর মনে দেওবন্দী আলেমদের সম্পর্কে এ ভাল ধারনাটা সৃষ্টি হবে যে, ওরা তাওহীদবাদের সত্যিকার ঝান্ডাবাহী এবং কুফর ও শিরকের বিরুদ্ধে যুগের সবচে বড় মুজাহিদ।

কিন্তু আফসোস! আমি কোন্ শব্দগুলোর দ্বারা সেই গোপন রহস্যের আবরণ উন্মোচন করি, যার নীচে এক ভয়ানক ঝড়-তুফান লুকায়িত আছে। প্রথম দৃশ্যের আকর্ষণ ওই সময় পর্যন্ত বহাল থাকবে, যতক্ষণ দ্বিতীয় দৃশ্য দৃষ্টির অগোচরে থাকবে। মনে হচ্ছে পর্দা উন্মোচনের পর তাওহীদবাদের সমস্ত উৎসাহ উদ্দীপনা ভাটা পড়বে এবং থলের বিড়াল বের হয়ে আসবে।

তবে আসল চেহারার পর্দা উন্মোচনের আগে আপনার কম্পিত বুকের উপর হাত রেখে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে চাই। মনে করুন, যদি আপনার এ কথা জানা হয়ে যায় যে অদৃশ্য জ্ঞান থেকে শুরু করে রূহের ইখ্‌তিয়ার ও ক্ষমতা পর্যন্ত যেসব বিষয়ের উপর আস্থা রাখাকে দেওবন্দী জমাতের ধর্মীয় নেতাগণ রসূলে মুজতবা (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) ও অন্যান্য নবী ও ওলীগণের বেলায় কুফর, শিরক ও তওহীদের বিপরীত সাব্যস্ত করেছেন, সে সমস্ত বিষয়কে ওনারা আপন বুযর্গদের বেলায় জায়েয এবং স্বাভাবিক ব্যাপার বলে স্বীকার করে, তখন আপনার মনের অবস্থা কি রকম হবে?

এ আচরণকে আপনি কি ধর্মীয় ইতিহাসের সবচে বড় ধোঁকা বলে সাব্যস্ত করবেন না? এবং ওসব ব্যক্তিদের আসল চেহারা প্রকাশ পাওয়ার পর আপনার মনে যে চিত্রটা ভেসে উঠবে, তা কি সেসব রাজপথের ডাকাতদের থেকে কিছু ভিন্ন হবে, যারা চোখে ধূলি নিক্ষেপ করে পথিকের সর্বস্ব ছিনিয়ে নেয়?

যদি অবস্থার এ পরিবর্তন আপনার কাছে অস্বাভাবিক মনে না হয়, তাহলে জেনে নিন যে, যেটা আপনি বাস্তব মনে করেছেন, সেটা আসলে বাস্তব নয়, বরং সাময়িক ঘটনা মাত্র। আমার এ বক্তব্যের উপর যদি আস্থা রাখতে না পারেন, তাহলে মানসিকভাবে এক বিস্ময়কর পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুত হয়ে পৃষ্ঠা খুলুন এবং দেওবন্দী জামাতের ধর্মীয় নেতাদের ও সমস্ত ঘটনাবলী পড়ুন, যেগুলোতে তাওহীদের আকীদা এবং ইসলাম ও ঈমানের আলামত ব্যতীত সবকিছু আছে।

গায়ব জানার বিশ্বাস, মনের কল্পনার ব্যাপারে অবহিত হওয়া, হাজার হাজার মাইল দূরত্ব থেকে গোপন বিষয় সমূহের জ্ঞান, মায়ের পেটে কি আছে, বৃষ্টি কখন হবে, আগামীকাল কি হবে, কে কখন মারা যাবে, কার মৃত্যু কোথায় হবে, দেয়ালের পিছনে কি আছে, নিজের ইচ্ছা ও ক্ষমতা দ্বারা কাউকে মেরে ফেলা, আরোগ্যদান করা, বৃষ্টি প্রতিরোধ করা, বৃষ্টিপাত ঘটানো, সাহায্য সহযোগিতা করার জন্য এক মূহর্তের মধ্যে নিজ নিজ কবর থেকে বের হয়ে দূর দূরান্তে পৌছে যাওয়া, ধ্যান করার সাথে সাথে সামনে উপস্থিত হয়ে যাওয়া, সারা বিশ্বকে এক দৃষ্টিতে পরিবেষ্টন করে নেয়া, মসিবতের সময় সাহায্যের জন্য ডাকা, বিগত ও ভবিষ্যতের খবর দেয়া, এটা মনে করা যে, সব সময় আমাদের মনের অবস্থাসমূহের খবর রাখেন, এটা মনে করা যে ধ্যান করার সাথে সাথে অবহিত হয়ে যান ইত্যাদি ইত্যাদি এ গুলো হচ্ছে ও সমস্ত বিষয়সমূহ যে গুলোকে দেওবন্দীদের নির্ভরযোগ্য কিতাব সমূহে কেবল আল্লাহর গুণাবলী বলে স্বীকার করা হয়েছে এবং খোদা ভিন্ন অন্য কারো জন্য এমনকি রসূলে মুজতবা (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর ব্যাপারেও এ ধরণের বিশ্বাসসমূহকে কুফর ও শিরক সাব্যস্ত করা হয়েছে।

কিন্তু একান্ত বিস্ময় সহকারে এ জঘন্যতম সংবাদটা শুনুন যে, এসব খোদায়ী ক্ষমতা, এসব সুস্পষ্ট কুফর ও শিরক এবং এসব তাওহীদের বিপরীত বিশ্বাস সমূহ দেওবন্দী আলেমগণ বিনা দ্বিধায় নিজেদের বুযর্গদের বেলায় মেনে নিয়েছেন।

এ কিতাবটি ছয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত এবং প্রত্যেক অধ্যায়ে দেওবন্দী জমাতের বুযর্গদের ওই সমস্ত ঘটনাবলী ও অবস্থাদি সন্নিবেশিত করা হয়েছে, যেগুলো পাঠ করার পর আপনার মস্তিষ্কের শিরা-উপশিরা টনটন করে উঠবে এবং ওই সমস্ত তাওহীদবাদীদের সমস্ত জারি জুরি ফাঁস হয়ে যাবে।

প্রথম অধ্যায়

দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা জনাব মওলভী মুহাম্মদ কাসেম নানুতুবী সাহেব প্রসঙ্গে

এ অধ্যায়ে দেওবন্দী কিতাবাদি থেকে মওলভী মুহাম্মদ কাসেম নানুতুবী সাহেব সম্পর্কে ওই সমস্ত ঘটনাবলী ও বিষয়াদি একত্রিত করা হয়েছে, যেগুলোতে তাওহীদের আকীদার বিপরীত, স্বীয় মাযহাবের খেলাপ ও তাদের নিজ মুখে বলা কুফর ও শিরককে আপন বুযর্গদের বেলায় ইসলাম ও ঈমান সাব্যস্ত করার বিস্ময়কর নমুনাসমূহ প্রতিটি পৃষ্ঠায় ছড়িয়ে রয়েছে। এগুলো পড়ুন এবং ধর্মীয় ইতিহাসে প্রথমবারের মত ধোঁকাবাজির অদ্ভুত দৃশ্য অবলোকন করুন।

ঘটনা প্রবাহ

(১) মৃত্যুর পর মওলভী কাসেম নানুতুবীর স্বশরীরে দেওবন্দ মাদ্রাসায় আগমন

দেওবন্দ মাদ্রাসার মুহতামিম কারী তৈয়ব সাহেব বর্ণনা করেন, যে সময় মওলভী রফিউদ্দীন সাহেব মাদ্রাসার মুহতামিম ছিলেন, তখন দারুল উলুমের কয়েকজন শিক্ষকের মধ্যে কোন্দল সৃষ্টি হয়েছিল। পরবর্তীতে মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক মওলভী মাহমুদুল হাসান সাহেবও সেই কোন্দলে জড়িত হয়ে পড়েন এবং কোন্দল বিস্তার লাভ করে। এর পরবর্তী ঘটনা কারী তৈয়ব সাহেবের নিজের ভাষায় শুনুন। তিনি লিখেনঃ

"সে সময় একদিন ভোরে ফজরের নামাযের পর মাওলানা রফিউদ্দীন সাহেব রহমতুল্লাহে আলাইহে মাওলানা মাহমুদুল হাসান সাহেবকে স্বীয় কামরায় ডাকলেন (যেটা দারুল উলুম দেওবন্দে ছিল)। মাওলানা উপস্থিত হলেন এবং বন্ধ কামরার দরজা খুলে ভিতরে প্রবেশ করলেন। তখন তীব্র শীতের মৌসুম ছিল।

মাওলানা রফিউদ্দীন সাহেব রহমতুল্লাহে আলাইহে ফরমালেন, প্রথমে আমার এ তুলার তোষকটা দেখুন। মাওলানা তোষকটা দেখলেন, যেটা আর্দ্র এবং খুবই ভিজা ছিল। ফরমালেন, ব্যাপার হচ্ছে কিছুক্ষণ আগে মাওলানা নানুতুবী রহমতুল্লাহে আলাইহে স্বশরীরে (বাহ্যিক শরীরে) আমার কাছে তশরীফ এনে ছিলেন, যার ফলে আমি একেবারে ঘেমে গেছি এবং আমার তোষক ভিজে গেছে। তিনি এটা বলে গেছেন যে, মাহমুদুল হাসানকে বলে দিও, সে যেন ঝগড়ায় জড়িত হয়ে না পড়ে। অতএব, আমি এটা বলার জন্য ডেকেছি। মাওলানা মাহমুদুল হাসান সাহেব আরয করলেন, হুযুর! আমি আপনার হাতে তওবা করতেছি যে এর পর আমি এ ব্যাপারে কিছু বলবো না। (আরওয়াহে ছালাছা ২৪২ পৃঃ)

মওলভী নানুতুবী সাহেবের খোদায়ী হস্তক্ষেপ

এবার একটি নতুন তামাশা দেখুন। কারী সাহেবের এ বর্ণনার পার্শ্বে দেওবন্দী জমাতের নেতা মওলভী আশরাফ আলী থানবী সাহেবের নিজস্ব একটি নতুন টীকা সংযোজন করেছেন, যেখানে বর্ণিত ঘটনার ব্যাখ্যা করে তিনি লিখেছেন:

"এ ঘটনাটা ছিল রূহের আকৃতি ধারন। এটা দু'ধরণের হতে পারে। এক, এটা রূপক শরীর ছিল কিন্তু দেখ্‌তে বাহ্যিক শরীরের মত। দুই, রূহ স্বয়ং (শরীর গঠনের) মূল পদার্থের উপর হস্তক্ষেপ করে বাহ্যিক শরীর তৈরী করে নিয়েছে। (আরওয়াহে ছালাছা ২৪৩ পৃঃ)

দেখুন, এ ঘটনার সাথে কয়টি শিরকী আকীদা সংযুক্ত রয়েছেঃ প্রথমতঃ মওলভী কাসেম নানুতুবী সাহেবের শানে ইল্‌মে গায়বের বিশ্বাস। কেননা, ওনার কাছে যদি ইল্‌মে গায়ব বা অদৃশ্য জ্ঞান না থাকতো, তাহলে আলমে বরযখ বা কবরে ওনার কিভাবে খবর হয়ে গেল যে, দেওবন্দ মাদ্রাসায় শিক্ষকদের মধ্যে ভীষণ হাঙ্গামা হয়ে গেল। এমনকি মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক মওলভী মাহমুদুল হাসান সাহেবও এতে জড়িত হয়ে পড়েছে। তাই তিনি গিয়ে ওনাকে নিষেধ করাটা প্রয়োজন মনে করলেন।

আর ওনার রূহের হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতার কথা বলার অবকাশ রাখে না। থানবী সাহেবের মতে এ পার্থিব জগতে দ্বিতীয়বার আসার জন্য তিনি নিজেই

আগুন, পানি, বাতাস ও মাটি দ্বারা একটি মানুষিক শরীর তৈরী করেছেন এবং স্বয়ং সেই শরীরে প্রবেশ করে বাস্তব জীবনের অবিকল আচরণ ও চলন শক্তির ক্ষমতা ধারন করে সোজা দেওবন্দ মাদ্রাসায় চলে আস্‌লেন।

অনুধাবনের বিষয় হলো, যে মওলভী কাসেম নানুতুবী সাহেবের রূহের জন্য এ খোদায়ী ক্ষমতাসমূহ বিনা বাক্যে মওলভী রফিউদ্দীন সাহেব মেনে নিলেন; মওলভী মাহমুদুল হাসানও চোখ বন্ধ করে বিশ্বাস করেছেন এবং থানবী সাহেবের কথা কি আর বলা যায়, ওনিতো ওনাকে মানুষিক শরীরের সৃষ্টিকর্তাই সাব্যস্ত করেছেন, আর কারী তৈয়ব সাহেব পরবর্তীতে তা প্রচার করলেন।

এহেন অবস্থায় একজন সুস্থ বিবেকবান ব্যক্তি এটা চিন্তা না করে থাকতে পারেনা যে, যেসব হস্তক্ষেপ, অধিকার, অদৃশ্য জ্ঞান ও উপলব্ধির ক্ষমতাসমূহ সরওয়ারে কায়েনাত (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এবং তাঁর প্রিয়ভাজন আওলিয়া কেরামের ব্যাপারে মেনে নেয়াটা এরা কুফর ও শিরক মনে করে, সেগুলো স্বীয় মাওলানাদের বেলায় কিভাবে ইসলাম ও ঈমান সঙ্গত হয়ে যেতে পারে?

এ দ্বিমুখী নীতি দ্বারা কি সেই আসল ব্যাপারটা পরিস্ফুটিত হয় না যে, এদের কাছে কুফর ও শিরকের এ সমস্ত আলোচনা কেবল এ জন্য যে, নবী ও ওলীগণের মান সম্মানের বিপরীত যুদ্ধ করার জন্য এগুলোকে যেন হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা যায়। তা না হলে, তারা যদি তাওহীদের আকীদার ব্যাপারে সত্যিকার অতি জযবাধারী হতো, তাহলে আপন-পরের মধ্যে দ্বিমুখী নীতি অবলম্বন করতো না।

(২) আর একটি বিস্ময়কর ঘটনা

দেওবন্দী জমাতের প্রখ্যাত আলেম মওলভী মুনাজির আহসান গিলানী 'সওয়ানেহে কাসেমী' নামে মওলভী কাসেম নানুতুবী সাহেবের একখানা বড় জীবনী গ্রন্থ রচনা করেন, যেটা স্বয়ং দারুল উলুম দেওবন্দের তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত হয়।

তাঁর এ গ্রন্থে মওলভী মাহমুদুল হাসান সাহবের বরাত দিয়ে তিনি কোন এক ওয়াজকারী মাওলানার সাথে দেওবন্দ মাদ্রাসার একজন ছাত্রের এক অদ্ভুত

ও দুর্লভ মুনাজারার ঘটনা বর্ণনা করেছেন। দেওবন্দের সেই ছাত্র সম্পর্কে তাঁর বর্ণিত এ অংশটুকু বিশেষভাবে পড়া দরকার। তিনি লিখেনঃ

"তিনি পাঞ্জাবের কোন এক এলাকায় চলে গিয়েছিলেন এবং কোন এক গ্রামের মসজিদে লোকেরা ওনাকে ইমামতির সুযোগ দিলেন। গ্রামবাসীগণ ওনার প্রতি খুবই আকৃষ্ট হলেন এবং স্বাচ্ছন্দে জিন্দেগী অতিবাহিত করছিলেন। সে সময় কোন এক ওয়ায়েজী মওলভী সাহেব ঘুরতে ঘুরতে সেই গ্রামে এসে উপনীত হলো এবং ওয়াজ নসিহতের সিলসিলা শুরু করলো। লোকেরা ওনার কিছুটা ভক্ত হয়ে গেল। তিনি জানতে চাইলেন যে, এখানকার মসজিদের ইমাম কে? বলা হলো যে দেওবন্দের পড়ুয়া এক মওলভী সাহেব।

দেওবন্দের নাম শুনা মাত্র ওয়ায়েজী মাওলানা সাহেব তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলো এবং ফত্‌ওয়া দিয়ে দিল যে 'এতদিন পর্যন্ত যত নামায তোমরা এ দেওবন্দীর পিছনে পড়েছ, ওগুলো মোটেই আদায় হয়নি এবং যেমন ওদের বলার অভ্যাস, দেওবন্দী এ রকম, ওরা ওই রকম, এ রকম বলে, ওই রকম বলে, ইসলামের দুশমন, রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতি শত্রুতা পোষণ করে ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক কিছু বললো। গ্রামবাসী মুসলমানগণ খুবই মর্মাহত হলেন। কারণ, এ মওলভীর পিছনে অনর্থক টাকা পয়সা ব্যয় করলেন এবং নামাযগুলোও বরবাদ হলো। অতঃপর একটি প্রতিনিধি দল সেই নিরীহ দেওবন্দী ইমামের কাছে গেল এবং দৃঢ় ভাবে বললো যে, ওয়ায়েজী মাওলানা সাহেব যিনি আমাদের গ্রামে এসেছেন, তিনি যে অভিযোগগুলো উথাপন করেছেন, আপনি হয়তো ওগুলোর জবাব দিন অথবা বলুন আমরা আপনার সাথে কি আচরণ করতে পারি? বেচারার জীবনটাও হুমকীর সম্মুখীন হলো আর চাকুরীটা গেছে বলে ধরেই নিলেন। ইলমী যোগ্যতাও ওনার নগণ্য ছিল বিধায় ওনি ঘাবরিয়ে গিয়েছিলেন এবং মনে মনে ভাবছিলেন, আল্লাহ জানে, ওয়ায়েজী মাওলানা কত বড় জ্ঞানী? যুক্তি ও দর্শনের বড় বড় বুলি যখন আওড়াবে, তখন আমি বেচারা একজন সাদাসিধে মুল্লা ওনার সাথে কিভাবে মুনাজারা করতে পারি? তবুও তিনি বাধ্য। এটা ছাড়া আর কিবা উপায় আছে, ভয়ে ভয়ে মুনাজারার প্রতি সম্মতি দিলেন।

তারিখ, স্থান, সময় সব চূড়ান্ত হয়ে গেল। ওয়ায়েজী মাওলানা সাহেব মাথার উপর বড় লম্বা পাগড়ী পরে, কিতাবের বড় পুটলী নিয়ে ভক্তবৃন্দ সহ মজলিসে আগমন করলো।। এদিকে বেচারা দেওবন্দী ইমাম অসহায়, নিরূপায় ভীতসন্ত্রস্ত অবস্থায় আল্লাহ আল্লাহ করে সামনে এগিয়ে আসলেন। এরপর দেওবন্দী ইমামের মুখের কথা শুনুন, যা তিনি মুনাজারার পর বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, "মাওলানা ওয়ায়েজ সাহেবের সামনে আমি বসে গেলাম। এখনও তর্ক বিতর্ক শুরু হয়নি, হঠাৎ আমার পার্শ্বে একজন লোকের উপস্থিতি অনুভব করলাম, যাকে আমি চিনতে পারলাম না। সেও এসে আমার পার্শ্বে বসে গেলেন এবং আমাকে সেই অপরিচিত হঠাৎ আবির্ভূত ব্যক্তি বললেন, 'হ্যাঁ, আলোচনা শুরু কর এবং কক্ষনো ভয় কর না'। এতে মনের মধ্যে অসাধারণ শক্তি সঞ্চয় হলো।

এরপর কি হলো? দেওবন্দী ইমাম সাহেব বর্ণনা করেন যে আমার মুখ থেকে এমন কিছু শব্দ বের হচ্ছিল এবং এমনভাবে বের হচ্ছিল যে আমি নিজেও জানতাম না যে আমি কি বলছি। মাওলানা ওয়ায়েজ সাহেব প্রথমে দু'একটার জবাব দিয়েছিল। কিন্তু প্রশ্নোত্তরের সিলসিলা বেশীদূর অগ্রসর হলো না, হঠাৎ দেখা গেল মাওলানা ওয়ায়েজ সাহেব উঠে এসে আমার পায়ের উপর মাথা রেখে কাঁদতেছিল, পাগড়ী এদিক সেদিক হয়ে গিয়েছিল এবং বলছিল–আপনি যে এতবড় আলেম আমি জানতাম না। আল্লাহর ওয়াস্তে আমাকে মাফ করে দিন। আপনি যা কিছু বলছেন, তাই শুদ্ধ ও সঠিক, আমি ভুলের মধ্যে ছিলাম।

এ দৃশ্য দেখে সমবেত সবাই হতবাক হয়ে গেল। কারণ, তারা কি ভেবে এসেছিল আর এখন কি দেখছে। দেওবন্দী ইমাম সাহেব বললেন, হঠাৎ আবির্ভূত ব্যক্তিটা এর পর আমার দৃষ্টি থেকে উদাও হয়ে গেলেন এবং কিছুই উপলব্ধি করতে পারলাম না যে, তিনি কে ছিলেন এবং এটা কি ধরনের ঘটনা ঘটলো।" (সওয়ানেহে কাসেমী ১ম খন্ড পৃঃ ৩৩০, ৩৩১)।

এ পর্যন্ত আসল ঘটনা বর্ণনা করার পর মওলভী মুনাজির আহসান গিলানী একটি একান্ত রহস্যময় ও বিস্ময়কর ঘটনা ব্যক্ত করেন। আসলে তাঁর বর্ণনার এ অংশটাই আমার আলোচনার মূল বিষয়। তিনি লিখেনঃ

"হযরত শায়খুল হিন্দ (মাওলানা মওলভী মাহমুদুল হাসান সাহেব) বলেছেন, আমি সেই ইমাম মওলভীকে জিজ্ঞাসা করলাম, হঠাৎ আবির্ভূত ব্যক্তিটার আকৃতি কি রকম ছিল? সে আকৃতি যা বর্ণনা করলো, তা আমি শুনছিলাম এবং হযরতুল উস্তাদ (মওলভী কাসেম নানুতুবী) এর এক একটি অংগ আমার চোখের সামনে ভেসে উঠছিল। যখন সে বর্ণনা শেষ করলো, তখন আমি ওকে বল্‌লাম ইনিতো হযরতুল উস্তাদ রহমতুল্লাহে আলাইহে ছিলেন, যিনি তোমার সাহায্যের জন্য হক তাআলার পক্ষ থেকে আবির্ভূত হয়েছিলেন।" (সওয়ানেহে কাসেমী ১ম খন্ড ও ২৩২ পৃঃ)

দেখুন, এ একটি ঘটনার মধ্যে মওলভী কাসেম নানুতুবীর বেলায় কয়টি শিরকী আকীদা পোষণ করেছেনঃ

প্রথমতঃ একান্ত খোলা মনে ওনার মধ্যে অদৃশ্য জ্ঞানের সেই ক্ষমতাটা স্বীকার করে নেয়া হলো, যার ফলে আলমে বরযখেই (কবরে) তাঁর জানা হয়ে গেল যে, এক দেওবন্দী ইমাম অমুক জায়গায় মুনাজারার ময়দানে একেবারে অসহায় অবস্থায় পতিত হয়েছে, গিয়ে ওর সাহায্য করা দরকার।

দ্বিতীয়তঃ ওনার বেলায় এ ক্ষমতাও স্বীকার করে নেয়া হয়েছে যে, তিনি স্বীয় দৃশ্যমান শরীর সহকারে স্বীয় কবর থেকে বের হয়ে যেখানে ইচ্ছে বিনা বাঁধায় যেতে পারেন।

তৃতীয়তঃ মৃত্যুর পর জীবিতদের সাহায্য করার ক্ষমতা দেওবন্দী আলেমদের মতে যদিও নবী ও ওলীগণের জন্যও প্রমাণিত নেই, কিন্তু আপন মওলানার জন্য নিশ্চয় প্রমাণিত আছে।

এবার আপনারাই বিচার করুন, উপরোক্ত আলোচনা থেকে কি এ ধারণটা বদ্ধমূল হয়না যে ওদের কাছে কুফর শিরকের এ সমস্ত আলোচনা কেবল এ জন্য যে এগুলোকে যেন নবী ও ওলীগণের মান-সম্মানের বিরুদ্ধে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা যায়। তা নাহলে আকীদায়ে তাওহীদের অতি উৎসাহী সমর্থক হলে, শিরকের বেলায় আপন ও পরের মধ্যে কেন এ তারতম্য করা হলো?

নিজ হাতে আপন মাযহাবের রক্তপাত

মনে হয় এ কাহিনীটা বর্ণনা করার পর মওলভী মুনাজির আহসান গিলানীর হঠাৎ স্মরণ হলো যে আমাদের এখানেতো নবীদের রূহের বেলায়ও জীবিতদের সাহায্য করার কোন ধারণা নেই বরং নিজেদের জমাতে এ ধরণের ধারণাকে শিরকী আকীদা আখ্যায়িত করা হয়। এত সুস্পষ্ট লাগাতার ও জোড়ালো অস্বীকারের পর স্বীয় মাওলানার বেলায় গায়বী সাহায্যের এ কাহিনী কিভাবে রচনা করা যাবে?

এটা চিন্তা করে, কাল্পনিক কাহিনী অস্বীকার করে স্বীয় মাযহাবের মান সম্মান রক্ষা করার পরিবর্তে তিনি আপন মাওলানার খোদায়ী ক্ষমতা প্রমাণ করার জন্য স্বীয় আসল মাযহাবকে অস্বীকার করলেন।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, কোন ফেরকার ইতিহাসে স্বীয় মাযহাবের বিরোধীতার এ ধরণের লজ্জাকর উদাহরণ সম্ভবতঃ পাওয়া যাবে না। ঘটনা বর্ণনা করার পর কিতাবের টীকায় তিনি যা লিখেছেন, তা বিস্ময়কর সহকারে পড়ুন, এবং নিজ হাতে আপন মাযহাবের রক্তপাতের দৃশ্য অবলোকন করুন। তিনি লিখেনঃ

> ওফাত প্রাপ্ত বুযর্গদের রূহসমূহ থেকে সাহায্য চাওয়ার মাসআলায় উলামায়ে দেওবন্দদের ধারণাও তা-ই, যা সকল আহলে সুন্নাত ওয়াল জমাতের রয়েছে। স্বয়ং কুরআনেই যখন রয়েছে যে ফিরিশতাদের মত রূহানী প্রাণী দ্বারা আল্লাহ তাআলা স্বীয় বান্দাদের সাহায্য করান।
>
> বিশুদ্ধ হাদীছ সমূহে বর্ণিত আছে যে, মেরাজের ঘটনায় রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সালাম হযরত মুসা আইলাহিস সালাম থেকে নামায কমানোর ব্যাপারে সাহায্য লাভ করেন। অন্যান্য নবীগণের সাথে সাক্ষাত হয়েছে এবং সুসংবাদ লাভ করেছেন। তাই অনুরূপ পবিত্র রূহসমূহ দ্বারা কোন বিপদগ্রস্থ মুমিনের সাহায্যের কাজ যদি আল্লাহ তাআলা আদায় করেন, তা কুরআনের কোন্ আয়াত বা কোন্ হাদীছের দ্বারা রদ হতে পারে? (টীকা, সওয়ানেহে কাসেমী ১ম খন্ড ৩৩৩ পৃঃ)

সুবহানাল্লাহ! সত্যের জয়ের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখুন, ওফাত প্রাপ্ত বুযর্গদের রূহসমূহ থেকে সাহায্যের বিষয়ে কাল পর্যন্ত যে প্রশ্ন আমরা ওদেরকে করতাম,

আজ সেই প্রশ্ন তারা নিজে নিজেকে করতেছে। এ প্রশ্নের উত্তর তো ওসব লোকদের জিম্মায় রয়েছে, যারা একটি নিখুঁত ইসলামী আকীদাকে কুফর ও শিরক আখ্যায়িত করে এর আসল চেহারাকে মুছে ফেলেছে, যার নমুনা কয়েক পৃষ্ঠা ব্যাপী 'প্রথম পর্বে' আপনারা অবলোকন করেছেন।

যা হোক, গিলানী সাহবের এ টীকা থেকে এ কথাটুকু নিশ্চয় স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, যারা ওফাত প্রাপ্ত বুযর্গগণের রূহ সমূহ থেকে সাহায্যে বিশ্বাসী, আসলে তারাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত। এখন ওদেরকে বেদাতী বলে ডাকাটা শুধু নিজেকে মিথ্যুক প্রতিপন্ন করা নয়, বরং নিজ মুখে ও কলমে নিজেকে হীনমন্য প্রমাণ করারও পরিচায়ক।

টীকার এ অংশটুকু বিস্ময়সহকারে পড়ার উপযোগী। তিনি বলেনঃ

> "এবং এটা সত্যই যে সাধারণভাবে মানুষ যে সাহায্যসমূহ অর্জন করছে, হক তাআলা স্বীয় সৃষ্টিকূলের দ্বারাই এ সাহায্যসমূহ পৌঁছাতেছেন। সূর্য থেকে আলো, গাভী ও মহিষ থেকে দুধ পাওয়া যায়। এটাতো একটি ঘটনা মাত্র। এটাকে অস্বীকার করার কি আছে?" (টীকা সওয়ানেহে কাসেমী –৩৩২ পৃঃ)

অস্বীকার করার কথা কি জিজ্ঞাসা করবেন, আপনাদের সাথে তো এটা নিয়ে দীর্ঘ অর্ধ শতাব্দী ধরে যুদ্ধ লেগেই আছে। আপনিতো যুদ্ধে আপনাদের ধরাশায়ী লাশসমূহ দেখতেছেন না। আপনার কলমের মাথায়ও এর রক্ত চিহ্ন রয়েছে।

টীকার শেষ প্রান্তে সত্যকে আর ধামাচাপা দিয়ে রাখা গেল না। লেখনীর আঁচড় থেকে যেন আওয়াজ বের হচ্ছে–বিনা যুদ্ধে আহলে হকের এ জয়ের জন্য মুবারকবাদ। টীকার সমাপ্তিলগ্নে তিনি ইরশাদ ফরমানঃ

> যাহোক বুযর্গগণের রূহসমূহ থেকে সাহায্য গ্রহণ আমরা অস্বীকার করি না। (টীকা সওয়ানেহে কাসেমী প্রথম খন্ড ৩৩৩ পৃঃ)

আল্লাহ আকবর, দেখলেন তো? সাজানো গল্পকে বাস্তব ঘটনার রূপ দেয়ার জন্য মাওলানা সাহেব কী যে নিষ্ঠুরতার সাথে স্বীয় মাযহাবের রক্তপাত করলেন। অর্ধ শতাব্দী ধরে যেটা সম্পূর্ণ জামাতের মূল আকীদা হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে, সেটা বাদ দিতে তিনি বিন্দু মাত্র ইতস্তত করলেন না।

বিশ্বাস ও কাজের মধ্যে লজ্জাষ্কর দ্বন্দ্ব

লজ্জা শরমের মাথা খেয়ে নিজস্ব বিশ্বাসের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করার তামাশা দেখুন। আলোচ্য 'সওয়ানেহে কাসেমী' কিতাবখানা দারুল উলুম দেওবন্দের বিশেষ ব্যবস্থাপনায় প্রকাশিত হয়, মুহতামিম কারী তৈয়ব সাহেব স্বয়ং এর প্রকাশক। নিজেদের প্রভাবিত মহলে কিতাবটির নির্ভরশীলতার ব্যাপারে কোন দিক দিয়ে সন্দেহ করার অবকাশ নেই। কিন্তু একান্ত বিস্ময়ের ব্যাপার যে, নানুতুবী সাহেবকে অতিমানব প্রমাণ করার জন্য দেওবন্দী জমাতের প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণ এমন একটি সুস্পষ্ট বাস্তব সত্যকে অস্বীকার করলো, যা এখন লুকাতে চাইলেও লুকাতে পারবে না। উদাহরণস্বরূপ ওফাত প্রাপ্ত বুযর্গগণের রূহসমূহ থেকে সাহায্য গ্রহণ করার বিষয়ে দেওবন্দী আলমগণের আসল মাযহাব কি, তা বুঝার জন্য দেওবন্দী মাযহাবের মূল কিতাব "তকবিয়াতুল ঈমান' এর এ অংশটুকু পড়ুনঃ

"মকসুদ, হাজত পুরা করা, মসীবত দূর করা, কষ্টের সময় সাহায্য করা, সংকটময় সময়ে উপস্থিত হওয়া ইত্যাদি আল্লাহরই শান, কোন নবী, ওলী, পীর, শহীদ, ভুতপরীর এটা শান নয়। যে ব্যক্তি কাউকে এ রকম প্রমাণ করে এবং ওর থেকে মকসুদ কামনা করে, এ ব্যাপারে নযর-নিয়ায করে, ওর মানত করে এবং মসীবতের সময় ওকে আহবান করে, সে মুশরিক হয়ে যায়.....

এবং হয়তো এ রকম মনে করলো যে ওসব কাজের ক্ষমতা ওর নিজস্ব বা এ রকম মনে করলো যে আল্লাহ তাআলা ওনাদের এরকম ক্ষমতা প্রদান করেছেন, যে কোন অবস্থায় শিরক প্রমাণিত হয়। (তকবিয়াতুল ঈমান ১০ পৃঃ আরমী প্রেস দিল্লী থেকে প্রকাশিত)

এটা হচ্ছে তাদের আকীদা বা বিশ্বাস যে, জীবিত বা মৃত নবী ও ওলীর মধ্যে মকসুদ, হাজত পূর্ণ করা, বিপদ দূরীভূত করা, কষ্টের সময় সাহায্য করা, কোন সঙ্কটময় মূহর্তে পৌছে যাবার সত্বাগত বা প্রদত্ত ক্ষমতা নেই। আর আমল বা ব্যবহারিক ক্ষেত্রে নানুতুবী সাহেব মৃত্যুর পর হাজতপূর্ণ করেছেন, বিপদ দূরীভূত করেছেন এবং মুশকিলের সময় এমন শান শওকতের সাথে পৌছেছেন যে সারা বিশ্বে খবর হয়ে গেল।

একটি বিষয়, যেটা সব জায়গায় শিরক ছিল, সবার জন্য শিরক ছিল, প্রত্যেক অবস্থায় শিরক ছিল, যখন নিজেদের মাওলানার কথা আসলো, তখন হঠাৎ ইসলাম হয়ে গেল, ঈমান হয়ে গেল এবং বাস্তব ঘটনা হয়ে গেল।

মনের একই আকীদা বা বিশ্বাস যতক্ষণ এর সম্পর্ক নবী ও ওলীর সাথে ছিল, তখন সম্পূর্ণ কুরআন এর বিপক্ষে, সমস্ত হাদীছ এর বিরোধী এবং সম্পূর্ণ ইসলাম এর বিপরীত হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। কিন্তু যখন সম্পর্ক বদল হয়ে গেল এবং নবী ও ওলীর জায়গায় নিজেদের মাওলানাদের কথা আসলো, তখন আপনারা দেখলেন, সম্পূর্ণ কুরআন এর সহায়তায়, সমস্ত হাদীছ এর সমর্থনে এবং সম্পূর্ণ ইসলাম এর আশ্রয় প্রদানে উৎসর্গিত হয়ে গেল।

آواز دو انصاف کو انصاف کہاں ہے ؟

(ইনসাফকে ডেকে জিজ্ঞাসা করুন, ইনসাফ গেল কোথায়?)

নিজেদের ভন্ডামীর নির্লজ্জ উদারহণ

আলোচনা প্রায় মাঝামাঝি পর্যায়ে এসে গেল। ওফাত প্রাপ্ত বুযর্গগণের রূহসমূহ থেকে সাহায্যের বিষয়ে দেওবন্দী জমাতের প্রসিদ্ধ তার্কিক মওলভী মনজুর সাহেবের একটি বিবৃতি পড়ুন, যেটা তিনি লক্ষ্ণৌ থেকে প্রকাশিত মাসিক "আল ফুরকানে' দিয়েছিল, যাতে এ বিষয়ে দেওবন্দী জমাতের আসল চিন্তাধারা আপনাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে যায়। তিনি লিখেনঃ

যে সব বান্দাদেরকে আল্লাহ তাআলা কোন এমন যোগ্যতা দান করেছেন, যদ্বারা অন্যদেরও উপকার ও সাহায্য করতে পারে, যেমন হাকীম, ডাক্তার, উকিল প্রমুখ, ওদের সম্পর্কে প্রত্যেকে এটা মনে করে যে ওদের মধ্যে কোন অদৃশ্য ক্ষমতা নেই, ওদের নিয়ন্ত্রণে বিশেষ কোন কিছু নেই এবং ওরাও আমাদের মতই আল্লাহর মূখাপেক্ষি বান্দা। তাই এতটুকু বলা যায় যে আল্লাহ তাআলা ওদেরকে এ পার্থিব জগতে এমন উপযোগী করেছেন, যেন আমরা ওদের থেকে অমুক কাজে সাহায্য নিতে পারি।

এ হিসেবে ওদের থেকে কাজ আদায় করা এবং সাহায্য গ্রহণ করার মধ্যে শিরকের কোন প্রশ্ন উত্থাপন হয় না। শিরক তখনই হয়, যখন কোন জীবকে খোদায়ী প্রতিষ্ঠিত এ বাহ্যিক আচরণ বিধি থেকে ভিন্ন অদৃশ্য ভাবে স্বীয় ইচ্ছা

ও ইখতিয়ার দ্বারা কার্য সম্পাদনকারী ও হস্তক্ষেপকারী মনে করা হয় এবং এ বিশ্বাসের ভিত্তিতে ওর থেকে হাজত সমূহে সাহায্য কামনা করা হয়। (আল ফুরকান, জমাদিলউলা ১৩৭২ হিজরী ২৫ পৃঃ)

উল্লেখ্য যে, দারুল উলুম দেওবন্দের কোন্দলের কাহিনী এবং মুনাজারার কাহিনীতে নানুতুবী সাহেব সম্পর্কে যে রেওয়ায়েত সমূহ উদ্ধৃত করা হয়েছে, ওই সমস্ত ঘটনায় বাহ্যিক আচরণ বিধি থেকে মুক্ত হয়ে অদৃশ্য ভাবেই ওদের সাহায্য ও হস্তক্ষেপের কথা প্রকাশ করা হয়েছে। তাই এটা শিরক হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

বিবৃতির উপসংহারটাও মনোযোগ সহকারে পড়ার মত বিষয়। কলমের আঁচড়ে কালির জায়গায় বিষ ঝরছে। তিনি লিখেনঃ

আপনারা মুসলমান নামধারী কবর পূজারী ও তাজিয়া পূজারীদেরকে দেখুন, শয়তান ও সমস্ত শিরকী কাজকর্মকে ওদের অন্তরে এমনভাবে বদ্ধমূল করে দিয়েছে, ওরা এ ব্যাপারে কুরআন-হাদীছের কোন কথা শুনতে রাজি নয়।

আমিতো ওই সমস্ত লোকদেরকে দেখে আগের উম্মতদের শিরক উপলব্ধি করি। যদি মুসলমানদের মধ্যে এ সমস্ত লোক না হতো, তাহলে সত্যিই আমার পক্ষে আগের উম্মতদের শিরক উপলব্ধি করা খুব মুশকিল হতো। (আলফুরকান ৩০ পৃঃ)

তাওহীদবাদের এ অহংকারের প্রতি একটু লক্ষ্য করুন, ওর সামনে মুসলমানদের লুকায়িত শিরকতো প্রকাশিত হলো কিন্তু নিজ ঘরের নগ্ন শিরক দৃষ্টিগোচর হলোনা। কত যে সাধুতার সাথে তিনি বলছেন, "যদি মুসলমানদের মধ্যে এ ধরণের লোক না হতো, আমার পক্ষে আগের উম্মতদের শিরক উপলব্ধি করা খুবই মুশকিল হতো।" আমার কথা হচ্ছে মুশকিল কেন হতো? শিরক বুঝার জন্য নিজ ঘরেই কোন জিনিসটার অভাব ছিল? খোদার দেয়াতো সবকিছু ছিল।

সত্য কথা বলতে কি, এ আত্ম অহমিকার ফানুসকে ফুটা করে দেয়ার জন্য আমার মনে এ কিতাবটি প্রণয়ন করার ধারনা সৃষ্টি হয়, যেন বিবেকবান ব্যক্তি সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করতে পারে যে, যারা অন্যদের উপর শিরকের অপবাদ দেয়, ওরা নিজেরা নিজেদের আমল নামায় কত বড় মুশরিক?

আর একটি দৃষ্টান্তমূলক কাহিনী

আলোচনার শেষ পর্যায়ে একই রকম আর একটি দৃষ্টান্তমূলক কাহিনী শুনে নিন। যেন ধারণাটা পরিপূর্ণ ভাবে প্রমাণিত হয়।

ভারতবর্ষে ওফাত প্রাপ্ত বুযর্গগণের মধ্যে সুলতানুল আওলিয়া হযরত খাজা গরীব নওয়াজ (রাদি আল্লাহ আনহু) এর শানমান এবং তাঁর রূহানী ফয়েজসমূহ আটশত বছরের ইতিহাসে একটি স্বীকৃত বিষয়। কিন্তু কীযে জঘন্য চিন্তাধারা দেখুন, দেওবন্দী জমাতের ধর্মীয় নেতা মওলভী আশরাফ আলী থানবী সাহেব খাজাবাবার মাযারকে প্রতিমালয়ের সাথে তুলনা করেছেন। যেমন থানবী সাহেবের বাণী সমূহ সংকলনকারী তাঁর (থানবী) একটি মজলিসের বর্ণনা দিতে গিয়ে ওনার মুখে বলা এ কথাটি হুবহু উদ্ধৃত করেনঃ

"জনৈক ইংরেজ লিখেছে যে, আমি হিন্দুস্থানে সবচে অধিক বিস্ময়কর একটি বিষয় উপলব্ধি করলাম যে, আজমীরে এক মৃত ব্যক্তিকে দেখলাম, যিনি আজমীরে শায়িত থেকে সারা হিন্দুস্থানে রাজত্ব করছে।" (কামালাতে আশরাফিয়া ২৫২ পৃঃ)

ইংরাজের এ কথাটি উদ্ধৃত করার পর থানবী সাহেব ইরশাদ ফরমালেনঃ

"বাস্তবিকই খাজা সাহেবের প্রতি লোকদের বিশেষ করে শাসকবর্গের যথেষ্ট আস্থা রয়েছে। (এ জন্য) খাজা আজিজুল হাসান আরয করলেন যে, ফায়দা অর্জিত হচ্ছে বলেই তো আস্থা রয়েছে। (থানবী সাহেব) ফরমালেন, আল্লাহ তাআলার প্রতি যে রকম ধারণা পোষণ করা হয়, ওরকমই প্রতিদান দেয়া হয়। সেরকমতো মূর্তি পূজারীদের মূর্তি পূজার মধ্যেও ফায়দা লাভ হয়। এটা কোন প্রমাণ নয়। শরীয়তই হচ্ছে প্রমাণ। (কামালাতে আশরাফিয়া ২৫২ পৃঃ)

মূর্তি পূজার ফায়দার বিবরণ থানবী সাহেবই দিতে পারেন কারণ তিনি সর্ব প্রথমে এ ব্যাপারে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। কিন্তু লজ্জায় মরে যাবার ব্যাপার হচ্ছে, একজন ইসলামের অস্বীকারকারী শত্রু এবং একজন কলেমা পাঠকারী বন্ধুর দৃষ্টিভঙ্গির কত যে পার্থক্য! শত্রুর দৃষ্টিতে সরকারে খাজা (রহমতুল্লাহে আলাইহে) ভারতবর্ষ বিজয়ী বাদশাহের মত চকমক করছে আর বন্ধুর দৃষ্টিতে তাঁকে পাথরের মূর্তি থেকেও অধিক গুরুত্ব দেয়া হলো না।

এখানে আমি শুধু এটুকু বলতে চাই যে তাদের চোখের ঈমানী বাতি নিবে গেছে। তাই ওই সমস্ত দেওবন্দী মহারথীর দৃষ্টিতে নানুতুবী সাহেবের ব্যক্তিত্ব দেখুন, কীযে ক্ষমতাশালী খোদায়ী কুদরতের অধিকারী মনে হয় যে সাহায্য প্রার্থনাকারীদেরকে সাহায্য লাভের জন্য তাঁর কবর পর্যন্ত আসার কষ্টটুকুও করতে হয় না। যেখানেই সামান্য অসুবিধা মনে হয়, স্বয়ং আলমে বরযখ (কবর) থেকে দৌড়ে চলে আসেন এবং নিজের কার্যক্ষমতার বাহাদুরী দেখায়ে ফিরে যান এবং আসার সময়ও এমন আকৃতিতে আসেন যে তাঁর দর্শন লাভকারী তাঁকে কপালের চোখের দ্বারা দেখেন ও চেনেন।

কিন্তু আফসোস! অন্যদিকে ওদের মনে খাজায়ে হিন্দ (রহমতুল্লাহে আলাইহে) এর রূহানী ক্ষমতার ব্যাপারে আদৌ আস্থা নেই। বাহ্যিক শরীর সহকারে কোন বিপদগ্রস্থ ব্যক্তির কাছে পৌঁছা তো ওদের কাছে কল্পনাতীত এমন কি ওরা এটা স্বীকার করতে রাজি নয় যে, তাঁর মাযারে গিয়েও কেউ ফয়েজ লাভ করতে পারে।

আরও বিস্ময়কর ব্যাপার হচ্ছে, ওদের মতে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর আশির্বাদ পুষ্ট মাযার এবং বিধর্মীদের প্রতিমালয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। উপকার লাভ ও ফয়েজ অর্জন থেকে বঞ্চিত থাকার বেলায় উভয় জায়গা একই বরাবর।

খোদা যদি সুযোগ দেয়, কিছুক্ষণের জন্য ঈমান ও আকীদার ছায়াতলে বসে চিন্তা করে দেখুন, সত্যিই কি খাজায়ে হিন্দের এ অবস্থা, যাকে রসুলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) তাঁর সাম্রাজ্যের সহকারী বানিয়ে হিন্দুস্থানে পাঠিয়েছেন?

যদি আপনি এর কোন উত্তর খুঁজে না পান, তাহলে কমপক্ষে নিজেকে এ প্রশ্নটুকু করতে পারেন যে, কলমের সেই কালি, যা নানুতুবীর প্রশংসায় গঙ্গা যমুনার মত প্রবাহিত হচ্ছিল, তা খাজায়ে খাজেগানে চিশতের বেলায় কেন হঠাৎ শুকিয়ে গেল?

এতটুকু বিস্তারিত আলোচনা করার পর এটা বলার প্রয়োজন নেই যে, ওফাত প্রাপ্ত বুযর্গগণ থেকে সাহায্য লাভের বিষয়ে দেওবন্দীগণের আসল মাযহাব কি? অবশ্য এ অভিযোগের জবাব আমাদের জিম্মায় নয় যে একই

আকীদা, যেটা রসুল ও ওলীর শানে শিরক, সেটা আপন বুযর্গগণের বেলায় কিভাবে ইসলাম ও ঈমান হয়ে গেল?

এখন আপনারাই বিচার করুন, এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সেই ধারণাটা কি আরও বদ্ধমূল হয় না যে, ওদের কাছে কুফর ও শিরকের সমস্ত আলোচনা নবী ও ওলীগণের মান সম্মানের প্রতি আঘাত হানার জন্য ওগুলোকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়। অন্যথায় যদি সত্যিকার তাওহীদের আকীদায় অতি উৎসাহী হয়ে এ আচরণ করে থাকে, তাহলে শিরকের প্রশ্নে আপন-পরের মধ্যে এ ভেদাভেদ কেন করে থাকে?

কথা প্রসঙ্গে এ আলোচনাটা এসে গেল কিন্তু আসল আলোচ্য বিষয় হচ্ছে দেওবন্দী আলেমগণের অদৃশ্য জ্ঞান এবং খোদায়ী ক্ষমতা সম্পর্কিত ঘটনাসমূহের বর্ণনা। এখন পুনরায় নিজের ধ্যানকে সেই ঘটনা প্রবাহের সাথে সম্পৃক্ত করে নিন।

(৩) 'গর্ভে কি আছে, সেটার জ্ঞান সম্পর্কে অদ্ভূত ঘটনা

মুফতী আতিকুর রহমান দেহলভী সাহেব যিনি দেওবন্দী জমাতের ধর্মীয় নেতা এবং দারুল উলুম দেওবন্দের পরিচালনা কমিটির একজন প্রভাবশালী সদস্য। তিনি দিল্লী থেকে প্রকাশিত "মাসিক বুরহান" এর সম্পাদক মওলভী সাঈদ আহমদ আকবর আবাদী ফাজেলে দেওবন্দের পিতার ইন্তেকালে বুরহানের বিশেষ সংখ্যায় একটি শোকবাণী প্রেরণ করেন, যেটা মরহুমের জীবন বৃত্তান্ত সম্পর্কিত ছিল। ঘটনাসমূহের বর্ণনাকারী হলেন স্বয়ং মওলভী সাঈদ আহমদ। মুফতী আতিকুর রহমান সাহেব তা তাঁর শোকবাণীতে কেবল উদ্ধৃতি করেছেন। মওলভী আহমদ সাঈদের জন্মের ঘটনাটাই এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বর্ণনা করেনঃ

"আমার আগে আমার আব্বার এক ছেলে ও এক মেয়ে জন্ম হয়েছিল। উভয়ে অল্প বয়সে মারা যান। এরপর অনবরত সতের বছর পর্যন্ত তাঁর কোন সন্তানাদি হয়নি। শেষ পর্যন্ত তিনি চাকুরী ত্যাগ ও দেশত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল। সে সময় তিনি আগ্রার লোহামন্ডিস্থ সরকারী হাসপাতালে চাকুরী করতেন। কিন্তু যখন কাযী (আবদুল গনী) সাহেব মরহুম (পিতার পীর ও মুর্শিদ) এ খবর পেলেন, তখন তিনি বারণ করে চিঠি লিখলেন এবং একই সাথে এ সুসংবাদটাও

দিলেন যে, ওনার ছেলে হবে। সেমতে এ সুসংবাদের কয়েক বছর পর ১৯০৮ সালে রমাযান মাসের ৭ তারিখে সুবহ সাদিকের সময় আমার জন্ম হলো। জন্মের দু'ঘন্টা আগে আব্বাজান হযরত মাওলানা গাঙুহী ও হযরত মাওলানা নানুতুবীকে স্বপ্নে দেখলেন যে তাঁরা লোহামন্ডির হাসপাতালে তশরীফ এনেছেন এবং বল্‌ছেন "ডাক্তার! ছেলের জন্য মুবারকবাদ !! এর নাম 'সাঈদ রাখবেন'

আব্বাজান সেই ইরশাদবাণী পালন করলেন এবং তখনই সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলেন যে আমি ছেলেকে দেওবন্দে পাঠিয়ে আলেম বানাবো। (মাসিক বুরহান দিল্লী ১৯৫৪ খৃঃ আগষ্ট মাস ৬৮পৃঃ)

একটু খোলা মনে চিন্তা করে দেখুন, মওলভী সাঈদ আহমদ সাহেবের পিতার পীর কাযী আবদুল গনী সাহেব তাঁর (মওলভী সাঈদ আহমদ) জন্মের কয়েক বছর আগেই জেনে নিয়েছিলেন যে সন্তান জন্ম হবে, যার আগাম সুসংবাদও তিনি দিয়ে দিলেন এবং সুসংবাদ মুতাবিক ৭ই রমাযান মওলভী সাঈদ আহমদ এ ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীতে তশরীফও নিয়ে আসেন।

বিবেচনার বিষয় হচ্ছে, গর্ভাবস্থায় যদি তিনি আগাম সুসংবাদ দিয়ে থাকতেন, তাহলে হয়তো মনে করা যেত যে ডাক্তারী উপায়ে তাঁর দৃঢ় ধারণা হয়েছে। কিন্তু কয়েক বছর আগে জেনে নেয়ার দ্বারা অদৃশ্য জ্ঞান ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে।

মওলভী কাসেম নানুতুবী ও মওলভী রশীদ আহমদ গাঙুহী সাহেবের অদৃশ্য জ্ঞানের কথা কি আর বলা যায়। তাঁরা তো ঠিক জন্মের দু'ঘন্টা আগে নিজ নিজ কবর থেকে বের হয়ে সোজা মওলভী সাঈদ সাহবের পিতার ঘরে পৌছে গেলেন এবং তাঁরা পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণের অগ্রিম মুবারকবাদ দিলেন এবং নামও ঠিক করে দিলেন। সাঈদ সাহেবের পিতা ও স্বপ্নকে একেবারে একটি বাস্তব ঘটনা হিসেবে ধরে নিলেন।

বিচার করুন, একদিকে আপন বুযুর্গগণের বেলায় মনের এ বিশ্বাস এবং অন্যদিকে রসূলে মুজতবা (সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর অদৃশ্য জ্ঞানের অস্বীকারের বেলায় বুখারী শরীফের এ হাদীছটি দেওবন্দী আলেমগণের মুখে ও কলমের মাথায় লেগেই আছে;

"সহীহ বুখারী শরীফে হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রাদি আল্লাহ তাআলা আনহুমা) থেকে বর্ণিত, হুযুর (সাল্লাল্লাহ তাআলাই আলাইহে ওয়াসাল্লাম) ফরমায়েছেন, অদৃশ্যের চাবিসমূহ, যা আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না, সেগুলো পাঁচটি বিষয়, যা সূরা লুকমানের শেষ আয়াতে উল্লেখিত আছে-অর্থাৎ কিয়ামতের নির্দিষ্ট তারিখ, বৃষ্টির ঠিক সময় যা কখন পতিত হবে, মহিলার পেটে কি আছে- ছেলে না, মেয়ে? ভবিষ্যতের ঘটনাবলী, মৃত্যুর নির্দিষ্ট স্থান।" (ফতেহ বেরলী কা দিলকশ নাযারা-৮৫পৃঃ)

কুরআনের আয়াতও সত্য এবং হাদীছও অবশ্য গ্রহণীয়। কিন্তু এতটুকু আরয করার অনুমতি চাইবো যে উপরোক্ত আয়াত ও হাদীছ যদি রসূলে মুজতবা (সাল্লাল্লাহ তাআলা আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর বেলায় মায়ের পেটে কি আছে, সেই জ্ঞানের অস্বীকৃতির দলিল হতে পারে, তাহলে বিবেক ও সততার সাথে এ প্রশ্নের উত্তর দেয়া হোক যে এ আয়াত ও এ হাদীছ দেওবন্দী আলেমগণের কাছে কাযী আবদুল গনী, মওলভী কাসেম নানুতুবী ও মওলবী রশীদ আহমদ গাঙুহী সাহেবের বেলায় মহিলার পেটে কি আছে, সে জ্ঞানের বিশ্বাস কেন অগ্রাহ্য হলো না?

যদি নিজেদের বুযর্গগণের বেলায় উপরোক্ত আয়াত ও হাদীছের কোন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ খুঁজে বের করা হয়, তাহলে সেই একই ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ রসূল মুজতাবা (সাল্লাল্লাহ তাআলা আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর বেলায় কেন প্রয়োগ করা হয় না? একই মাসআলার ক্ষেত্রে মনের মধ্যে দু'ধরণের দৃষ্টিকোণ থাকার কারণ ছাড়া আর কি হতে পারে? যাকে আপন মনে হয়েছে, ওর কামালিয়াত প্রকাশ করার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করা হয়নি আর যার প্রতি মনের মধ্যে আদৌও আকর্ষণ নেই, ওনার ফযীলত বর্ণনার ক্ষেত্রে মনের কৃপণতাকে লুকাতে পারেনি।

আর এক ঈমান বিধ্বংসী ঘটনা

গর্ভস্থিত বিষয়ের জ্ঞান নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। তাই এ প্রসঙ্গে ওদের হাতে আকীদায়ে তাওহীদের আর এক রক্তপাত অবলোকন করুন। এ মওলভী কাসেম নানুতুবী সাহেব স্বীয় জমাতের এক 'শেখ' এর আলোচনা পূর্বক লেখেন,

শাহ আবদুর রহীম বেলায়েতীর এক মুরীদ ছিল যার নাম ছিল আবদুল্লাহ খান এবং যিনি ছিলেন রাজপুত এবং হযরতের খাস মুরীদদের অন্তর্ভুক্ত। তাঁর

এমন যোগ্যতা ছিল যে, যদি কারো ঘরে গর্ভধারণ করতো এবং ওনার কাছে তাবিজের জন্য আসতো, তখন তিনি বলে দিতেন যে, তোমার ঘরে মেয়ে হবে বা ছেলে হবে এবং তিনি যা বল্‌তেন, তা-ই হতো। (আরওয়াহে ছালাছা-১৬৩ পৃঃ

এখানে ব্যাপারটা দৈবঘটিতও নয় এবং স্বপ্নের ব্যাপারও নয় বরং সেই বক্তব্যটা পরিপূর্ণ সুস্পষ্ট যে গর্ভস্থিতের জ্ঞান এবং কাশফের এমন এক শক্তি সৃষ্টি হয়েছিল যে সে সবসময় একটি স্বচ্ছ আয়নার মত পেটের ভিতর জিনিস দেখে নিতেন। একেবারে ওই রকম ক্ষমতার মত, যে রকম আমাদের চোখে দেখার ও কানে শুনার ক্ষমতা আছে। জিব্রাঈলের অপেক্ষা বা ইলহামের প্রয়োজন ছিলনা।

কিন্তু আফসোস! দেওবন্দী মস্তিষ্কের কী উর্বর চিন্তাধারা। সাধারণ এক উম্মতের জন্য তারা বিনা সংকোচে যে জ্ঞান ও কাশফের ক্ষমতা স্বীকার করে, তা নবীর বেলায় স্বীকার করতে ওদের কাছে খোদার সাথে শিরকের গন্ধ লাগে।

ওসব একত্ববাদীদের ধোঁকাবাজীর আরও তামাশা দেখ্‌তে চাইলে, একদিকে আবদুল্লাহ খান রাজপুত সম্পর্কে নানুতুবী সাহেবের বর্ণিত ঘটনা পড়ুন, অন্যদিকে দেওবন্দী মাযহাবের মূল কিতাব তকবীয়াতুল ঈমানের ফরমানটা অবলোকন করুন।

"এ রকম যা কিছু মায়ের পেটে আছে, সেটাও (আল্লাহ ছাড়া) কেউ জানতে পারে না যে একটি না দু'টি, পুরুষ না মেয়ে, পূর্ণ না অসম্পূর্ণ সুশ্রী না বিশ্রী। (তকবীয়াতুল ঈমান-২২ পৃঃ)

এটা হচ্ছে আকীদা, ওটা হচ্ছে ঘটনা এবং উভয়টা পরস্পর বিরোধী। যদি উভয়টাকে সঠিক মনে করা হয়, তাহলে স্বীকার করতে হবে যে, আবদুল্লাহ খান খোদায়ী ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। যদি তাকে খোদায়ী ক্ষমতার অধিকারী স্বীকার করা না হয়, তাহলে ঘটনা মিথ্যা বলে ধরে নিতে হবে, আর যদি ঘটনা সত্য বলে স্বীকার করা হয়, তাহলে তকবীয়াতুল ঈমানের ফরমান ভুল সাব্যস্ত করতে হবে। ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও উত্তর দেয়ার যে দৃষ্টিকোণই গ্রহণ করা হোক না কেন, যে কোন একটাকে বিসর্জন দিতে হবে।

এবার আপনারাই বিচার করুন, এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এ ধারণাটা কি বদ্ধমূল হয় না যে, ওদের কাছে কুফর ও শিরকের আলোচনা কেবল নবী ও ওলীগণের মান সম্মানকে ঘায়েল করার জন্য হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়। অন্যথায় তাওহীদের আকীদায় অতি উৎসাহিত হয়ে যদি এ রকম গলাবাজি করতো, তাহলে শিরকের প্রশ্নে আপন-পরের ভেদাভেদ করতো না।

অদৃশ্য জ্ঞানের একটি অদ্ভূত প্রমাণ

আরওয়াহে ছালাছায় লিখেছেন যে, এ মওলভী কাসেম নানুতুবী সাহেব যখন হজ্বে যাচ্ছিল তখন সেই আবদুল্লাহ খান রাজপুতের খেদমতে হাজির হয় এবং বিদায় মূহুর্তে ওনার কাছে দু'আ কামনা করে। এর জবাবে আবদুল্লাহ খান ফরমালেনঃ

"ভাই, তোমার জন্য আমি কি দুআ করবো, আমি তো নিজের চোখে তোমাকে দু'জাহানের বাদশা রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর সামনে বুখারী শরীফ পড়তে দেখছি।' আরওয়াহে ছালাছা ২৫৪ পৃঃ

দেওবন্দী জমাতের এক নও মুসলিমের দৃষ্টিশক্তি দেখুন, অদৃশ্য জগত পর্যন্ত পৌছার জন্য ওর সামনে কোন আবরণ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করলো না কিন্তু রসূলে আনোয়ার (সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর বেলায় দেওবন্দী মহারথিদের বদ্ধমূল আকীদা হচ্ছে, "তিনি (সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহে ওয়াসাল্লাম) দেয়ালের পিছনটাও দেখতে পান না।"

নানুতুবী সাহেবের এক খাদেমের কাশফের ক্ষমতা

এবার আপন মুরুব্বীদের প্রতি অন্ধ বিশ্বাসের আর একটি উদাহরণ দেখুন এবং এটা যাচাই করে দেখুন যে দেওবন্দী আলেমদের মনে কার প্রতি কত আকর্ষণ রয়েছে।

দেওয়ানজী নামক এক ব্যক্তি সম্পর্কে মওলভী মুনাজির আহসান গিলানী স্বীয় কিতাব সওয়ানেহে কাসেমীতে একটি খুবই বিস্ময়কর ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তিনি লিখেনঃ

মাওলানা মুহাম্মদ তৈয়ব সাহেব এটা অবহিত করেছেন যে, সায়্যিদুনা ইমামুল কবীর (মওলভী কাসেম নানুতুবী সাহেব) এর সাথে ইয়াসীন নামে দু'

ব্যক্তির বিশেষ সম্পর্ক ছিল, যার মধ্যে একজন এ দেওয়ানজী দেওবন্দের অধিবাসী ছিলেন এবং মাওলানা তৈয়ব সাহেবের বক্তব্য মতে দেওবন্দে হযরত (নানুতুবী) এর ঘরোয়া ও ব্যক্তিগত কাজের সম্পর্ক এর সাথেই ছিল।

লিখা হয় যে, আলোচ্য ব্যক্তি বুযুর্গ ছিলেন, তাঁর তখনকার হুজরায় বসে যিকর করতেন। দারুল উলুম দেওবন্দের প্রাক্তন মুহতামিম মাওলানা হাবীবুর রহমান সাহেব বল্‌তেন যে ওই সময় দেওয়ানজীর কাশফের ক্ষমতা এত বৃদ্ধি পেয়েছিল যে বাইরের রাস্তায় আনাগোনাকারী তার দৃষ্টিগোচর হতো, যিকর করার সময় ঘর ও দেয়ালের আবরণ প্রতিবন্ধক হয়ে থাকতো না। টীকা সওয়ানেহে কাসেমী ২য় খন্ড ৭৩ পৃঃ

দেখলেন তো, মওলভী কাসেম নানুতুবী সাহেবের ঘরের চাকরদের এ রকম কাশফের ক্ষমতা যে, মাটির দেওয়ালসমূহ ওর সামনে স্বচ্ছ আয়নার মত পরিষ্কার থাক্‌তো। কিন্তু ওদের গোমরাহী ধ্যান ধারণার কীযে বৈসাদৃশ্য দেখুন, ওদের মতে মাটির এ দেয়ালসমূহ হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর দৃষ্টির সামনে আবরণ হয়ে থাক্‌তো। যেমন দেওবন্দী জমাতের নির্ভরযোগ্য নেতা মওলভী মনজুর নোমানী সাহেব লিখেনঃ

"যদি হুযুরের কাছে দেয়ালের পিছনের সব বিষয় জানা হয়ে যেত, তাহলে হযরত বেলালের কাছে (দরজার পাশে দন্ডায়মান মহিলাদের) নাম নিয়ে জিজ্ঞাসা করার কেন প্রয়োজন হতো? ফয়সালাকুন মুনাজারা-১৩৬ পৃঃ

আপনারাই বিচার করুন, স্বীয় রসূলের শানে এর থেকে অধিক বিমাতাসুলভ আচরণ কি আর হতে পারে?

দারুল উলুম দেওবন্দে নিরীশ্বরবাদ ও খৃষ্টবাদ সম্পর্কে অলৌকিক কাশফঃ

এ দেওয়ানজীর আর একটি কাশফ অবলোকন করুন। মওলভী মুনাজির আহসান গিলানী স্বীয় সেই টীকায় এ রেওয়ায়েতের উদ্ধৃতি পুর্বক লিখেনঃ

সেই দেওয়ানজীর দারুল উলুম দেওবন্দ সম্পর্কিত এ কাশফটিও উদ্ধৃত করা যায়। তিনি লিখেন যে, রূপক বিশ্বে তাঁর সামনে উদঘাটিত হলো যে দারুল

উলুমের চার দিকে একটি লাল ডোরা টানা আছে। তিনি নিজেই তাঁর কাশফের তাবীর এটাই করতেন যে, খৃষ্টবাদ ও স্বাধীনতা সংগ্রামের ধরণ এ রকমই মনে হচ্ছে যে দারুল উলুমেই তা প্রকাশ পাবে।" (টীকা সওয়ানেহে কাসেমী ২য় খন্ড ৭৩ পৃঃ)

এখানে আমার এটা ছাড়া আর কিছু বলার নেই যে যারা নিজের দোষ ঢাকার জন্য অন্যদের উপর ইংরাজের গুপ্তচর ও গোপন আঁতাতের অভিযোগ দিয়ে থাকে, তারা যেন নিজেদের আস্তিনের নীচে মুখ রেখে একটু স্বীয় ঘরের এ কাশ্‌ফনামাটা অবলোকন করেন।

কিতাব রচয়িতাকারীদের যদি সেই কাশফের উপর আস্থা না থাকতো, তাহলে কক্ষণো তা প্রকাশ করতো না।

এ কথাটি শুধু কাশ্‌ফের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, ইতিহাসের পাতায়ও এর বাস্তব সমর্থন মিলে যে ইংরেজদের সাথে দারুল উলুম দেওবন্দের ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের সাথে এমন সুসম্পর্ক ছিল যে, যা তারা গর্বসহকারে বর্ণনা করেছেন।

এ কথাটিও আমি অপবাদ হিসেবে বলছি না বরং দেওবন্দী ভাষ্য থেকে ঐতিহাসিক যে সাক্ষ্য আমি লাভ করেছি, সেটার উপর আলোকপাত করা ছাড়া অন্য কিছু বলিনি। উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটি ঐতিহাসিক উদ্ধৃতি নিম্নে দেওয়া হলো।

ইংরেজদের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধের আসল ঘটনাঃ

এক দেওবন্দী আলেম "মাওলানা মুহাম্মদ আহসান নানুতুবী' নামে তাঁর জীবনীগ্রন্থ লিখেছেন, যেটা উছমানিয়া লাইব্রেরী করাচী, পাকিস্তান থেকে প্রকাশ করা হয়। স্বীয় গ্রন্থে লেখক, লাহোর থেকে প্রকাশিত ১৯শে ফ্রেব্রুয়ারী ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের "আন্‌জুমান' পত্রিকার উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন যে ১৮৭৫ সালে ৩১ শে জানুয়ারী রবিবার ব্রিটিশ গভর্ণরের বিশ্বস্ত পামর নামে এক ইংরাজ গোয়েন্দা অফিসার দেওবন্দ মাদ্রাসা পরিদর্শন করতে যান। পরিদর্শন রিপোর্টের যে অংশটুকু লেখক স্বীয় গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন, এর এ কয়েকটি লাইন বিশেষভাবে পড়ার যোগ্যঃ-

"যে কাজ বড় বড় কলেজসমূহে হাজার হাজার টাকা ব্যয় করে হয়ে থাকে, সে কাজ এখানে কয়েক টাকা পয়সায় হয়ে থাকে। যে কাজ প্রিন্সিপাল সাহেব হাজার হাজার টাকা বেতন নিয়ে করে থাকেন, সে কাজ এখানে একজন

মওলভী চল্লিশ টাকা বেতন নিয়ে করছে। এ মাদ্রাসা সরকার বিরোধী নয় বরং সরকারের সমর্থনকারী ও সাহায্যকারী।" "মওলানা মুহাম্মদ আহসান নানুতুবী" ২১৭ পৃঃ

ع: مدعی لاکھ پہ بھاری ہے گواہی تیری

অর্থাৎ হাজার দলীল থেকে তোমার স্বীকারোক্তি অধিক গুরুত্ব পূর্ণ।

স্বয়ং একজন ইংরেজ এ সাক্ষ্য দিল যে, 'এ মাদ্রাসা সরকার বিরোধী নয় বরং সরকারের সমর্থনকারী ও সাহায্যকারী।

এখন আপনারাই বিচার করুন, এ বর্ণনার সাম্নে ওই ধরণের দাবীর কি গুরুত্ব থাকতে পারে, যেটা তারা প্রচার করে থাকে যে ইংরাজদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক কর্মকান্ডের বড় ঘাঁটি ছিল এ দেওবন্দ মাদ্রাসা। দেওবন্দ মাদ্রাসার পুরাতন ব্যবস্থাপনা কমিটির সাথে ইংরাজদের কোন্ পর্যায়ের সুসম্পর্ক ছিল, তা আঁচ করার জন্য স্বয়ং দারুল উলুম দেওবন্দ মাদ্রাসার মুহতামিম কারী তৈয়াব সাহেবের এ বিষ্ময়কর বর্ণনাটা পড়ুন। তিনি বলেনঃ

"দেওবন্দ মাদ্রাসার ব্যবস্থাপনা কমিটির অধিকাংশ সদস্য এমন বুযুর্গ ছিলেন, যারা সরকারের প্রাক্তন কর্মকর্তা এবং তখনকার পেনশনভোগী ছিলেন। যাদের সম্পর্কে সরকারের সন্দেহ করার কোন অবকাশ ছিল না। (টীকা সওয়ানেহে কাসেমী ২য় খন্ড ২৪৭ পৃঃ)

একটু অগ্রসর হয়ে ওসব বুযুর্গগণ সম্পর্কে -লিখেছেন যে, এক সময় দেওবন্দ মাদ্রাসায় সরকারের পক্ষ থেকে তদন্তকারী দল এসেছিল

"ওই সময় এরা এগিয়ে গেলেন এবং স্বীয় সরকারী বিশ্বাসকে সামনে রেখে দেওবন্দ মাদ্রাসার পক্ষ থেকে নিশ্চয়তা দান করেন, যা ফলপ্রসূ হলো" (টীকা সওয়ানেহে কাসেমী

ঘরের আস্থাশীল ব্যক্তি হিসেবে কারী তৈয়াব সাহেবের বর্ণনা কত যে গুরুত্বপূর্ণ তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এবার আপনারাই বিচার করুন, যে মাদ্রাসার পরিচালনা কমিটির কর্মকর্তারা ইংরাজদের খয়ের খাঁ, সে মাদ্রাসাকে সরকার বিরোধীদের ঘাঁটি বলা চোখে ধূলি দেয়ার নামান্তর নয় কি?

এবার ইংরাজদের বিরুদ্ধে দেওবন্দী ধর্মীয় নেতাদের যুদ্ধ ও বিদ্রোহের সম্পূর্ণ কাহিনীকে ভ্রান্ত প্রমাণকারী আর একটি চিত্তাকর্ষক কাহিনী শুনুনঃ-

সওয়ানেহে কাসেমীতে মওলভী কাসেম নানুতুবী সাহেবের সার্বক্ষণিক সহকর্মী মওলভী মনসুর আলী খানের মুখেই এ ঘটনাটি বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি বলেন, একদিন তিনি মাওলানা নানুতুবীর সাথে নানুতা যাচ্ছিল। পথের মধ্যে মাওলানার নাপিত দৌড়িয়ে ও ফুঁফিয়ে এসে মিলিত হলো এবং সে খবর দিল যে, নানুতার ওসি সাহেব এক মহিলার মিথ্যা অভিযোগে আমার নামে ওয়ারেন্ট ইস্যু করেছে। আল্লাহর ওয়াস্তে আমাকে বাঁচান।

মওলভী মনসুর আলী খান বলেন, নানুতা পৌছা মাত্র মাওলানা সাহেব তাঁর একান্ত সচিব মুন্শি মুহাম্মদ সুলায়মানকে ডাক্লেন এবং খুবই রাগান্বিত স্বরে বল্লেনঃ

এ গরীব ব্যক্তিকে ও.সি বিনা দোষে অভিযুক্ত করেছে। তুমি ওকে বলে দাও যে, এ (নাপিত) আমার লোক, ওকে ছেড়ে দাও, অন্যথায় তুমিও রেহাই পাবে না। ওর হাতে যদি হাত কড়া দাও, তাহলে তোমার হাতে ও হাতকড়া পড়বে।" (সওয়ায়ানেহে কাসেমী ১ম খন্ড ৩২১ ও ৩২২ পৃঃ)

মুনশী মুহাম্মদ সুলায়মান মাওলানা নানুতুবী সাহেবের হুকুম হুবহু ওসিকে পৌছায়ে দিল। ও,সি জবাব দিল, এখন কি করা যায়, ডায়রীতে ওর নাম লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে।

মাওলানা নানুতুবী সাহেব এর উত্তরে নির্দেশ দিলেন, ওসিকে গিয়ে বল ওর নাম যেন ডায়রী থেকে কেটে দেয়। মনসুর আলী খান বলেন, মাওলানার এ নির্দেশ পেয়ে ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওসি স্বয়ং মাওলানার খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করলোঃ

"হুযুর নামকাটা বড় অপরাধ। যদি আমি ওর নাম কেটে দি, তাহলে আমার চাকুরী চলে যাবে। মাওলানা বললেন, ওর নাম ডায়রী থেকে কেটে দাও। তোমার চাকুরী যাবে না। (সওয়ানেহে কাসেমী ১ খন্ড ৩২৩ পৃঃ)

ঘটনা বর্ণনাকারী বলেন, "মাওলানার হুকুম মুতাবিক ও সি নাপিতকে ছেড়ে দিল এবং ওসি ওসির চাকুরীতে বহাল রইলো।"

এ ঘটনায় আমি এটা ছাড়া অন্য কিছু মন্তব্য করতে চাই না যে মওলভী কাসেম নানুতুবী সাহেব যদি ইংরাজ সরকারের বিদ্রোহীদের অন্তর্ভুক্ত হতো, তাহলে থানা কর্মকর্তা কেন তাঁর এত অনুগত ছিল? এবং থানা কর্মকর্তাকে এ ধমক (ওকে ছেড়ে দাও, নতুবা তুমিও রেহাই পাবে না) সেই দিতে পারে, যার সম্পর্ক উপরস্থ কেন্দ্রীয় হর্তাকর্তাদের সাথে থাকে।

ইংরাজ জাতির সাম্‌নে মানসিক দুর্বলতার আর একটি ঘটনা অবলোকন করুন। এ প্রসঙ্গে সওয়ানেহে কাসেমীর রচয়িতা এক অদ্ভুত ও দুর্লভ ঘটনাটি বর্ণনা করেনঃ

"ইংরাজদের বিরুদ্ধে যারা যুদ্ধ করছিলেন, তাদের মধ্যে হযরত মাওলানা শাহ ফজলুর রহমান গন্‌জ মুরাদাবাদী (রহমতুল্লাহে আলাইহে)ও ছিলেন। হঠাৎ একদিন স্বয়ং মাওলানা সাহেবকে দেখা গেল যে, তিনি পালিয়ে যাচ্ছেন এবং বিদ্রোহী বাহিনীর নেতৃত্বদানকারী কোন এক চৌধুরীর নাম উচ্চারণ করে বলে যাচ্ছিল-লড়াই করে কি লাভ? আমিতো খিজিরকে ইংরাজদের কাতারে দেখতে পাচ্ছি। (টীকা সওয়ানেহে কাসেমী ২য় খন্ড ১০৩ পৃঃ)

ইংরাজদের কাতারে হযরত খিজিরের অবস্থান হঠাৎ দেখা যায়নি বরং হকের নিদর্শন হিসেবে ইংরাজ বাহিনীর সাথে আরো একবার দেখা গিয়েছিল। যেমন ফরমানঃ

"স্বপক্ষ ত্যাগ করার পর যখন হযরত মাওলানা (শাহ ফজলুর রহমান সাহেব) গনজ মুরাদাবাদের একটি পরিত্যক্ত মসজিদে গিয়ে আশ্রয় নিলেন, তখন ঘটনাক্রমে সেই মসজিদের নিকটস্থ রাস্তা দিয়ে কোন কারণে ইংরাজ বাহিনী যাচ্ছিল। মাওলানা মসজিদ থেকে দেখছিলেন। হঠাৎ মসজিদের সিঁড়ি থেকে নেমে ইংরাজ বাহিনীর এক ঘোর সওয়ার, যিনি ঘোড়া ইত্যাদির রক্ষণা-বেক্ষণের দায়িত্বে ছিলেন, ওর সাথে কথা বলে তাঁকে মসজিদে ফিরে আসতে দেখা গেল।

এখন স্মরণ নেই যে তাঁকে জিজ্ঞাসা করায়, নাকি নিজে নিজেই বলছিলেন যে, এ ঘোড়সওয়ার যার সাথে আমি কথাবার্তা বলেছি, তিনিই ছিল হযরত খিজির। আমি জিজ্ঞাসা করলাম। এটা কেমন ব্যাপার? তখন জবাব দেয়া হলো। হুকুম এটাই হয়েছে।" (টীকা সয়ানেহে কাসেমী ২য় খন্ড ১০৫ পৃঃ)

এ পর্যন্ত রেওয়ায়েত ছিল। এবার সেই রেওয়ায়েতের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ দেখুনঃ

স্বয়ং খিজিরের আগমনের উদ্দেশ্যে কি? হকের নিদর্শনের একটি রূপক আকৃতি ছিল, যা এ নামে আত্ম প্রকাশ করেছে। বিস্তারিত ভাবে জানার জন্য শাহ ওলীউল্লাহ প্রমুখের কিতাবাদি পড়ুন। সম্ভবতঃ যা কিছু দেখা গিয়েছিল, তা ছিল এর গোপন রহস্যের উৎঘাটন।" টীকা-সওয়ানেহে কাসেমী''

কথা শেষ হয়ে গেল। কিন্তু এ প্রশ্নটি মাথায় তোলপাড় করছে যে যখন হযরত খিজিরের আকৃতিতে হকের নিদর্শন ইংরাজ বাহিনীর সাথে ছিল, তখন ওসব বিদ্রোহীদের বেলায় কি হুকুম বর্তাবে, যারা হযরত খিজিরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এসেছিল? এখনও কি ওদেরকে গাযী বা মুজাহিদ বলা যাবে?

মূল বিষয়বস্তু থেকে সরে গিয়ে অনেক দূরে চলে এলাম। তবে আপনারা যদি অধৈর্য না হন, তাহলে আলোচনার উপসংহারে আর একটি হৃদয়গ্রাহী ঘটনা উপভোগ করুনঃ

দেওবন্দী মহলের বিশিষ্ট লিখক মওলভী আশেকে ইলাহী মিরটী স্বীয় কিতাব তযকিরাতুর রশীদে ইংরাজ সরকারের সাথে মওলভী রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী সাহেবের আন্তরিকতাপূর্ণ মনোভাবের চিত্র অঙ্কন পূর্বক এক জায়গায় লিপিবদ্ধ করেনঃ

"(তিনি) মনে করেছিলেন যে আসলে আমি যখন সরকারের আনুগত্য, তাই মিথ্যা অভিযোগের দ্বারা আমার পশমও বাঁকা করতে পারবে না আর আমি যদি মারাও যাই, তাহলে সরকারই মালিক, ওর যা ইচ্ছে তা করার অধিকার রয়েছে। (তযকিরাতুর রশীদ ১ম খন্ড ৮০ পৃঃ)

আপনারা কিছু বুঝতাছেন? কোন্ অভিযোগকে ইনি মিথ্যা বলছে? এটাই যে তিনি ইংরাজদের বিরুদ্ধে জিহাদের ঝান্ডা উত্তোলন করেছিল। আমার মতে গাঙ্গুহী সাহেবের এ আন্তরিক বক্তব্য কেউ স্বীকার করুক বা না করুক, কমপক্ষে অনুসারীদের নিশ্চয় স্বীকার করা উচিত। কিন্তু খোদার কী যে গজব! এত সুস্পষ্টভাবে বক্তব্য রাখার পরও তাঁর অনুসারীরা তাঁকে আজও সেই অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দিল না। অর্থাৎ ওদের মতে তিনি ইংরাজদের বিরুদ্ধে জিহাদের ঝান্ডা উত্তোলন করেছিলেন। কোন ফেরকার লোক কর্তৃক স্বীয় নেতার বিরুদ্ধে এ রকম মিথ্যা অপবাদ দেয়া ইতিহাসে এ রকম দৃষ্টান্ত খুবই বিরল।

"এবং সরকার মালিক, সরকারের অধিকার রয়েছে" এ রকম বাক্য ওই রকম ব্যক্তির মুখেই শোভা পায়, যিনি আপাদমস্তক কারো গোলামীর প্রেরণায় উৎসর্গিত। আফসোস! মনের কুপ্ররোচনায় এবং হৃদয়ের একগুঁয়েমীর অবস্থা কী যে মারাত্মক হতে পারে, তা চিন্তা করতে গেলে মাথা ঘুরিয়ে যায়। এরা খোদাদ্রোহীদের প্রতি এ আস্থা ও বিশ্বাস পোষণ করে যে ওরা মালিকও এবং

ক্ষমতার অধিকারীও। কিন্তু আহমেদ মুজতাবা মাহবুবে কিবরীয়া (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর বেলায় ওসব ব্যক্তিদের আকীদার ভাষ্য হচ্ছেঃ

"যার নাম মুহাম্মদ বা আলী, সে কোন জিনিসের অধিকারী (মালিক) নয়।' তকবীয়াতুল ঈমান

নিশ্চয় এটা বলার অধীকার অধিনস্থ ব্যক্তিরই রয়েছে যে ওর মালিক কে এবং কে নয়? যে মালিক ছিল, ওর জন্য মুখ খোলার প্রয়োজন ছিল, তাই খোলা হয়েছে এবং যে মালিক ছিল না, ওর অস্বীকার করার প্রয়োজন ছিল, তাই অস্বীকার হয়ে গেছে। এখন এ আলোচনা একেবারে অনর্থক যে কার ভাগ্য কোন্ মালিকের সাথে সংশ্লিষ্ট।

এতটুকু আলোচনার পর আর কিছু বলার নেই। আলোচনার উভয় দৃষ্টিকোণ আপনাদের সামনে মওজুদ। যদি পার্থিব কোন স্বার্থ বাধা প্রদান না করে, তাহলে আপনিই সিদ্ধান্ত নিন যে এদের হৃদয় ভুবনে কার ঝান্ডা পূতিত আছে–নবীকূল সম্রাটের নাকি ব্রিটিশ সরকারের?

ঘরের আবরণ অপসারিত হওয়া নিয়ে আলোচনা চলছিল এবং ঘরেরই কাগজ পত্রের উপর আলোচনা শেষ হলো। এবার পুনরায় কিতাবের আসল বিষয়বস্তুর দিকে ফিরে যাওয়া যাক। আপনিও মনকে পুনরায় ঘটনা প্রবাহের সাথে সংযুক্ত করে নিন।

(৫) গায়বী অনুভূতির সাগরে জলোচ্ছ্বাসঃ

মওলভী মুনাজির আহসান গিলানী স্বীয় গ্রন্থ সওয়ানেহে কাসেমীতে আরওয়াহে ছালাছা থেকে উদ্ধৃত করে একটি মনমুগ্ধকর ঘটনা উল্লেখ করেন। তিনি লিখেছেন যে দেওবন্দে অবস্থিত ছাতি মসজিদে কিছু লোকের জমায়েত ছিল। সেই জমায়েত একদিন দেওবন্দ মাদ্রাসার মুহতামিম মওলভী ইয়াকুব নানুতুবী সাহেব বল্‌লেনঃ

ভাইসব, আজ ফজরের নামাযে আমি মারা যেতাম। একটুর জন্য বেঁচে গেলাম। লোকেরা আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, শেষ পর্যন্ত কি বিপদের সম্মুখীন হয়েছিলেন? এটাই শুনার বিষয়। উত্তরে বললেন, আমি ফজরে সুরা মুযযাম্‌মিল পড়ছিলাম। হঠাৎ আমার বুকের উপর দিয়ে জ্ঞানের মহাসাগর প্রবাহিত হলো, যা আমি বহন করতে পারছিলাম না এবং আমার প্রাণ চলে

যাবার উপক্রম হয়েছিল। তিনি আরও বলছিলেন, সেটা ঠিকমত অতিবাহিত হলো, সেই সমুদ্র যেমনি তাড়াতাড়ি এসেছিল, তেমনি তাড়াতাড়ি চলে গেল। এ জন্য আমি বেঁচে গেলাম। এটা জিজ্ঞাসা করা হলো যে এ জ্ঞান সমুদ্র যেটা হঠাৎ চড়াও হয়ে ওর আত্মার উপর দিয়ে অতিবাহিত হয়ে গেল, এটা কি ছিল? এর ব্যাখ্যাও তাঁরই ভাষায় সেই কিতাবে পাওয়া যায়। তিনি বলেন, নামাযের পর আমি চিন্তা মগ্ন হলাম যে এটা কি ব্যাপার ছিল। তখন কাশফ হলো যে হযরত মওলানা নানুতুবী ওই সময় আমার প্রতি মিরট থেকে মনোনিবেশ করেছিল। এটা ওনার মনোনিবেশের ফল যে জ্ঞানের সাগর অন্যদের মনে ঢেউ মারতে লাগলো এবং সহ্য করাটা কষ্টসাধ্য হয়ে গেল। (সওয়ানেহে কাসেমী ১ম খন্ড ৩৪৫ পৃঃ)

এ ঘটনা উদ্ধৃতি করার পর লিখেনঃ

"নিজেই বলুন, চিন্তাশীল ও জ্ঞানী ব্যক্তিরা এর কিবা ভাব বুঝতে পারে? কোথায় মিরট আর কোথায় ছাতা মসজিদ। মিরট থেকে দেওবন্দের এলাকাগত দুরত্ব মাঝখানে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করলো না।" সওয়ানেহে কাসেমী ১ম খন্ড ৩৪৫ পৃঃ

বলুন, এ ঘটনার ব্যাপারে কি বলা যায়? এর রহস্য গিলানী সাহেব এবং তাঁর জমাতের আলেমগণই উদ্‌ঘাটন করতে পারে, যে এলাকাগত দূরত্ব ওসব আলেমগণের মতে নবীগণ ও নবীকুল সর্দার (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর বেলায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, তা নানুতুবী সাহেবের বেলায় কেন প্রতিবন্ধকতাকারী হলো না? এবং মওলভী ইয়াকুব সাহেবের গায়বী শক্তির কথা কি আর বলবো, উনি তো দেওবন্দে বসে মওলভী কাসেম নানুতুবী সাহেবের সেই অদৃশ্য মনোনিবেশ পর্যন্ত জেনে নিল, যেটা তিনি (কাসেম সাহেব) মিরট থেকে ওনার প্রতি করেছিল এবং ওটাও এত তাড়াতাড়ি জেনে নিল যে নামাযের পর ধ্যান করলো এবং সমস্ত বিষয় ওর কাছে উদঘাটিত হয়ে গেল। দিন, সপ্তাহ এবং মাসতো দূরের কথা, ঘন্টা–আধ ঘন্টা সময়েরও প্রয়োজন হলোনা। কিন্তু কীযে লজ্জাকর ব্যাপার! আপন বুযর্গদের তো এ অবস্থা বর্ণনা করা হয় আর রসূলে মুজতবা (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর বেলায় পুরো জমাতের আকীদা হচ্ছেঃ

অনেক ব্যাপারে তাঁর একান্তভাবে মনোনিবেশ করা এবং চিন্তা ও পেরেশানীতে পতিত হওয়া এবং এর পরও গোপন থাকাটা প্রমাণিত আছে। ইফকের ঘটনার ব্যাপারে চেষ্টা তদবীর ও চিন্তাভাবনার কথা সিহাহ সিত্তায় বর্ণিত আছে। কিন্তু কেবল মনোনিবেশের দ্বারা উদঘাটিত হয়নি। এক মাস পর ওহীর মাধ্যমে সান্তনা লাভ হলো। -হিফ্‌জুল ঈমান-৫ম পৃঃ মওলভী আশরাফ আলী থানবী

এবার এ অকৃতজ্ঞতার বিচার রসূলে আরবীর কৃতজ্ঞ উম্মতগণই করবেন যে এরা নিজেরাই এক মূহুর্তে হাজার হাজার মাইল দূর থেকে মনের গোপন বিষয়ের উপর অবহিত হয়ে যায়। কিন্তু রসূলে আনোয়ার (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর বেলায় দীর্ঘ একমাস সময়ের মধ্যেও কোন গোপন বিষয় উদ্‌ঘাটন করার ক্ষমতা স্বীকার করতে রাজি নয়।

এত সুস্পষ্ট প্রমাণ সমুহের পরও হক ও বাতিলের পার্থক্য বুঝার জন্য কি আরও অধিক নিদর্শনের প্রয়োজন রয়েছে? হাশরের উত্তপ্ত জমীনে রসূলে আরবীর শাফা আতের বিশ্বাসীগণ, জবাব দিন??

যে কোন পাঠকের জন্য ওটা বড় পরীক্ষার সময়, যখন সত্য ও ন্যায়ের স্বার্থে স্বীয় আপনজনের বিরুদ্ধে মতামত ব্যক্ত করতে হয়।

গায়বী শক্তি বলে হস্তক্ষেপ করার আজব ঘটনাঃ

আরওয়াহে ছালাছায় মওলভী কাসেম নানুতুবী সাহেবের শাগরীদ মওলভী মনসুর আলী খান মুরাদাবাদীর এক অদ্ভুত ঘটনা উদ্ধৃত করা হয়েছে। স্বয়ং মওলভী মনসুর আলী খানের মুখেই এ রহস্যজনক কাহিনীটা শুনুনঃ

"এক ছেলের সাথে আমার প্রেম হয়ে গেল এবং ওর প্রেম আমার মন মানসিকতার উপর এমন প্রভাব বিস্তার করলো যে রাত-দিন ওর ধ্যানেই মগ্ন থাক্‌তে লাগলাম। আমার অবস্থা অন্য রকম হয়ে গেল, সমস্ত কাজে গন্ডগোল হতে লাগলো। হযরত (মাওলানা নানুতুবী) আধ্যাত্মিক ক্ষমতা বলে তা উপলব্ধি করতে পারলেন। সুবহানাল্লা! একেই বলে সংশোধন ও তত্তাবধায়ন, তিনি আমার সাথে বন্ধুত্ব সুলভ আচরণ শুরু করলেন এবং এটাকে এমন পর্যায়ে নিয়ে এলেন যেন দু বন্ধু পরস্পর মনের ভাব আদান প্রদান করতে কোন সংকোচ বোধ করে না। শেষ পর্যন্ত তিনি নিজেই সেই প্রেমের কথা উঠালেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন

আচ্ছা ভাই; সে কি তোমার কাছে আসে? না আসে না? আমি লজ্জায় একেবারে নিশ্চুপ হয়ে গেলাম। তিনি বললেন, ভাই, এতে লজ্জার কি আছে, প্রায় মানুষের এ রকম হয়ে থাকে। মোট কথা, এভাবে আমার মুখ দিয়ে সেই প্রেমের স্বীকারোক্তি আদায় করে নিলেন এবং তিনি কোন প্রকার রাগের লক্ষণ দেখালেন না। বরং সন্তুষ্টি প্রকাশ করলেন। আরওয়াহে ছালাছা-২৪৫ পৃঃ

এরপর লিখেন, যখন আমার অস্থিরতা আরও বেড়ে গেল এবং প্রেমে একেবারে কাবু হয়ে গেলাম, তখন অপারগ হয়ে এক দিন মাওলানা নানুতুবীর খেদমতে হাজির হলাম এবং আরয করলামঃ

হুযুর! আল্লাহর ওয়াস্তে আমাকে সাহায্য করুন। আমি একেবারে অস্থির ও কাবু হয়ে গেলাম। এমন দুআ করুন যেন সেই ছেলের ধারণা আমার মন থেকে মুছে যায়। তিনি হেসে বললেন, মওলভী সাহেব। কি হয়রান হয়ে গেলেন! উৎসাহ কমে গেল? আমি আরয করলাম, হুযুর, আমি সব কাজে বেকার হয়ে গেলাম। একেবারে অকর্মণ্য হয়ে গেলাম। এখন এটা আর আমার সহ্য হচ্ছে না। আল্লাহর ওয়াস্তে আমার সাহায্য করুন। ফরমালেন, ঠিক আছে, মাগরিবের পর যখন আমি নামায থেকে ফারেগ হবো, তখন আপনি উপস্থিত থাকবেন।" আরওয়াহে ছালাছ-২৪৭ পৃঃ

এবার নামাযের পরের ঘটনা শুনুন। সেই প্রেমিক বলেনঃ

"মাগরিবের নামাযের পর আমি ছাতা মসজিদে বসে রইলাম। যখন হুযুর সালাতুল আউয়াবীন থেকে ফারেগ হলেন, তখন আওয়াজ দিলেন, মওলভী সাহেব কোথায়? আমি আরয কলাম, হুযুর! বান্দা হাজির। আমি সামনে গিয়ে বসে গেলাম। তিনি ফরমালেন, হাত দাও। আমি হাত বাড়িয়ে দিলাম। আমার হাত তাঁর বাম হাতের তালুর উপর রেখে তালু দ্বারা এমনভাবে ঘষা দিলেন, যেমন বান পেষা হয়।

খোদার কসম, আমি একেবারে চাক্ষুষ দেখলাম যে আমি আরশের নীচে এবং চার দিক থেকে নূর এবং আলো আমাকে পরিবেশিষ্টত করে নিল, যেন আমি আল্লাহর দরবারে হাজির। (আরওয়াহে ছালাছা-২৪৭ পৃঃ)

অদৃশ্যের আবরণ অপসারণের শান দেখুন, পরশ পাথরের মত হাতের উপর হাত ঘষ্‌তেই চোখ আলোকিত হয়ে গেল এবং মুহূর্তের মধ্যে আরশ পর্যন্ত সমস্ত

আবরণ অপসারিত হয়ে গেল। শুধু অপসারিত হলো না এবং স্বীয় প্রেমাসক্ত শাগরিদকে চোখের পলক মারার আগেই ওখানে পৌছিয়ে দিলেন, যেখানে সায়্যিদুল আম্বীয়া (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) ব্যতীত জগতের কোন প্রাণী আজ পর্যন্ত পৌছতে পারেনি।

অদৃশ্য জগতের উপর স্বীয় ঘরের বুযুর্গের ক্ষমতার এ অবস্থা বর্ণনা করা হলো যে যাকে ইচ্ছে অদৃশ্য অবলোকনকারী বানিয়ে দেন, কিন্ত মাহবুবে কিবরীয়া (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর বেলায় ওরা সবাই একমত যে অন্যদেরকে অদৃশ্যের বিষয় অবহিত করা তো দুরের কথা, তিনি নিজেই অদৃশ্যের বিষয় সম্পর্কে অজ্ঞ। এবং আরশের কথা কি আর বলা যাবে, পরশও ওনার দৃষ্টির অগোচরে।

আপনারাই ন্যায় সঙ্গতভাবে বিচার করুন। এটা কি ইসলামী আচরণ এবং কালেমা পাঠকারীদের অভিমত?

দেওবন্দী মযহাবের ভিত্তি নাড়াদানকারী এক ঘটনাঃ

মওলভী মুনাজির আহসান গিলানী সেই মওলভী কাসেম নানুতুবী সাহেব সম্পর্কে স্বীয় কিতাব সাওয়ানেহে কাসেমীতে বিস্ময়কর এক ঘটনা বর্ণনা করেছেন।

তিনি লিখেছেন যে একবার মাওলানা নানুতুবী সাহেব এমন এক গ্রামে তশরীফ নিয়ে গেলেন যেখানে শিয়াদের আধিক্য ছিল। শিয়া বিরোধীরা যখন ওনার আগমনের খবর পেলেন, তখন সুবর্ণ সুযোগ মনে করলেন এবং ওনার ওয়াজের ঘোষণা দিলেন। ঘোষনা শুনার সাথে সাথেই শিয়ারা বিচলিত হয়ে পড়লো। ওরা ওয়াজের মাহফিলকে বানচাল করার জন্য লক্ষ্ণৌ থেকে চার জন শিয়া মতবাদের মুজতাহিদ আনলো এবং এ পরিকল্পনা করলো যে ওয়াজ মাহফিলের চার কোণায় এ চারজন মুজতাহিদ বসে যাবে এবং চল্লিশটি আপত্তি মনোনিত করে দশ দশ করে চার জনকে ভাগ করে দিল যেন ওয়াজ চলাকালীন সময়ে প্রত্যেক মুজতাহিদ পৃথক পৃথকভাবে আপত্তি উথাপন করতে পারে এবং ওয়াজ মাহফিল যেন একেবারে বানচাল হয়ে যায়। এর পরবর্তী ঘটনা অবিকল বই এর ভাষায় শুনুনঃ

"হুযুরের কারামাতের অবস্থা শুনুন। তিনি ওয়াজ শুরু করলেন, যেখানে গ্রামের সমস্ত শিয়ারাও উপস্থিত ছিল এবং সেই ওয়াজটা এমন ধারাবাহিকভাবে ওসব আপত্তি সমূহের জবাব দানপূর্বক শুরু করা হলো, যে ভাবে আপত্তি সমূহ উথাপন করার জন্য মুজতাহিদগণ বসেছিলেন। পরিকল্পনা অনুসারে আপত্তি উথাপন করার জন্য যখন কোন মুজতাহিদ মাথা উঠালো, তখন হুযুর সেই আপত্তি নিজেই উথাপন করে জবাব দিতে শুরু করেন। শেষ পর্যন্ত পূর্ণ নিরবতার সাথে ওয়াজ সমাপ্ত হলো।'' (টীকা–সওয়ানেহে কাসেমী ২য় খন্ড ৭১ পৃঃ)

এ ঘটনার পরবর্তী ঘটনাটা আরও আশ্চর্যকর ও মনমুমগ্ধকর। তিনি লিখেনঃ

এ ঘটনায় মুজতাহিদগণ ও স্থানীয় শিয়া নেতারা ভীষণভাবে ব্যর্থ ও লজ্জিত হলো। তাই তারা এ ব্যর্থতা ও লজ্জা লাঘব করার জন্য এবং হুজুরের ভাবমূর্তি নষ্ট করার জন্য এ ফন্দি করলো যে এক যুবককে মিছামিছি মুর্দার বানালো এবং হুযুরের কাছে এসে আরয করলো, "হুযুর জানাযার নামাযটা আপনি পড়ান। ওদের পরকিল্পনা ছিল যে যখন হুযুর দু'তকবীর পর্যন্ত বলবেন, তখন মুর্দার একেবারে উঠে সোজা দাঁড়িয়ে যাবে এবং এতে হুযুরের সাথে ব্যঙ্গ রসিকতা করার সুযোগ হবে। হুযুর অক্ষমতা প্রকাশ করে বললেন, আপনারা শিয়া আর আমি হলাম সুন্নী। নামাযের নিয়মনীতি ও ভিন্ন ভিন্ন। তাই আপনাদের জানাযা আমার দ্বারা পড়ানো কিভাবে জায়েয হতে পারে? শিয়ারা আরয করলো, হুজুর, বুযুর্গ প্রত্যক সম্প্রদায়ের জন্য বুযুর্গই বিবেচিত হয়ে থাকে, আপনি নামায পড়ায়ে দিন। ওদের বারবার অনুরোধ করায় হুজুর রাজি হয়ে গেলেন এবং জানাযার কাছে গেলেন। মানুষের ভীষণ সমাগম ছিল। হুযুর এক কিনারায় দাঁড়িয়ে ছিলেন; চেহারায় রাগের লক্ষণ ছিল, চক্ষুদ্বয় ছিল লাল। নামাযের জন্য অনুরোধ করা হলে আগে বাড়লেন এবং নামায শুরু করে দিলেন। দু'তকবীরের পর পরিকল্পনা অনুসারে যখন মুর্দারের কোন নড়াচড়া পরিলক্ষিত হলো না, তখন পিছন থেকে কোন একজন 'হনহা' বলে আওয়াজ করলো। কিন্তু সে উঠলোনা।

হুযুর চার তকবীর পুরা করার পর রাগের স্বরে বললেন, এখন এ কিয়ামতের আগে আর উঠ্‌তে পারবে না সত্যি দেখা গেল সে মৃত। শিয়াদের মধ্যে কান্নার রোল পড়ে গেল। (টীকা সওয়ানেহে কাসেমী ২য় খন্ড-৭১ পৃঃ)

আপনাদের প্রতি সেই খোদায়ী জালালিয়াতের কসম, যার ভয়ে মুমিনদের মন সদা কম্পমান। ন্যায় পরায়নের সাথে ইন্‌সাফ করার ব্যাপারে কারো পক্ষপাতিত্ব করবেন না।

এ ঘটনা দুটি আপনাদের সামনে আছে। প্রথম ঘটনায় নানুতুবী সাহেবের জন্য অদৃশ্য জ্ঞান ও উপলব্ধি ক্ষমতা প্রমাণ করা হলো, যার বদৌলতে তিনি মুজতাহিদদের মনে লুকায়িত আপত্তি সমূহ সেই ধারাবাহিক ভাবে জেনে নিলেন, যেভাবে ওরা নিজ নিজ মনে লুকিয়ে রেখে ছিল।

আপন বুযুর্গদের বেলায় স্বীকৃতির মনোভাব এত ব্যাপক যে মনের লুকায়িত বিষয়সমূহ ওনাদের কাছে স্বচ্ছ আয়নার মত উদ্ভাসিত। আপন মাওলানার ব্যাপারে এ অদৃশ্য ক্ষমতা প্রকাশ করতে গিয়ে শিরকের কোন গন্ধ লাগে না এবং তওহীদের বিপরীত মনে হয় না। কিন্তু নবী ও ওলীগণের বেলায় সেই অদৃশ্য ক্ষমতার প্রশ্নে ওদের আকীদার ভাষ্য হচ্ছেঃ

"এ ব্যাপারে ওনাদের মধ্যে দাবী করার কিছু নেই যে আল্লাহ্ তাআলা অদৃশ্য বিষয় জানাটা ওনাদের ক্ষমতাধীন করে দিয়েছেন যে যার মনের অবস্থা যখন ইচ্ছে জেনে নেবে বা যে অদৃশ্য বিষয় যখন জানতে চাইলেন জেনে নিলেন যে অমুক জীবিত, নাকি মৃত বা কোন্ শহরে আছে। (তকবিয়াতুল ঈমান-২৫ পৃঃ)

সততা ও ন্যায় বিচারের আলোকে চলার জন্য ইচ্ছুক ব্যক্তিগণ! হক ও বাতিলের পার্থক্য বুঝার জন্য কি আরও কিছু নমুনা তুলে ধরার প্রয়োজন আছে?

প্রথম ঘটনার পর্যালোচনা শেষ হলো, এবার দ্বিতীয় ঘটনার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করুন। ঘটনার বিবরণে এটা পরিস্কারভাবে লিপিবদ্ধ আছে যে জানাযার নামাযের জন্য যখন তিনি দাঁড়ালেন, তখন তাঁর চোখদ্বয় ছিল লাল। এর ভাবার্থ হচ্ছে, স্বীয় অদৃশ্য ক্ষমতা ও উপলব্ধি দ্বারা আগে থেকেই জানা হয়ে গিয়েছিল যে কাফনের অভ্যন্তরে জানাযা মৃত নয় বরং জীবিত এবং কেবল ব্যঙ্গ রসিকতা করার জন্য তাঁকে জানাযার নামায পড়াতে বলা হয়েছে।

তবে ঘটনার উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে, তিনি চার তকবীর পুর্ণ করার পর সেই রাগের স্বরে বলেছেন "এখন আর কিয়ামতের আগে উঠতে পারবে না" এ অংশটুকু বলার উদ্দেশ্যে এটা ছাড়া আর কি হতে পারে যে তাঁর হস্তক্ষেপের ক্ষমতাবলে হঠাৎ ওর মৃত্যু সংঘটিত হয়েছে এবং সাথে সাথে ব্যাপারটাও তাঁর জানা হয়ে গিয়েছিল।

এবার এ বর্ণনার ঠিক পাশাপাশি দেওবন্দী মযহাবের মূল কিতাব তকবিয়াতুল ঈমান' এর এ অংশটুকু পড়ুন এবং বিমুহিত হন।

"জগতে ইচ্ছামাফিক হস্তক্ষেপ করা, স্বীয় হুকুমজারী করা এবং নিজের ইচ্ছানুসারে মৃত্যু ঘটানো এবং জীবিত করা এসব আল্লাহরই শান এবং কোন নবী ওলী পীর মুরশিদ, ভূত-পরীর এ শান নয়। যে কেউ যদি কারো জন্য এ রকম হস্তক্ষেপ প্রমাণ করে, সে মুশরিক হয়ে যায়। (তকবিয়াতুল ঈমান-১০ পৃঃ)

এক দিকে দেওবন্দী মাযহাবের এ আকীদা পড়ুন এবং অন্যদিকে নানুতুবী সাহেবের সেই ঘটনা পাঠ করুন, তখন সুস্পষ্ট হয়ে যাবে যে ওনাদের কাছে শিরকের সমস্ত আলোচনা কেবল নবী ও ওলীগণের মান-সম্মানকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য। অন্যথায় প্রত্যেক শিরক স্বীয় ঘরের বুযুর্গদের বেলায় সম্পূর্ণ ইসলাম সম্মত বিবেচিত হয়।

তাওহীদের আকীদার সাথে দ্বন্দ্বের আর একটি ঘটনাঃ

আকীদার আলোচনা হচ্ছে। তাই তাওহীদের আকীদার সাথে দ্বন্দ্বমুলক আরও একটি মারাত্মক ঘটনা অবলোকন করুন। মওলভী আশরফ আলী থানবী সাহেবের জীবনী লেখক খাজা আযীযুল হাসান স্বীয় গ্রন্থে থানবী সাহেবের বন্ধু বান্ধবদের আলোচনা করতে গিয়ে এ ঘটনাটি উদ্ধৃত করেছেন। তিনি লিখেনঃ

"হযরত হাফেজ আহমদ হুসাইন শাহজাহানপুরী সাহেব, যিনি শাহজাহান পুরের একজন বড় গণ্যমান্য ব্যক্তি হওয়ার সাথে সাথে সিলসিলাভুক্ত বুযুর্গও ছিলেন। একবার কারো জন্য বদদুআ করেছিলেন, তখন সেই ব্যক্তি সঙ্গে সঙ্গে মারা গিয়েছিল। তিনি স্বীয় এ কারামাতের জন্য খুশী হওয়ার পরিবর্তে ঘাবরিয়ে গেলেন এবং চিঠি মারফত থানবী সাহেব থেকে মাস্‌আলা জিজ্ঞাসা করলেন যে, আমার কি হত্যা করার গুনাহ হলো?" (আশরাফুস সওয়ানেহ ১ম খন্ড ১২৫ পৃঃ)

থানবী সাহেবের এ ঈমান বিধ্বংশী উত্তরটা একান্ত বিস্ময় সহকারে পড়ার মত। তিনি লিখেনঃ

> যদি আপনার মধ্যে হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতা থাকে এবং বদদুআ করার সময় আপনি সেই ক্ষমতা দ্বারা কাজ আদায় করেছেন অর্থাৎ এ কাজটা ইচ্ছাকৃত ধারণা এবং ক্ষমতা বলে করেছেন যে এ লোকটা মারা যাক, তাহলে হত্যার গুনাহ হলো এবং যেহেতু এ হত্যাটা ইচ্ছানুসারে হয়েছে, সেহেতু দিয়ত (ক্ষতিপূরণ) ও কাফফারা ওয়াজিব হবে।" (আশরাফুস সওয়ানেহ ১ম খন্ড ১২৫ পৃঃ)

এবার এর সাথে দেওবন্দী মাযহাবের মূল কিতাব তকবিয়াতুল ঈমান এর এ অংশটুকু পড়ুন। নবী ও ওলীগণের হস্তক্ষেপের ক্ষমতা প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে লিখেনঃ

> এবং এ বিষয়ে ওনাদের মধ্যে দাবী করার কিছু নেই যে আল্লাহ তাআলা ওনাদেরকে জগতে হস্তক্ষেপ করার মত এমন কোন ক্ষমতা দিয়েছে যে যাকে ইচ্ছে মেরে ফেলতে পারে। (তকবিয়াতুল ঈমান –২৫ পৃঃ)

দেখলেন তো? হস্তক্ষেপের এ ক্ষমতা নবী ও ওলীগণের জন্য স্বীকার করা দেওবন্দী মাযহাব মতে শিরক এবং ওনাদের মতে এটা কেবল আল্লাহরই শান। যে কেউ যদি কারো জন্য এ রকম প্রমান করে, সে মুশরিক হয়ে যায়। কিন্তু এটা কীযে আশ্চর্য ব্যাপার যে এ শিরককে গলার মালায় পরিণত করার পরও থানবী সাহেব ও তাঁর অনুসারীরা এ জমীনের বুকে সবচে বড় তাওহীদ পূজারী বলেদাবীদার।

(৮) আপন বুযুর্গদের জন্য এক লজ্জাষ্কর দাবীঃ

দারুল উলুম দেওবন্দের মুবাল্লিগ মওলভী আনোয়ারুল হাসান হাশেমী 'মুবাশ্‌শিরাতে দারুল উলুম' নামে একটি কিতাব লিখেছেন, যেটা দারুল উলুমের প্রচার ও প্রকাশনা বিভাগ থেকে প্রকাশ করা হয়েছে। উক্ত কিতাবের ভূমিকার এ অংশটুকু বিশেষ করে পড়ার মত। তিনি লিখেনঃ

> 'কতেক পূর্ণ ঈমানদার বুযুর্গ যাদের জীবনের প্রায় সময় আত্মার পরিশুদ্ধি এবং রূহানী সাধনায় অতিবাহিত হয়, বাতেনী ও রূহানী হিসেবে আল্লাহর পক্ষ থেকে ওনারা এমন আধ্যাত্মিক শক্তি লাভ করেন যে স্বপ্ন বা জাগ্রতবস্থায়

ওনাদের সামনে ওসব বিষয়সমূহ অনায়াসে প্রকাশ পায়, যেগুলো অন্যদের দৃষ্টি থেকে লুকায়িত। (মুবাশশিরাতে দারুল উলুম ১২ পৃষ্ঠা)

কিন্তু ইসলামের লজ্জাশরম গেল কোথায়? কাশফের এ আধ্যাত্মিক শক্তি, যা দেওবন্দের পূর্ণ ঈমানদার বুযুর্গদের আত্মার পরিশুদ্ধির বদৌলতে অর্জিত হয় এবং যদ্বারা গোপন বিষয় সমূহ ওনাদের কাছে অনায়াসে প্রকাশ পায়, তা রসুলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর বেলায় এরা স্বীকার করে না। যখন ওদেরকে বলা হয়, তাসাউফের নির্ভরযোগ্য কিতাব সমূহে যখন উম্মতের কতেক ওলীগণের জন্য কাশফের প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহলে পৃথিবীর জ্ঞান–গরিমার বেলায় নবী ও ওলীগণের সরদার হুযুর আকরম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর জন্য কাশ্‌ফ স্বীকার করা হলে কি ক্ষতি হবে? এর জবাবে তাঁরা বলেনঃ

আল্লাহ তাআলা ওসমস্ত ওলীগণকে জানিয়েছেন যে ওনাদের এ আধ্যাত্মিক জ্ঞান অর্জিত হয়েছে। স্বীয় হাবীব ফখরে আলম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) কেও এর লাখগুণের অধিক দিতে চাইলে দিতে পারেন। কিন্তু প্রদান করার বাস্তব প্রমাণ কোন্ দলীল দ্বারা প্রমাণিত যে যার উপর বিশ্বাস করা যায়? বারাহিনুল কাতেয়া–৫২ পৃঃ

পক্ষপাতিত্বের উর্ধে উঠে ফয়সালা করুন যে রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর কাশ্‌ফ তো আল্লাহর দানের উপর নির্ভরশীল রাখা হয়েছে। কিন্তু দেওবন্দের কামেল ঈমান বুযুর্গদের সাধনা ও আত্মার পরিশুদ্ধি বলে এ কাশফ অনায়াসে অর্জিত হয়ে যায়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে আধ্যাত্মিক জ্ঞান অর্জনের মাধ্যম যদি আত্মার পরিশুদ্ধি ও সাধনাই হয়ে থাকে যেমন উপরে বর্ণিত হয়েছে, তাহলে এ পার্থক্যের কারণ এটা ছাড়া আর কি হতে পারে যে এরা স্বীয় বুযুর্গদেরকে সাধনা ও আত্মার পরিশুদ্ধির বেলায় মাযাল্লা, রসুলে আকরম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) থেকেও আফজল ও বড় মনে করে।

উপরোক্ত উদ্ধৃতিদ্বয় এক সাথে দেখার পর মনের মধ্যে তৃতীয় আর একটি প্রশ্ন উদিত হয় যে স্বীয বুযুর্গদের বেলায় আধ্যাত্মিক জ্ঞানের নামে কাশ্‌ফের এমন এক চিরস্থায়ী ও সার্বক্ষণিক শক্তি স্বীকার করে নেয়া হয়েছে, যার ফলে এখন আর পৃথক পৃথকভাবে এক এক গোপন বিষয়ের জ্ঞানের জন্য প্রমাণের প্রয়োজন হয় না বরং একাই এ শক্তি সমস্ত গোপন বিষয় সমূহ জানার জন্য যথেষ্ট।

কিন্তু মনের কীযে কুটিলতা যে জ্ঞান ও কাশফের এ আধ্যাত্মিক শক্তি রসূলে মুজতবা (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর বেলায় স্বীকার করতে গেলে ওদের কাছে শিরকের গন্ধ লাগে। এমন কি পৃথক পৃথক এক এক বিষয়ের জ্ঞানের জন্য নির্দিষ্ট প্রমাণ দাবী করে যে খোদা যে দান করেছেন, এর প্রমাণ পেশ করুন। কারী তৈয়ব সাহেব নবী সত্বাকে জ্ঞানের উৎস অস্বীকার পূর্বক লিখেনঃ

> 'ব্যাপারটা এ রকম ছিল না যে তাঁকে নবুয়াতের উচ্চস্থানে পৌছায়ে এক সাথে এবং হঠাৎ আল্লাহ তাআলা নবুয়াতকে জ্ঞানের উৎস করে দিয়েছেন এবং প্রয়োজনসমূহ ও ঘটনা প্রবাহের সময় অনায়াসে তাঁর থেকে জ্ঞান উথলিয়ে আসে। ফারান করাচী কা তাওহীদ নাম্বার ১১৩পৃঃ

এ 'অনায়াসে' শব্দটা আপন বুযুর্গদের ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়েছে এবং এখানেও ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু ওখানে ছিল জ্ঞান গরিমার মর্যাদা বৃদ্ধি করার জন্য আর এখানে খাটো করার জন্য।

এবার আপনারাই বিচার করুন যে, দৃষ্টিভঙ্গির এ পার্থক্য সেই মনের কালিমার প্রতিফলন নয় কি, যেটা কারো মনে সৃষ্টি হলে, তা সত্যের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়।

লাগাতার অদৃশ্য পর্যবেক্ষণঃ

এবার নিম্নে দারুল উলুম দেওবন্দের কামেলে ঈমান বুযুর্গদের অদৃশ্য জ্ঞান সম্পর্কে ও সমস্ত ঘটনাবলী শুনুন, যে গুলোর প্রচারের জন্য এ কিতাব রচিত হয়েছে। দারুল উলুম দেওবন্দের এক বিল্ডিং সম্পর্কে সাবেক মুহতামিম মওলভী রফিউদ্দীন সাহেবের এ কাশ্‌ফের কথা বর্ণনা করা হয়েছে;

> "হযরত মাওলানা শাহ রফিউদ্দিন সাহেব, মুহতামিম, দারুল উলুম দেওবন্দ স্বীয় কাশ্‌ফ দ্বারা জেনে ইরশাদ ফরমায়েছেন যে আমি মাওলানার ক্লাসরুমের মাঝখান থেকে আরশে মুয়াল্লা পর্যন্ত নূরের একটি রেখা দেখেছি। (মুবাশ্‌শিরাত-৩১ পৃঃ)

এবার দেওবন্দের কবরস্থান সম্পর্কে আর একটি কাশ্‌ফ অবলোকন করুনঃ

খাতিরায়ে কুদসীয়া বা খত্তে সালেহীন অর্থাৎ যে কবরস্থানে হযরত মাওলানা নানুতুবী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) শেখুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসান সাহেব (রহমতুল্লাহে আলাইহে) ফখরুল হিন্দ হযরত মাওলানা হাবীবুর রহমান সাহেব (রহমতুল্লাহে আলাইহে) মুফতীয়ে আযম হযরত মাওলানা আযীযুর রহমান সাহেব (রহমতুল্লাহে আলাইহে) এবং অগণিত আলেম ও ছাত্র দাফন করা হয়েছে, এ অংশ সম্পর্কে শাহ রফিউদ্দীন সাহেবের কাশ্‌ফ ছিল যে এ অংশে দাফনকৃত ব্যক্তি ইন্‌শা আল্লাহ ক্ষমাপ্রাপ্ত হবে। (মুবাশশিরাত ৩১ পৃঃ)

উল্লেখ্য যে এখানে 'ইনশাআল্লাহ' কথার কথা হিসেবে বলা হয়েছে। তা না হলে প্রত্যেক কবরস্থানের বেলায় ইনশাআল্লাহ বলে দাফনকৃত ব্যক্তিদের ক্ষমাপ্রাপ্ত বলা যায়। এতে দেওবন্দী করবস্থান সম্পর্কিত কাশফের কিবা গুরুত্ব রইলো।

সর্বশেষে মওলভী কাসেম নানুতুবী সাহেবের কবর সম্পর্কে আর এক অদ্ভূত কাশ্‌ফ অবলোকন করুনঃ

"হযরত মাওলানা রফিউদ্দীন সাহেব মুজাদ্দেদী, নক্‌শবন্দী, সাবেক মুহতামিম, দারুল উলুমের কাশ্‌ফ হয়েছে যে হযরত মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম নানুতুবী সাহেব, দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতার কবর কোন নবীর কবরই।" (মুবাশ শিরাত ৩৬ঃ)

কি বুঝে আসতেছে না যে এ কাশফ দ্বারা তিনি কি বুঝাতে চেয়েছেন? দেওবন্দে কি কোন নবীর কবর আগে থেকেই মওজুদ ছিল, যেটা খালি করে ওখানে নানুতুবী সাহেবকে দাফন করা হয়েছে। যদি এ রকমই হয়ে থাকে, তাহলে সেই কবরের সনাক্ত কে করলো? আর যদি এ রকম না হয়, তাহলে এ কাশফ দ্বারা তিনি কি বুঝাতে চেয়েছেন?

যদি শব্দসমূহকে ঘুরায়ে ফিরায়ে লক্ষ্য করা যায়, তাহলে হয়তো অস্পষ্ট শব্দসমূহ দ্বারা তিনি এটা প্রকাশ করতে চেয়েছেন যে নানুতুবী সাহেবের কবর স্বয়ং কোন নবীর কবর। এবং এটা অধিক যুক্তিসঙ্গতঃ মনে হয়। কেননা নানুতুবী সাহেবেব বেলায় যদিওবা খোলাখুলিভাবে নবুয়াতের দাবী করা হয়নি কিন্তু চাপা ভাষায় এ রেওয়ায়েত নিশ্চয়ই উদ্ধৃত করা হয়েছে যে মাঝে মধ্যে ওনার উপর ওহী নাযিলের মত অবস্থা সৃষ্টি হতো। যেমন গিলানী সাহেব স্বীয় কিতাব

সওয়ানেহে কাসেমীতে লিখেছেন যে একদিন মাওলানা নানুতুবী সাহেব স্বীয় পীর ও মুর্শিদ হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ সাহেবের কাছে অভিযোগ পেশ করলেনঃ

"যখন তসবীহ নিয়ে বসি, তখন এক মসীবতে পতিত হই। এমন বোঝা অনুভব হয় যেন কেউ শত শত মনি পাথর রেখেছে, জিহবা ও হৃদযন্ত্র প্রায় বন্ধ হয়ে আসে।" (সওয়ানেহে কাসেমী ১ম খন্ড ২৫৮ পৃঃ)

এ অভিযোগের জবাবে হাজী সাহেবের মুখের ভাষাটা অবিকল উদ্ধৃত করা হয়েছেঃ

"এটা নবুয়াতের ফয়েজসমূহ আপনার হৃদয়ে প্রকাশ পাচ্ছে। এবং এটা সেই বোঝা যা হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর কাছে ওহী নাযিল হওয়ার সময় অনুভব হতো। তোমার থেকে আল্লাহ তাআলার সেই কাজই আদায় করার আছে, যা নবীদের থেকে আদায় করা হতো। সওয়ানেহে কাসেমী ১ম খন্ড ও ২৫৯ পৃঃ)

নবুয়াতের ফয়েজসমূহ, ওহীর বোঝা, নবীগণের দায়িত্ব প্রদান –এ সমস্ত উপাদানের পর সুস্পষ্ট শব্দ সমূহ দ্বারা নবুয়াত দাবী করা না হলেও, আসল উদ্দেশ্য বুঝা গেছে।

এ কিতাবের দ্বিতীয় পর্বের প্রথম অধ্যায় যা দারুল উলুম দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা মওলভী কাসেম নানুতুবী সাহেবের ঘটনাবলী সম্পর্কিত ছিল, এখানেই শেষ হলো।

এ কিতাবের প্রথম পর্বে যে দৃশ্য আপনারা দেখেছেন, এটা হচ্ছে এর বিপরীত দ্বিতীয় দৃশ্যের প্রথম অধ্যায়। দু' এক মিনিট সময় করে উভয় দৃশ্যটা একটু তুলনা করে দেখুন এবং সততা ও ইনসাফের সাথে রায় প্রদান করুন যে প্রথম পর্বে সে সব বিশ্বাস ও বিষয় সমূহকে এরা শিরক সাব্যস্ত করেছিল, ওসব বিশ্বাস ও বিষয়সমূহকে দ্বিতীয় পর্বে ওরা বুকের সাথে লাগিয়ে নিয়ে এখন কোন্ মুখে ওরা নিজেদের একত্ববাদী ও অন্যদের মুশরিক সাব্যস্ত করে?

পৃথিবীর ইতিহাসে অন্যদেরকে মিথ্যুক সাব্যস্ত করার অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়। কিন্তু নিজেকে নিজে মিথ্যুক বলার এমন লজ্জাকর উদাহরণ কোথাও পাওয়া যাবে না।

মজার ব্যাপার হলো, আকিদায়ে তাওহীদের সাথে দ্বন্দ্বের এ ঘটনাবলী শুধু মওলভী কাসেম নানুতুবী সাহেবের সাথে সীমাবদ্ধ নয়, যাকে অঘটন হিসেবে চালিয়ে দেয়া যেত। বরং দেওবন্দী জমাতের সকল প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণই কমবেশী এসব অভিযোগে অভিযুক্ত। পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহ উল্টায়ে দেখুন এবং বিমোহিত হোন।

www.Yqadri.blogspot.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

দেওবন্দী জমাতের ধর্মীয় নেতা জনাব মওলভী রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী সাহেব প্রসঙ্গেঃ

এ অধ্যায়ে দেওবন্দীদের নেতা মওলভী রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী সাহেব সম্পর্কে দেওবন্দী কিতাবাদি থেকে এমন ঘটনাবলী ও কাহিনী সংগৃহীত করা হয়েছে, যেগুলোতে ওদের আকীদায়ে তাওহীদের সাথে দ্বন্দ্ব, স্বীয় নীতিসমূহের বিরোধীতা, মাযহাবী আত্মহত্যা, তাদের মুখে বলা শিরককে নিজেদের বেলায় ঈমান ও ইসলামে পরিণত করার বিস্ময়কর উদাহরণসমূহ সন্নিবেশিত করা হয়েছে। এগুলো বিস্ময় সহকারে পড়ুন এবং অভিমত শুনার জন্য কান খাড়া রাখুন।

ঘটনা প্রবাহ

অদৃশ্য জ্ঞান ও মনের ধারণা সম্পর্কে অবহিত হওয়ার আটটি ঘটনাঃ

দেওবন্দী জমাতের তেজস্বী মওলভী আশেকে ইলাহী মিরটী 'তযকিরাতুর রশীদ' নামে দু'খন্ডে মওলভী রশীদ আহমদ গাঙুহীর জীবনী লিখেছেন। নিম্নের প্রায় ঘটনা তাঁরই কিতাব থেকে সংগৃহীত।

মনের ধারণাসমুহ সম্পর্কে অবহিত হওয়া এবং লুকায়িত বিষয় সমূহ জ্ঞাত হওয়ার ঘটনাসমূহ অবলোকন করুনঃ

প্রথম ঘটনা

ওলী মুহাম্মদ নামে এক ছাত্র মওলভী রশিদ আহমদ গাঙুহীর খানকায় পড়তো। ওর সম্পর্কে 'তযকিরাতুর রশীদ' গ্রন্থের লিখক এ ঘটনাটি বর্ণনা করেনঃ

একবার বাড়ী থেকে টাকা আস্‌তে দেরী হয় এবং ওকে দু' এক দিন উপবাস থাকতে হয়। কিন্তু সে কাউকে বলেনি এবং কোন অবস্থায় এটা কারো কাছে প্রকাশও পায়নি। ওই অবস্থায় একদিন সকালে বগলে কিতাব নিয়ে পড়ার জন্য হুযুরের খেদমতে আস্‌তেছিল। রাস্তায় হালুয়ার দোকানে গরম গরম হালুয়া

তৈরী করা হচ্ছিল। সে কিছুক্ষণ ওখানে দাঁড়িয়ে চিন্তা করলো, পয়সা থাকলে খেয়ে নিতাম। কিন্তু ওর কাছে পয়সা ছিল না বিধায় সবর করে খানকায় চলে আসলো। হুযুর যেন ওর অপেক্ষায় বসে রইছিলেন। সালামের জবাব দেয়ার সাথে সাথে ফরমালেন, মওলভী ওলী মুহাম্মদ! আজ আমার হালুয়া খাওয়ার ইচ্ছে হচ্ছে। এ চার আনা নিয়ে যাও এবং যে দোকান থেকে তোমার পসন্দ হয়, ওখান থেকে নিয়ে এসো। শেষ পর্যন্ত ওলী মুহাম্মদ সেই দোকান থেকে হালুয়া ক্রয় করে আনলো এবং হুযুরের সাম্‌নে রাখলো। হুযুর বললেন, মিয়া ওলী মুহাম্মদ! এ হালুয়া তুমি খেয়ে নিলে আমি আনন্দিত হবো।" (তযকিরাতুর রশীদ ২য় খন্ড ২২৭ পৃঃ)

এ পর্যন্ত তো ঘটনাই ছিল এবং এটা দৈবক্রমে মিলে যাওয়ার ঘটনা হতে পারতো। কিন্তু গাঙুহী সাহেবের সব সময়ের অদৃশ্য জ্ঞান সম্পর্কিত সেই ছাত্রের মনোভাব অবলোকন করুন। তিনি লিখেনঃ

মওলভী ওলী মুহাম্মদ এ ঘটনার পর বলতেন যে হুযুরের সামনে যেতে আমার দারুন ভয় হতো। কেননা মনের কল্পনাতো নিয়ন্ত্রণাধীন নয় এবং হুযুর ওটা অবহিত হয়ে যান।'' তযকিরাতুর রশীদ ২২৭ পৃঃ

এটাই প্রকাশ করা উদ্দেশ্য যে মনের ধারণা সম্পর্কে অবহিত হওয়ার এ বৈশিষ্ট্য দৈবক্রম নয় বরং স্থায়ী ছিল অর্থাৎ পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মত তিনি সব সময় এ ক্ষমতা প্রয়োগ করতে সামর্থবান ছিল।

নিজের ঘরের বুযুর্গদের অদৃশ্য জ্ঞানের তো এ অবস্থা বর্ণনা করা হয়। কিন্তু নবী ও ওলীগণের বেলায় ওদের আকীদার সাধারণ ভাষ্য হচ্ছেঃ

(যে কেউ যদি কারো সম্পর্কে এ রকম মনে করে যে) যে কথা আমার মুখ থেকে বের হয় সে জেনে ফেলে এবং যে ধারণা ও কল্পনা মনের মধ্যে আসে, সে ওগুলোর ব্যাপারে অবহিত, তাহলে এসব কথার দ্বারা মুশরিক হয়ে যায় এবং ওরকম সব কথা শিরক। (তকবিয়াতুল ঈমান-১০ পৃঃ)

এখন সেই অবিচারের কথা কাকে বলবো যে একই আকীদা যেটা নবী ও ওলীগণের বেলায় শিরক, সেটা আপন বুযুর্গদের বেলায় ইসলাম ও ঈমান হয়ে গেছে।

হক ও বাতিলের পার্থক্য অনুভব করার জন্য কী আরও কিছু নমুনার প্রয়োজন আছে? নিজের বিবেক অনুসারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন।

দ্বিতীয় ঘটনা

মনের ধারণা সম্পর্কে অবহিত হওয়ার আর একটি ঘটনা শুনুন,

একবার আমার উস্তাদ মাওলানা আবদুল মুমিন সাহেব হুযুরের খেদমতে উপস্থিত ছিলেন। তাঁর মনের মধ্যে এ ধারণাটা আসলো যে বুযুর্গদের জীবনে উদাসীনতা ও অভাব অনটনের আধিক্য পরিলক্ষিত হয়। হুযুরের শরীর মুবারকে যে কাপড়টা শোভা পাচ্ছে, তা মুবাহ ও শরীয়ত সম্মত বটে কিন্তু অধিক মূল্যবান।

হযরত ইমাম রব্বানী (মাওলানা গাঙুহী) ওই সময়ে অন্য কারো সঙ্গে কথা বলছিল। হঠাৎ এ দিকে ফিরে ফরমালেন, অনেক দিন হলো আমার কাপড় তৈরী করার সুযোগ হয় না। লোকেরা নিজেরাই বানিয়ে পাঠিয়ে দেয় এবং পরার জন্য বারবার অনুরোধ করার কারণে ওদের খাতিরে পরে থাকি। আমার সমস্ত কাপড় অন্যদের প্রদত্ত। তযকিরাতুর রশীদ ২য় খন্ড ১৭৩ পৃঃ

এ ঘটনার ব্যাপারটা বিশেষ করে অনুধাবন করার বিষয় যে মনের সেই ধারণা সম্পর্কে অবহিত হওয়ার জন্য ওনার বিশেষ কোন মনোযোগ দেয়ার প্রয়োজন হয়নি, অন্যজনের সাথে আলাপ আলোচনায় রত থাকা অবস্থায়ও তিনি মওলভী আবদুল মুমিন সাহেবের মনের ধারণা সম্পর্কে অবহিত হয়ে গেলেন। এ ঘটনা থেকে বুঝা যায় যে তিনি একই সাথে সব দিকের খবর রাখেন। আমার ধারণা যদি ভুল না হয়, তাহলে এটা একমাত্র আল্লাহরই শান। কেননা মানুষ সম্পর্কে তো সব সময় এ ধারণটা রয়েছে যে ওদের মনোনিবেশ করার ক্ষমতা একই সময়ে কয়েক দিকে থাক্‌তে পারে না, কেবল এক দিকেই থাকতে পারে।

কিন্তু আশ্চর্যকর ব্যাপার হচ্ছে, দেওবন্দীদের ইমাম রব্বানী (গাঙুহী) তো কোন বিশেষ মনোযোগ ছাড়াই সঙ্গে সঙ্গে মনের লুকায়িত অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হয়ে গেলেন। অথচ ইমামুল আম্বীয়া (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) সম্পর্কে ওদের আকীদা হচ্ছেঃ-

"অনেক বিষয়ে তাঁর একান্ত মনোযোগ দেয়া বরং চিন্তা-ভাবনা ও পেরেশানীতে পতিত হওয়া এবং এর পরও গোপন থাকা প্রমাণিত আছে।" (হিফযুল ঈমান ৭ পৃঃ)

এখন আপনারাই বিচার করুন, এটা কি মাথায় আঘাত করার বিষয় নয় কি? গায়বী উপলব্ধির যে ক্ষমতা ওদের একজন সাধারণ ব্যক্তির জন্য প্রমাণিত, তা খোদার মাহবুব ও ইমামুল আম্বীয়া (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর জন্য প্রমাণিত নেই।

বিবেকবানগণ! শিক্ষাগ্রহণ করুন।

তৃতীয় ঘটনা

মওলভী নযর মুহাম্মদ খান সাহেব বলেন, আমার স্ত্রী যে সময় তাঁর থেকে বায়াত হন, তখন আমি মানসিকভাবে খুবই শালিনতাবোধ সম্পন্ন ছিলাম। এজন্য মহিলার বাইরে যাওয়া এবং কোন অপরিচিত ব্যক্তিকে আওয়াজ শুনানোটাও অপছন্দ ছিল। সেই সময়ও (বায়াত হওয়ার সময়) আমার মনে এ ধারণটা এসেছিল যে হুযুর তো আমার স্ত্রীর আওয়াজ শুনবে। কিন্তু এটা হুযুরের কারামত ছিল যে, কাশফের দ্বারা আমার মনের ধারণা জেনে নিয়েছিলেন এবং বললেন, ঠিক আছে ঘরের ভিতরে বসায়ে দরজা বন্ধ করে দাও। তযকিরাতুর রশীদ ২য় খন্ড ৫২ পৃঃ

এ ঘটনায় ওই বিষয়টা একেবারে সুস্পষ্ট যে গাঙুহী সাহেব ওনার মনের ধারণা খোদায়ী ইলহাম দ্বারা নয় এবং স্বীয় কাশফের ক্ষমতা বলে জেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু আফসোস! এ কাশফের ক্ষমতা নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর বেলায় স্বীকার করতে গেলে ওদের কাছে শিরকের গন্ধ লাগে এবং পাগলের মত এ বলে চেচামেচি শুরু করে দেয় যে এটাতো খোদার সাথে সমান হয়ে গেল, একজন পয়গম্বরকে খোদায়ী আসন দিয়ে দেয়া হলো, ইত্যাদি ইত্যাদি।

চতুর্থ ঘটনা

হুযুরের শাগরিদ মাওলানা আলী রেযা সাহেব বলেন যে, ছাত্রজীবনে আমার এমন এক রোগ হয়েছিল যে, বেশীক্ষণ ওযু রাখতে পারতাম না। কোন কোন নামাযের জন্য কয়েকবার ওযু করতে হতো।

একবার এমন অবস্থা হলো যে আমি ফজরের নামায পড়ার জন্য খুব ভোরে মসজিদে গেলাম। শীতের মৌসুম ছিল এবং ওই দিন ঠান্ডাও অধিক ছিল। বার

বার ওযু করতে আমার খুব কষ্ট হচ্ছিল। নামায থেকে কোন প্রকারে তাড়াতাড়ি ফারেগ হওয়াটা মন চাচ্ছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে ওই দিন ইমাম রব্বানী (গাঙুহী) যথা সময় থেকেও একটু দেরী করলেন। আমি ভীষণ ঠান্ডায় কয়েকবার ওযু করে একেবারে পেরেশান হয়ে গেলাম এবং মনে মনে বললাম যে এটা কোন ধরণের হানাফী নীতি? হুযুর এখনও আকাশ আলোকিত হওয়ার জন্য বসে রইলেন। আর এদিকে আমি ওযু করতে করতে মরে যাচ্ছি। কিছুক্ষণ পর হুযুর তশরীফ আনলেন। এবং জামাত কায়েম হলো। নামায থেকে ফারেগ হওয়ার পর যথারীতি অন্যান্য লোকের সাথে আমিও হুযুরের পিছে পিছে হুজরা শরীফ পর্যন্ত গেলাম। যখন সবাই ফিরে গেল এবং হুযুর দরজা বন্ধ করতে যাচ্ছিল, তখন আমাকে কাছে ডেকে বললেন,"ভাই, এখানকার লোক ফজরের নামাযের জন্য দেরী করে আসে। এ জন্য আমিও একটু দেরী করি।" এ বলে হুযুর হুজরার অভ্যন্তরে তশরীফ নিয়ে গেলেন এবং আমি লজ্জায় একেবারে জড়সড় হয়ে গেলাম। তযকিরাতুর রশীদ ২য় খন্ড ২৪৪ পৃঃ

লজ্জায় জড়সড় হওয়ার কারণ হলো অদৃশ্য জ্ঞানী ব্যক্তির কাছে মনের গোপন কথা প্রকাশ পেল। তা নাহলে আপনারাই বলুন, মনের কল্পনা ছাড়া শেখের দরবারে তিনি অন্য আর কি অপরাধ করে ছিল?

পঞ্চম ঘটনা

"একবার মওলভী (বেলায়েত হুসাইন) সাহেবের মনে আসলো যে, হযরত মুজাদ্দিদ সাহেব (গাঙুহী) তাঁর কতেক লিখনীতে উচ্চস্বরে যিকির করাকে বিদআত বলেছেন। হুযুরের খেদমতে উপস্থিত হলে তিনি আমাকে লক্ষ্য করে বলেন, নক্‌শবন্দিয়াগণও অনেকসময় উচ্চ স্বরে যিকির করার অনুমতি দিয়ে থাকেন।'' (তযকিরাতুর রশীদ ২২৯ পৃঃ)

দেখলেন তো? অনবরত মনের কল্পনার উপর অবহিত হওয়ার এ শান। এদিকে কল্পনা করছে, ওদিকে খবর হয়ে গেছে। কিন্তু ওদের মূল কিতাব তকবিয়াতুল ঈমান এর উদ্ধৃতি একটু আগে আপনারা পড়েছেন যে এ শান কেবল আল্লাহরই। যে খোদা ভিন্ন অন্য কারো জন্য এ ধরণের বিষয় প্রমাণ করে, সে মুশরিক হয়ে যায়।

এ অভিযোগের জবাব আমাদের জিম্মায় নয় যে একই আকীদায়, যেটা খোদা ভিন্ন অন্য কারো জন্য শিরক ছিল, সেটা আপন বুযুর্গদের বেলায় কী ভাবে ইসলাম সম্মত হয়ে গেল।?

ষষ্ঠ ঘটনা

এতক্ষণ পর্যন্ত মনের কল্পনা সম্পর্কে অবহিত হওয়ার ঘটনা বলা হয়েছে। এবার সার্বিকভাবে অদৃশ্য জ্ঞানের শান দেখুনঃ

"একবার দু' অপরিচিত ব্যক্তি হুযুরের খেদমতে উপস্থিত হলো এবং সালাম ও মুসাফাহা করার পর বায়াত হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলো। তিনি ফরমালেন, দু'রাকাত নামায পড়ুন। হুযুরের এটা বলার পর ওরা কিছুক্ষণ মাথা নীচু করে বসে রইলো। অতঃপর নিরবে উঠে হাঁটা দিল।

যখন দরজার বাইর হলো তখন হুযুর বললেন, এরা শিয়া ছিল, আমাকে পরীক্ষা করার জন্য এসেছিল। উপস্থিতদের মধ্যে কয়েকজন এটা যাচাই করার জন্য ওদের পিছনে পিছনে গেল এবং জানতে পারলো যে ঠিকই ওরা রাফেজী ছিল।" (তযকিরাতুর রশীদ ২য় খন্ড ২২৭ পৃঃ)

সপ্তম ঘটনা

"আরওয়াহে ছালাছা'এর লিখক আমীর শাহ খান স্বীয় কিতাবে মওলভী রশীদ আহমদ গাঙুহী সাহেব সম্পর্কে এ ঘটনাটি বর্ণনা করেনঃ

হযরত গাঙুহী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) মওলভী মুহাম্মদ ইয়াহিয়া কান্দলবী সাহেবকে বললেন, অমুক মাস্‌আলা ফতওয়ায়ে শামীতে দেখুন। মওলভী সাহেব আরয করলেন যে, হুযুর সেই মাসআলাতো শামীতে নেই। বললেন, এটা কিভাবে হতে পারে? দেখি শামী নিয়ে এসো। শামী আনা হলো। হুযুর ওই সময় দৃষ্টিশক্তিহীন ছিলেন। শামীর দু'তৃতীয়াংশ পাতা ডান দিক এবং এক তৃতীয়াংশ বাম দিক করে আনুমানিক ভাবে কিতাব খুললেন, এবং বললেন, বাম দিকের পাতার নীচের দিকে দেখ। দেখলো যে ওই মাসআলা ওই পৃষ্ঠাতেই মওজুদ ছিল। সবাই আশ্চর্য হয়ে গেল। হুযুর বললেন, আল্লাহ তাআলা আমার সাথে ওয়াদা করেছেন যে আমার মুখ থেকে ভুল বের করাবেন না।" আরওয়াহে ছালাছা-২৯২ পৃঃ

এ ঘটনার পর জনাব মওলভী আশরাফ আলী থানবী সাহেবের এ টীকাটি পড়ুন। তিনি লিখেনঃ

> সেই জায়গা বের হয়ে আসাটা ঘটনাক্রমেও হতে পারে। কিন্তু লক্ষণসমূহ থেকে এটা কাশফ থেকে জানা হয়েছে বলে মনে হয়। নতুবা জোর দিয়ে বলতেন না যে অমুক জায়গায় দেখ। টীকা, আরওয়াহে ছালাছা

একটু মনোযোগ সহকারে চিন্তা করুন, এ ঘটনাটা এমন দুর্বোধ্য নয় যে, এর জন্য টীকা লিখার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু এটা মনে হয় যে থানবী সাহেব হয়তো ধারণা করেছিল যে লোকেরা এটাকে দৈব ঘটনা মনে করতে পারে। তাই কাশফ বলে লোকদের মনোভাব ওনাদের অদৃশ্য জ্ঞানের দিকে ফিরায়ে দিলেন।

এ ঘটনায় গাঙুহী সাহেবের সেই বাক্যে ("আল্লাহ তাআলা আমার সাথে ওয়াদা করেছেন যে আমার মুখ দিয়ে ভুল বের করাবেন না") কয়েকটি প্রশ্ন মনে জাগে।

প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে, খোদার সাথে ওনার কথা বলার সৌভাগ্য কখন এবং কোথায় হয়েছিল যে, তিনি ওনাকে এ ওয়াদা দিয়েছিলেন?

দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, দৃঢ়তা ও নিশ্চয়তার সাথে কি এ দাবী করা যেতে পারে যে গাঙুহী সাহবের মুখ ও কলম থেকে সমগ্র জীবনে কোন ভুল কথা বের হয়নি? একমাত্র নবীর বেলায় এ রকম ধারণা করাটা অবশ্য শুদ্ধ কিন্তু আমি মনে করি যে উম্মতের বড় বড় মনীষীদেরকেও মুখ ও কলমের ভুলভ্রান্তি থেকে পবিত্র বলে সাব্যস্ত করা যায় না।

অতএব, এ অবস্থায় সে কি অন্য ভাষায় খোদায়ে তাআলার প্রতি এ অপবাদ দিচ্ছে না যে তিনি স্বীয় ওয়াদার বরখেলাপ করেছেন?

তৃতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, এ ঘোষণার দ্বারা গাঙ্গুহী সাহেবের উদ্দেশ্য কি? অনেক চিন্তা ভাবনার পর এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে তিনি সাধারণ লোকদেরকে এ ধারণা দিতে চেষ্টা করেছেন যে খোদার দরবারে ওনার স্থান মানবীয় স্তর থেকেও উর্ধে। কেননা, নবী যদিওবা মানবীয় হয়ে থাকেন। কিন্তু দেওবন্দীদের মতে ওনাদেরও ভুলত্রুটি হতে পারে, যেমন থানবী স্বীয় ফত্ওয়ায় ইরশাদ ফরমায়েছেনঃ

> "তাহকীক করে দেখা হয়েছে যে ভুলত্রুটি শুধু বেলায়েতের সাথে নয় বরং নবুয়াতের সাথে সংযুক্ত হতে পারে। (ফতওয়ায়ে ইমদাদিয়া ২য় খন্ড ৬৪ পৃঃ)

এবার এ জায়গায় আমি আপনাদেরকে এক কঠিন পরীক্ষায় লিপ্ত করে সামনে অগ্রসর হচ্ছি। এটা ফয়সালা করা আপনাদের ঈমানী দায়িত্ব যে, স্বীয় নবীর প্রতি আনুগত্যের নীতি কি? ফয়সালা করার সময় আপনার মনমেজাজটা যেন কোন ভুল ধারণা বশতঃ পক্ষপাতের শিকার না হয়।

অষ্টম ঘটনা

এ আরওয়াহে ছালাছার লিখক আমীর শাহ খান সাহেব গাঙ্গুহী সাহেব সম্পর্কে এ ঘটনারও বর্ণনাকারী। তিনি বলেনঃ

একবার হযরত গাঙুহী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) খুব জোশে ছিলেন এবং ধ্যান সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। তিনি বল্‌লেন, আমি কি বলে ফেলবো? আরয করা হলো বলুন- পুনরায় বললেন, বলে ফেলবো? আরয করা হলো, বলুন। পুনরায় বললেন, বলে ফেলবো? আরয করা হলো বলুন। তখন তিনি বলেন, পূর্ণ তিন বছর হযরত ইমদাদের চেহারা আমার অন্তরে ছিল এবং আমি ওনাকে জিজ্ঞাসা না করে কোন কাজ করিনি। পুনরায় আরও জোশে আসলেন এবং বললেন, বলে ফেলবো? আরয করা হলো হুযুর নিশ্চয় বলুন।

ফরমালেন, এত বছর হযরত (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) আমার অন্তরে ছিল এবং আমি কোন কাজ ওনাকে জিজ্ঞাসা ব্যতীত করিনি। এটা বলার পর আরও জোশে এসে বল্‌লেন-বলে ফেলবো? আরয করা হলো বলুন। কিন্তু তিনি নিশ্চুপ হয়ে গেলেন। লোকেরা যখন বার বার বলতে লাগলো, তখন বললেন, আর নয়, এটা বাদ দাও। আরওয়াহে ছালাছা-২৯২ পৃঃ

অর্থাৎ আল্লাহ মাফ করুক, সম্ভবত এটাই বলতে চেয়েছিলেন যে খোদার চেহারা ওনার অন্তরে ছিল।

উল্লেখ্য যে, এখানে কোন কথা রূপক বা অস্পষ্ট ভাষায় নেই। যা কিছু বলা হযেছে তা সুস্পষ্ট অর্থবোধক। এখানে হুযুর আকরম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলতে হুযুরের নুর বুঝানো হয়নি এবং হুযুর দ্বারা হুযুরকেই বুঝানো হয়েছে। কেননা নূর একটি অতি মনোরম আলোর নাম। এর সাথে কথা বলার কোন অর্থই হতে পারে না।

এখানে বিবেকবানদের চিন্তা করার মত একটি বিষয় হচ্ছে, যখন নিজেদের ফযীলত ও বুযুর্গীর কথা আসে, তখন সমস্ত অসম্ভব শুধু সম্ভব হয়ে যায় না

বরং বাস্তব ঘটনায় পরিণত হয়। এবং এখানে কারো পক্ষ থেকে এ প্রশ্নটা উথাপিত হয় না যে (আল্লাহ থেকে পানা) যতদিন পর্যন্ত হুযুর তাঁর অন্তরে অবস্থান করেন, ততদিন কি তিনি স্বীয় পবিত্র রাওজায় মওজুদ ছিলেন, কিনা? যদি না থাকে, তাহলে কি তত দিন রওজা পাক খালি অবস্থায় ছিল? আর যদি মওজুদ থাকে, তাহলে থানবী সাহেবের সেই প্রশ্নের উত্তর কি হবে? যেটা তিনি মীলাদ মাহফিলে হুযুর আকরম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর তশরীফ আনয়ন সম্পর্কে উথাপন করেছেন। যেমন–

"যদি একই সময় কয়েক জায়গায় মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়, তাহলে তিনি কি সব জায়গায়, না কোন এক জাযগায় তশরীফ নিয়ে যান? কোন এক জায়গায় যাওয়াটা বিনা কারণে একটাকে অগ্রাধিকার দেয়া বুঝায় আর যদি সব জায়গায় যায়, তাহলে তাঁর দেহ যেহেতু একটি, কিভাবে প্রত্যেক জায়গায় যেতে পারে? (ফতওয়ায়ে ইমদাদিয়া ৪র্থ খন্ড ৫৮ পৃঃ)

তাদের দৃষ্টিভঙ্গির এ তারতম্য কোন অবস্থাতেই অগ্রাহ্য করা যায় না যে, নিজেদের রূহানী উন্নতি এবং গায়বী উপলব্ধির ক্ষমতার ব্যাপারে পুর্ণ সম্মতিক্রমে সবাই নিশ্চূপ এবং যখন মাহবুব কিরদেগার (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর কথা আসলো তখন কুমন্ত্রণার উর্বর মস্তিষ্ক এমন কথা প্রকাশ করলো, যা মানুষের ধ্যান ধারণা ও বিশ্বাসের প্রতি আঘাত হান্‌লো। যদি ন্যায় বিচারের উৎসাহ মনের মধ্যে থাকে, তাহলে দেওবন্দীদের এ হীন মানসিকতার কথা এ কিতাবের পাতায় পাতায় উপলব্ধি করতে পারবেন আর গাঙুহী সাহেবের এ ঘটনার একটি দিক এত জঘন্য যে চিন্তা করলে চোখ দিয়ে খুন টপকিয়ে পড়ে। সেটা হচ্ছে কোন কাজ তিনি হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) কে জিজ্ঞাসা করা ব্যতীত করেননি।" অন্য ভাষায় তিনি স্বীয় শরীর অংগ প্রত্যংগ মুখ ও কলমের সম্পূর্ণ ভুলত্রুটি হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। কেননা এ দাবী কোন সময় প্রমাণ করতে পারবে না যে তাঁর জিন্দেগীতে কোন শরীয়ত বিরোধী কাজ প্রকাশ পায়নি এবং যেহেতু প্রকাশ পেয়েছে সেহেতু ওনার কথা মুতাবিক মানতেই হবে যে (আল্লাহ থেকে পানা) সেই শরীয়ত বিরোধী কাজও তিনি হুযুরের সম্মতি ক্রমে করেছেন।

আরও কয়েকটি বিস্ময়কর কাহিনী

আপনাদের কাছে যদি বিরক্তিবোধ না হয়, তাহলে তযকিরাতুর রশীদে গাঙ্গুহী সাহেব সম্পর্কিত যে সব মুশ্‌রিকানা ইখতিয়ার এবং নবী সুলভ আচরণের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে, ওগুলো থেকে দু'চার কাহিনী নমুনা হিসেবে পেশ করছিঃ

প্রথম কাহিনী

তযকিরাতুর রশীদ এর লিখক বর্ণনা করেন যে অনেকবার তাঁর পবিত্র মুখ থেকে এটা বলতে শুনা গেছেঃ

"শুনুন, হক সেটাই যা রশীদ আহমদের মুখ থেকে বের হয় এবং শপথ করে বল্‌ছি যে আমি কিছু নই কিন্তু এ যুগে হেদায়েত ও নাজাত আমার অনুসরণের উপর নির্ভরশীল (তযকিরাতুর রশীদ ২য় খন্ড ১৭ পৃঃ)

পক্ষপাতিত্বের প্রেরণা থেকে পৃথক হয়ে কেবল এক মুহূর্তের জন্য চিন্তা করে দেখুন, তিনি এটা বলছেন না যে রশীদ আহমদ সাহেবের মুখ থেকে যা কিছু বের হয়, তা হক বরং তাঁর বাক্যের অর্থ হচ্ছে হক কেবল রশীদ আহমদের মুখ থেকেই বের হয়। উভয় বাক্যের পার্থক্য এভাবে বুঝে নিন যে প্রথম বাক্যে কেবল হক প্রকাশ পাওয়াটা বুঝায়। কিন্তু দ্বিতীয় বাক্যে হকের কথা বলার সাথে সাথে তৎকালীন সমস্ত ইসলামী মনীষীগণের হকের ব্যাপারে একটি সুস্পষ্ট চ্যালেঞ্জও বটে। অর্থাৎ এর ভাবার্থ হচ্ছে ওই মওলভী রশীদ আহমদ ছাড়া কেউ হকের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না।

আফ্‌সোস। গাঙ্গুহী সাহেবের এ দাবী প্রচার করতে গিয়ে দেওবন্দী আলেমগণ এটা মোটেই চিন্তা করলো না যে এতে অন্যান্য হক্কানী আলমেগণের প্রতি কীযে সুস্পষ্টভাবে অবজ্ঞা প্রকাশ করা হয়েছে।

শেষের এ বাক্যটা 'এ যুগে হেদায়েত ও নাজাত আমার অনুসরণের উপর নির্ভরশীল।' প্রথমটার থেকেও আরও মারাত্মক এবং ক্ষতিকর। যেন নাজাতের জন্য রসুলে আরবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর অনুসরণ যথেষ্ট নয়।

চিন্তার বিষয় হচ্ছে, কারো অনুসরণের উপর নাজাত নির্ভরশীল হওয়াটা কেবল রসুলের শান হতে পারে। নায়েবে রসূল হিসেবে আলেমগণের পদমর্যাদা

কেবল এতটুকু যে ওনারা লোকদেরকে রসুলের অনুসরণের দাওয়াত দিতে পারেন, নিজের অনুসরণের দাওয়াত দেয়াটা মোটেই ওনাদের পদমর্যাদা সম্মত নয়। কিন্তু এটা পরিস্কার বুঝা যায় যে গাঙুহী সাহেব এ পদমর্যাদার উপর সন্তুষ্ট নন।

এক দিকে গাঙুহী সাহেব স্বীয় অনুসরণের দাওয়াত দিয়ে লোকদেরকে তাঁর হুকুম এবং তাঁর রীতি নীতির অনুসারী বানাতে চায়। অন্যদিকে তাঁদের জমাতের মূল কিতাব তকবিয়াতুল ঈমানের ফরমান হচ্ছেঃ

"কারো রীতিনীতি মান্য করা এবং ওর বাক্যকে স্বীয় সনদ মনে করাটা ওসব বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত যেগুলো আল্লাহ তাআলা স্বীয় তাজিমের জন্য নির্দিষ্ট করেছেন। যে কেউ যদি ব্যাপারটা কোন সৃষ্টিকূলের সাথে করে তাহলে এর জন্যও শিরক প্রমাণিত হয়। তকবিয়াতুল ঈমান ৪২ পৃঃ

এখন এটা আমাদের দায়িত্ব নয় যে এ অভিযোগের উত্তর দেয়াটা যে, যে বিষয় কোন মখলুকের ক্ষেত্রে শিরক ছিল, সেটা গাঙুহী সাহেবের ক্ষেত্রে হঠাৎ কি করে নাজাতের উপায় হয়ে গেল? কোন জায়গায় নাজাতের দরজা বন্ধ এবং কোন জায়গায় এটা ছাড়া নাজাত নেই। মোট কথা এটা কোন্ ধরণের হেঁয়ালিপনা?

দ্বিতীয় কাহিনী

"গোয়ালিয়র জিলার পুলিশ ইন্সপেক্টর মওলভী আবদুস সুবহান বলেন, একবার গোয়ালিয়ার কমিশনার (রাজস্ব) মওলভী মুহাম্মদ কাসিম সাহেব খুবই দুঃচিন্তাগ্রস্থ হয়ে পড়েন, কারণ রাজস্ব বিভাগ থেকে তার কাছে তিন লাখ টাকা দাবী করা হয়। তাঁর ভাই এ খবর পেয়ে হযরত মাওলানা ফজলুর রহমান সাহেব (রহমতুল্লাহে তাআলা আলাইহে) এর খেদমতে সুদুর গঞ্জ মুরাদাবাদে পৌছেন। হযরত মাওলানা বাড়ী কোথায় জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি আরয করলেন, দেওবন্দ। মাওলানা আশ্চর্য হয়ে বললেন, নিকটবর্তী হযরত মাওলানা গাঙুহী সাহেবের খেদমতে না গিয়ে এত দূরত্বের সফর কেন করলেন? তিনি আরয করলেন, হুযুর আমার মনোবাসনা আমাকে এখানে নিয়ে এসেছে। মাওলানা ইরশাদ ফরমালেন তুমি গাঙুহ যাও। তোমার সমস্যার সমাধানে হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ সাহেবেরই দুআর উপর নির্ভরশীল। তিনি ছাড়া পৃথিবীর সমস্ত আওলিয়াও যদি দুআ করে, কোন কাজ হবে না।" (তাযকিরাতুর রশীদ ২য় খন্ড ২১৫ পৃঃ)

কথা যেহেতু আপন শেখের ফযীলত ও মরতবা সম্পর্কিত, সেহেতু এখানে এমন কোন প্রশ্ন উথাপন করা হলো না যে মাওলানা ফজলুর রহমান সাহেবের কাছে অদৃশ্যের এ ভেদ কিভাবে জানা হয়ে গেল যে, সমস্যার সমাধান একমাত্র মওলভী রশীদ আহমদের দুআর উপর নির্ভর এবং কোন্ বিদ্যার বদৌলতে তিনি পৃথিবীর সমস্ত ওলীগণের দুআ সমুহের ফলাফল পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জেনে নিলেন, যেটা একমাত্র খোদার সত্বার সাথে সম্পর্কিত এবং তাও এত তাড়াতাড়ি যে এদিকে মুখ থেকে কথা বের হলো, অন্যদিকে আরশ থেকে ফরশ পর্যন্ত অদৃশ্য ও গোপন বিষয়ের সমস্ত অবস্থাদি জানা হয়ে গেল।

আল্লাহ থেকে পানা। আপন শেখের উচ্চ মর্যাদা প্রমাণ করার জন্য এক দিকে নিজস্ব আকীদাকে বিসর্জন দিল, অন্যদিকে পৃথিবীর সমস্ত আওলিয়া কিরামের মান মর্যাদাকেও ঘায়েল করলো।

তৃতীয় কাহিনী

'যে সময় ইমকানে কিযব (আল্লাহ মিথ্যা বলতে পারে) মাসআলার ব্যাপারে তাঁর বিরোধীগণ হৈ চৈ শুরু করলো এবং কুফরীর ফত্ওয়া দিল, সে সময় সায়িন তোয়াক্কল শাহ আম্বালভীর মাহফিলে কোন এক মওলভী ইমাম রব্বানীর (গাঙ্গুহী সাহেব) কথা উঠালো এবং বললো যে তিনি ইম্কানে কিযবে বারী তাআলার বিশ্বাসী। এটা শুনে সায়িন তোয়াক্কল শাহ মাথা নীচু করলেন এবং কিছুক্ষণ মুরাকিবা অবস্থায় রয়ে মুখ উঠায়ে স্বীয় পাঞ্জাবী ভাষায় এ কথাটুকু বললেনঃ

জনগণ! তোমরা কি বল? আমি রশীদ আহমদ সাহেবের কলম আরশের উপর চলতে দেখতেছি।" (তাযকিরাতুর রশীদ ২য় খন্ড ৩২২ পৃঃ)

কি বুঝতেছেন? এ কথার ভাবার্থ এটা নয় যে মওলভী রশীদ আহমদের কলম দৈর্ঘে আরশের সীমানা অতিক্রম করেছিল বরং একথা প্রচার করে এটা দাবী করাটাই উদ্দেশ্য ছিল যে তকদীরের লিখন তারই কলমের দ্বারা লিখা হচ্ছিল এবং ভাগ্য ও তকদীর তারই কলমের খোঁচার উপর নির্ভর দেয়া হয়েছিল।

আর সায়িনের দূর দৃষ্টির কথা কি আর বলবো। তিনিতো পৃথিবীতে বসে বসে আরশের সেই পাড়ের দৃশ্য দেখে নিল।

এ কাহিনীতে সবচে হাস্যকর বিষয় হচ্ছে দেওবন্দী চিন্তাবিদগণ একজন পাগলের কথাকে অগ্রাহ্য করার পরিবর্তে ওটা শুধু গ্রহণ করেনি বরং এটাকে নিজেদের আকীদা হিসেবে মেনে নিয়েছে। যেমন একই কিতাবের লিখক বর্ণনা করেনঃ

> মওলভী বেলায়েত হুসাইন ফরমান, আমার হজ্ব যাত্রার সফর সঙ্গীর মধ্যে আমবালার এক হাকীম সাহেব ছিলেন। যিনি আলা হযরত হাজী ইমদাদুল্লার মুরীদ ছিল। সেই সুবাদে ইমাম রব্বানীর (গাঙ্গুহী) সাথে তার পরিচয় ছিল। তিনি বলেছেন, আমারতো এটাই বিশ্বাস যে মাওলানার মুখ থেকে যে কথা বের হয়, সেটা তকদীরে ইলাহীর মুতাবিক হয়ে থাকে। তযকিরাতুর রশীদ-২য় খন্ড ২১৯ পৃঃ

এ বক্তব্যটা যদি বিশুদ্ধ হয়, তাহলে এর বিশুদ্ধতার দু'টি সুরত আছে। হয়তো গাঙুহী সাহেব আল্লাহর সম্পূর্ণ নির্ধারিত বিষয় সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। ফলে এর বিপরীত মুখ খুলেন নি বা ওনার মুখে জিহবা ছিল না এবং কুন্ (হয়ে যাও) এর চাবী ছিল, ফলে যে কথা মুখ থেকে বের হলো, সেটা সৃষ্টিকূলের তকদীর হয়ে গেল।

এ দু'টার যেটাই গ্রহণ করা হোক না কেন, দেওবন্দী আকীদার উপর একটি আঘাত নিশ্চয় আসবে।

চতুর্থ কাহিনী

মুখলিসুর রহমান নামে গাঙুহী সাহেবের এক মুরীদ ছিল। ওর সম্পর্কে তযকিরাতুর রশীদ এর লিখক বর্ণনা করেনঃ

> "একদিন খান্‌কাতে শুইয়ে স্বীয় কাজকর্ম নিয়ে চিন্তাভাবনারত অবস্থায় কিছুটা শিহরিয়ে উঠলো এবং দেখলো যে হযরত শাহ ওলীউল্লাহ (কুঃ সি) সামনে দিয়ে তশরীফ নিয়ে যাচ্ছেন এবং চলমান অবস্থায় ওনাকে লক্ষ্য করে এভাবে নির্দেশ দান করলেন যা চাওয়ার আছে হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ থেকে চাও।" (তযকিরাতুর রশীদ ২য় খন্ড ৩০৯ পৃঃ)

শাহ ওলীউল্লাহ সাহেব এবং তাঁর পরিবারকে হিন্দুস্থানে আকীদায়ে তাওহীদের সবচে বড় হেফাজতকারী মনে করা হয়। কিন্তু খুবই আশ্চর্যের বিষয়

যে তিনি খোদাকে বাদ দিয়ে মওলভী রশীদ আহমদ থেকে সবকিছু চাওয়ার জন্য পরামর্শ দিলেন। শাহ সাহেবের প্রতি এত বড় শিরকের অপবাদ করতে গিয়ে কাহিনী বর্ণানকারীর লজ্জাবোধ করা উচিত ছিল। একদিকে আপন 'মাওলানা'কে ক্ষমতাবান ও হস্তক্ষেপকারী প্রমাণ করার জন্য শাহ ওলীউল্লাহ সাহেবের মুখ দিয়ে এটা বলানো হচ্ছে, অন্যদিকে স্বীয় তাওহীদবাদের ডংকা বাজানোর জন্য এ আকীদা প্রকাশ করা হয়ঃ

"প্রত্যেকের উচিত, নিজের চাহিদার জিনিসগুলো স্বীয় রব থেকে কামনা করা। এমনকি লবনও যেন তাঁর থেকে কামনা করে এবং জুতার ফিতা যখন ছিড়ে যায় সেটাও যেন তার থেকে কামনা করে।" (তকবিয়াতুল ঈমান ৩৪ পৃঃ)

উপরোক্ত ঘটনায় মুরীদের অদৃশ্য বিষয় অবলোকন করার ক্ষমতা এত যে জোড়ালো ছিল যে কপালের চোখে সে এক ওফাত প্রাপ্ত বুযুর্গকে দেখে নিলেন এবং ওর সাথে কথা বলারও সৌভাগ্য হলো। ওর দৃষ্টির সামনে আলমে বরযখের কোন আবরণ প্রতিবন্ধক হলো না এবং শাহ সাহেবের স্বীয় কবর থেকে বের হয়ে ওর সামনাসামনি আসতে কোন কিছু বাঁধা দায়ক হলো না।

দেখ্‌লেন তো, তাওহীদের সোল এজেন্টরা শরীয়তের কত রকম বিধান' তৈরী করে রেখেছে? নবী ও ওলীগণের জন্য এক রকম এবং আপন বুযুর্গদের জন্য অন্য রকম। আছে কোন ইনসাফকারী? যে এ সুবিধাবাদের ইনসাফ করে এবং সত্যের পূজারীদেরকে সেই হকের রাস্তাটা দেখাবে, যেটা ইসলাম ওদেরকে প্রদান করেছে?

পঞ্চম কাহিনী

আগ্রায় মুন্‌শী আমীর আহমদ নামে এক ভদ্রলোক বাস করতেন। 'তযকিরাতুর রশীদ' এর লিখক ওনার এক অদ্ভুত স্বপ্নের কথা ওনার ভাষায় উদ্ধৃত করেছেন। তিনি বর্ণনা করেন,

"গঙুহের অধিবাসী শিয়া মাযহাবের অনুসারী এক ব্যক্তি মারা গেল। আমি ওকে স্বপ্নে দেখা মাত্র ওর হাতের উভয় বুড়ো আঙুল ধরে ফেল্‌লাম। সে ঘাবরিয়ে গেল এবং পেরেশান হয়ে বল্‌লো, যা জিজ্ঞাসা করার আছে, তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা কর, আমার কষ্ট হচ্ছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আচ্ছা এটা বল যে মৃত্যুর পর তোমার উপর কি ঘটেছিল এবং এখন কোন্ অবস্থায় আছ?

সে জবাব দিল, কঠিন শাস্তিতে লিপ্ত আছি। অসুখের সময় মাওলানা রশীদ আহমদ সাহেব দেখার জন্য তশরীফ এনেছিলেন। শরীরের যতটুকু অংশ মওলভী সাহেব হাত লেগেছে, ততটুকু অংশ আযাব থেকে রেহাই পেয়েছে, শরীরের বাকী অংশে ভীষণ আযাব হচ্ছে। এর পর চোখ খুলে গেল।" তযকিরাতুর রশীদ ২য় খন্ড ৩২৪ পৃঃ

'তযাকিরাতুর রশীদ' এর লিখক একই রকম আর একটি স্বপ্ন মওলভী ইসমাঈল নামে এক দেওবন্দী বুযুর্গের কোন এক খাদেম সম্পর্কে উদ্ধৃত করেছেন। একই সাথে সেটাও পড়ে নিন। তিনি লিখেনঃ

মওলভী ইসমাঈল সাহেবের এক খাদেম ছিল। যখন সে মারা যায়, তখন কোন একজন ওকে স্বপ্নে দেখলো যে ওর সমস্ত শরীরে আগুন লেগেছে কিন্তু হাতের তালুদ্বয় সঠিক ও নিরাপদ আছে। সে জিজ্ঞাসা করলো–ভাই কি অবস্থায় আছেন? সে উত্তর দিল কী আর বল্‌বো, কাজের পরিনাম ফল ভোগ করতেছি, সমস্ত শরীরে কষ্ট হচ্ছে কিন্তু এ হাত হযরত মাওলানার পায়ের সাথে লেগেছিল। তাই হুকুম হয়েছে, এতে আগুন লাগাতে আমার লজ্জাবোধ হয়। (তযকিরাতুর রশীদ ২য় খন্ড ৭২ পৃঃ)

দেখ্‌লেনতো? আল্লাহর দরবারে এদের কি সম্মান ও গ্রহণ যোগ্যতা? পরকালের আজাব থেকে উদ্ধার করার জন্য মুখ নাড়ারও প্রয়োজন হয়নি। কেবল হাত লাগানোটা যথেষ্ট হয়ে গেল এবং শিয়ার মত বিপথগামীও হাতের বরকত থেকে বঞ্চিত রইলো না।

এসব হযরতদের মান–সম্মান শুধু নিম্ন জগতে নয়, বরং উর্ধ জগতেও এদের শান শওকতের ডংকা বাজ্‌তেছে। কিন্তু রসুলে খোদা মাহবুবে কিবরিয়া (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) সম্পর্কে এদের আকীদা হচ্ছেঃ

আল্লাহ সাহেব স্বীয় পয়গম্বরকে নির্দেশ দিলেন যে লোকদের বলে দাও আমি তোমাদের লাভ–ক্ষতি কোনটার মালিক নই এবং তোমাদের মধ্যে যারা আমার উপর ঈমান এনেছ এবং আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত হয়েছ, সেটার জন্য অহংকারী হয়ে এ বলে সীমা লংঘন কর না যে আমাদের খুঁটি মজবুত, আমাদের দূত শক্তিশালী এবং আমাদের সুপারীশকারী বড় প্রিয়। সুতরাং আমরা যা ইচ্ছে তা করতে পারি, তিনি আমাদেরকে আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা

করবেন। কেননা, এধরণের কথা নিছক ভুল মাত্র। এজন্য যে আমি নিজের ভয় করছি এবং নিজে আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা পাব কিনা জানিনা। তাই অন্যদেরকে কিভাবে রক্ষা করতে পারবো? (তকবিয়াতুল ঈমান ৪৮ পৃঃ)

এখানে আমি এর থেকে অতিরিক্ত আর কিছু বলতে চাই না। আপনারাই স্বীয় ঈমানকে সাক্ষী করে ফয়সালা করুন। কলমের এ খোঁচার দ্বারা রসূলে আরবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর অনুসারীদের মনে আঘাত দিল কিনা?

কথা প্রসঙ্গে মাঝখানে এ কথা এসে গেল। এখন পুনরায় আসল বিষয়ে ফিরে যাচ্ছি।

(২) গাঙুহী সাহেবের গায়বী ক্ষমতা প্রয়োগের অদ্ভুত ঘটনা

হাজী দোস্ত মুহাম্মদ খান নামে এক পুলিশ অফিসার ছিল। 'তযকিরাতুর রশীদ' এর প্রণেতা ওর ছেলে সম্পর্কে এ ঘটনাটি উদ্ধৃত করেছেনঃ

হাজী দোস্ত মুহাম্মদ খানের ছেলে আবদুল ওহাব খান এক পীরের ভক্ত হয়ে গিয়েছিল এবং ওর মুরীদ হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। সে যে লোকটির কাছে বায়াত হতে চাচ্ছিল, সে লোকটি কেবল চেহারা-সুরতে দরবেশ ছিল কিন্তু বাস্তবে সে ছিল এক পূর্ণ দুনিয়াদার। সে জন্য দোস্ত মুহাম্মদ খানের কাছে ছেলের বাসনা পছন্দ হলো না এবং কয়েকবার নিষেধ করলো, সেই ব্যক্তির কাছে মুরীদ হয়ো না। (তযকিরাতুর রশীদ ২য় খন্ড ২১৫ পৃঃ)

শত বাঁধা দেয়ার পরও আবদুল ওহাব খান স্বীয় সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করলো না। শেষ পর্যন্ত একদিন মুরীদ হওয়ার নিয়তে রওয়ানা হলো। পরের ঘটনা শুনুন

"শেষ পর্যন্ত হাজী সাহেব যখন ছেলের অটলতা দেখলো, তখন চিরাচরিত স্নেহ পরায়নতার কারণে দুআর জন্য হাত উঠালেন এবং ধ্যানমগ্ন হয়ে হযরত গাঙুহীর প্রতি মনোনিবেশ করে একাগ্রচিত্তে বসে রইলেন। তযকিরাতুর রশীদ ২য় খন্ড ২১৫ পৃঃ

এদিকে বাপ স্বীয় পীরকে হাযির নাযির ধ্যান করে মুনাজাতে বসে আছে আর ওদিকে ছেলের কি অবস্থা হয়েছে শুনুনঃ

আবদুল ওহাব স্বীয় ভাবী পীরের কাছে গেলেন এবং আদব সহকারে দু'জানু হয়ে বসে পড়লেন। তখন অনিয়ন্ত্রিতভাবে পীরের মুখ থেকে বের হলো-প্রথমে বাপ থেকে অনুমতি নিয়ে এসো। এটা ছাড়া বায়াত কল্যাণকর নয়। মোট কথা, হাত বায়াত করানোর জন্য ধরে ছেড়ে দিলেন এবং প্রত্যাখান করলেন। ২১৬ পৃঃ

এবার ঘটনার আসল বক্তব্য বিমুগ্ধ হয়ে শুনুনঃ

হাজী সাহেব বল্‌লেন, যে সময় আমি ইমামে রব্বানী (গাঙুহী) এর ধ্যান মগ্ন হলাম, তখন দেখলাম যে হুযুর (গাঙুহী) একান্ত স্নেহসহকারে আবদুল ওহাবের হাত ধরে আমার হাতে তুলে দিলেন এবং এ রকম বল্‌লেন-ধর এখন আর সে ওর মুরীদ হবে না।' এটা সেই সময় ছিল। যখন উনি আবদুল ওহাবের হাত ছেড়ে দিয়েছিল এবং এ বলে বায়াত করাতে অস্বীকার করলো-'বাপের অনুমতি নিয়ে এসো" তযকিরাতুর রশীদ ২১৬ পৃঃ

দেখলেন তো? নিজের মুরশিদের বেলায় কী যে আস্থা!

এদিকে হাজী সাহেব ধ্যান করলো, ওদিকে গাঙুহী সাহেবের সবকিছু জানা হয়ে গেল এবং শুধু জানা হয়নি বরং ওখানে বসে ছেলের হাত ধরে বাপের হাতে তুলে দিল। অন্য দিকে পীরের মনেও হস্তক্ষেপ করলো যে তিনি বাহ্যিক কোন কারণ ছাড়াই হঠাৎ মুরীদ করার থেকে অস্বীকৃতি জানালেন আর হাজী সাহেবের গায়বী উপলব্ধি ক্ষমতার কথা কী আর বলার আছে যে তিনি স্বীয় নির্জন প্রকোষ্ট থেকেই দেখে নিল যে, গাঙুহী সাহেব ছেলের হাত ধরে বাপের হাতে তুলে দিচ্ছেন এবং ওনার আওয়াজও শুনেছেন 'ধর, এখন আর সে ওর মুরীদ হবে না।' চোখের সামনের আবরণসমূহ প্রতিবন্ধক হলো না এবং দূর থেকে কান পর্যন্ত আওয়াজ পৌছার ব্যাপারে কোন বিঘ্নসৃষ্টি হলো না। এতো গেল স্বীয় বুযুর্গদের ব্যাপারে দেওবন্দীদের আকীদা বা বিশ্বাস, এবার নবীগণের বেলায় তাদের আকীদা কি, একটু পড়ে দেখুনঃ

"যে কেউ কারো আকৃতির ধ্যান করে এবং এটা মনে করে যে যখন আমি মুখে বা অন্তরে ওনার নাম উচ্চারণ করি বা ওনার আকৃতি বা কবরের ধ্যান করি, তাহলে ওখানে ওনার জানা হয়ে যায়....সুতরাং এসব কথার দ্বারা

মুশরিক হয়ে যায় এবং এ রকম সব কথা শিরক, যদিওবা এ বিশ্বাস নবী ও ওলীগণের বেলায় রাখা হয় বা পীর ও শহীদদের বেলায় অথবা ইমাম ও ইমামজাদার বেলায় বা ভুত-পরীর বেলায় অথবা এ রকম মনে করে যে বিষয়টা ওনার সত্বাগত বা খোদা প্রদত্ত। মোট কথা এ ধরণের বিশ্বাস দ্বারা যে কোন অবস্থায় শিরক প্রমাণিত হয়। তকবিয়াতুল ঈমান-৮ পৃঃ

এ প্রসঙ্গে সবচে মজার বিষয় হচ্ছে স্বয়ং মওলভী রশীদ আহমদ গাঙুহী সাহেবের এ ফত্ওয়া যেটা ফত্ওয়ায়ে রশিদিয়ায় প্রকাশ করা হয়েছে।

"কোন একজন জানতে চেয়েছেন যে মুরাকাবায় আওলিয়া কিরামের ধ্যান করা কেমন? এবং এটা জানা দরকার যে ওনাদের ধ্যান করার সাথে সাথে ওনারা আমাদের কাছে মওজুদ হয়ে যায় এবং আমাদেরও জানা হয়ে যায়-এ রকম বিশ্বাস করা কেমন?

উত্তরঃ এ রকম ধ্যান ঠিক নয়, শিরকের আশংকা আছে।" (ফতওয়ায়ে রশিদিয়া ১ম খন্ড ৮ পৃঃ)

ওটা ছিল ঘটনা, এটা হলো আকীদা এবং উভয়ের মধ্যে যে পার্থক্যটা বিরাজমান, তা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। এখন এ অভিযোগ কার কাছে করা যায় যে শুদ্ধ অশুদ্ধ ও সঠিক-বেঠিক মাপার জন্য দেওবন্দীদের কাছে পৃথক পৃথক বাটখাড়া কেন?

আছে কেউ ন্যায়ের পুজারী, যিনি ন্যায় ভাবে বিচার করবেন?

(৩) 'কে কখন মারা যাবে' সে বিষয়ের জ্ঞানঃ

মওলভী আশেকে ইলাহী মিরটী "তাযকিরাতুর রশীদে" এমন অনেক ঘটনা উদ্ধৃত করেছেন, যেগুলো থেকে জানা যায় যে গাঙুহী সাহেবের কাছে নিজের ও অন্যদের মৃত্যুর জ্ঞানও ছিল যে কে কখন মারা যাবে। নিম্নে কয়েকটি ঘটনা বর্ণিত হলোঃ

প্রথম ঘটনা

লিখা হয়েছে যে একবার নওয়াব ছাতারী মারাত্মক অসুখে পতিত হয়। এমন কি লোকেরা তাঁর আরোগ্যের আশা ছেড়ে দিলেন। সব দিক থেকে নিরাশ হয়ে যাবার পর এক ব্যক্তিকে গাঙুহী সাহেবের খেদমতে পাঠানো হলো, যেন নওয়াব

নওয়াব সাহেবের জন্য দুআ করে। বার্তাবাহক ওখানে পৌঁছে ওনার কাছে দুআর প্রার্থনা করলেন। এর পরের ঘটনা স্বয়ং ঘটনা বর্ণনাকারীর ভাষায় শুনুনঃ

> তিনি (গাঙুহী) মজলিসে উপস্থিত সকলকে বল্‌লেন, ভাইগণ দুআ করুন। যেহেতু হুযুর স্বয়ং দুআ করার ওয়াদা করেন নি, সেহেতু চিন্তা করা হলো এবং পুনরায় আরয করা হলো হুযুর, আপনি দুআ করুন। তখন তিনি ফরমালেন, হুকুম চূড়ান্ত হয়ে গেছে এবং জিন্দেগীর মাত্র কয়েক দিন বাকী আছে। হুযুরের এ বক্তব্যের পর আবেদন নিবেদনের কোন অবকাশ রইলো না এবং নওয়াব সাহেবের জিন্দেগী সম্পর্কে সবাই হতাশ হয়ে গেল। তযকিরাতুর রশীদ ২য় খন্ড ২০৯ পৃঃ

কিন্তু বার্তাবাহকের কাছে গাঙুহী সাহেবের সর্বময় ক্ষমতার প্রতি কী যে আস্থা ছিল, তা বর্ণনাপূর্বক লিখেনঃ

> 'তথাপি বার্তাবাহক আরয করলো, হুযুর এ দুআটা করুন যে নওয়াব সাহেবের জ্ঞান ফিরে আসে এবং ওসীয়ত ও সরকারী ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে যা কিছু বলার বা শুনার আছে, তা যেন বলে বা শুনে যেতে পারেন। তিনি বললেন, "ঠিক আছে, এটার কোন চিন্তা নেই।" এর ওপর দুআ করলেন এবং এটা বললেন-ইনশাআল্লাহ আরোগ্য লাভ করবে।" তাযকিবাতুর রশীদ ২০৯ পৃঃ

এরপর লিখেনঃ

> কথামত সে রকমই হলো যে নওয়াব সাহেবের হঠাৎ জ্ঞান ফিরে আসলো এবং এ রকম আরোগ্য লাভ করলেন যে দূর-দূরান্ত পর্যন্ত তাঁর আরোগ্য ও স্বাস্থ্যের সুসংবাদ পৌঁছে গেল। কারো মনেও কোন ধারনা রইলো না যে কি ঘটতে যাচ্ছে? হঠাৎ অবস্থা পুনরায় পরিবর্তন হয়ে গেল এবং খুবই ভাল, বড় দানশীল ও নেককার শাসক ইন্তেকাল করেন। তযকিরাতুর রশীদ ২০৯ পৃঃ

দেখলেন তো? খোদায়ী নির্দেশের উপর ক্ষমতা প্রয়োগের কী অদ্ভুত দৃশ্য!

যেন সম্পূর্ণ ভাগ্য লিপি চোখের সামনে, এমনকি এটাও জানা আছে যে কি হতে পারে এবং কি হতে পারে না, কোন্ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার অবকাশ আছে এবং কোন্ বিষয়ে অবকাশ নেই। যেন অদৃষ্টের ব্যাপারটা একেবারে ওদের ঘরোয়া বিষয়ে পরিণত হয়ে গেল।

বিবেচনার বিষয় হচ্ছে, একদিকে দেওবন্দী আলেমদের দৃষ্টিতে আপন বুযুর্গদের এ মরতবা, অন্য দিকে মাহবুবে কিবরিয়া (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর বেলায় ওদের আকীদার ভাষ্য হচ্ছেঃ

"পৃথিবীর সমস্ত কাজকর্ম আল্লাহরই ইচ্ছায় হয়ে থাকে, রসুলের ইচ্ছায় কিছু হয় না" তকবিয়াতুল ঈমান-২২ পৃঃ

এবার আপনারাই বিচার করুন একজন উম্মতের জন্য এটা কি সীমাহীন বাড়াবাড়ি নয় কি?

দ্বিতীয় ঘটনা

মওলভী সাদেকুল ইয়াকীন নামে কোন এক ব্যক্তি মওলভী রশীদ আহমদ গাঙুহীর অন্যতম বন্ধু ছিলেন। ওনার সম্পর্কে তযকিরাতুর রশীদ এর প্রণেতা মওলভী আশেকে ইলাহী মিরটী এ ঘটনাটি উদ্ধৃত করেছেনঃ

হযরত মাওলানা সাদেকুল ইয়াকীন সাহেব (রহমতুল্লাহে তাআলা আলাইহে) একবার কঠিন রোগে আক্রান্ত হন। ঘনিষ্ট বন্ধুবান্ধবগণও এ খবর শুনে খুব মর্মাহত হয়ে গেলেন এবং হুযুরের কাছে আরয করলেন দুআ করুন, হুযুর নিশ্চুপ রইলেন এবং কথা অন্যদিকে ফিরায়ে দিলেন। যখন দ্বিতীয়বার আরয করা হলো, তখন তিনি সান্তনা দিলেন এবং বল্‌লেন, 'মিয়া, উনি এখন মারা যাবে না এবং মরলেও আমার পরে।

কথামত তা-ই হলো। সেই রোগ থেকে আরোগ্য হয়ে গেলেন এবং হুযুরের ইন্তেকালের পর সেই বছরই শাওয়াল মাসে হজ্ব করতে গেলেন, মক্কা শরীফে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। অসুখ নিয়ে আরাফাত গমন করলেন। এখানেই মহরমের প্রারম্ভে ইন্তেকাল করেন এবং জান্নাতুল মুয়াল্লায় দাফন করা হয়।" তযকিরা ২য় খন্ড ২০৯ পৃঃ

দেখুন, শুধু এতটুকু জানা ছিল না যে উনি এখন মারা যাবেন না বরং এটাও জানা ছিল যে কখন মারা যাবে। 'সে আমার পরে মারা যাবে।" এ একটি বাক্য উভয়ের খবর প্রকাশ করে দিল। একেই বলে অদৃশ্য জ্ঞান। জিব্রাইলের জন্যও অপেক্ষা করতে হলো না এবং খোদার পক্ষ থেকে অবহিত হওয়ার প্রয়োজন বোধ করলেন না।

তৃতীয় ঘটনা

মওলভী নযর মুহাম্মদ খান নামে এক ব্যক্তি ছিলেন, যিনি গাঙুহী সাহেবের দরবারের খাদেম ছিলেন। ওনার সম্পর্কে 'তযকিরাতুর রশীদ' এর লিখকের এ বর্ণনাটা পড়ুনঃ তিনি লিখেনঃ

> মওলভী নযর মুহাম্মদ খান একবার পেরেশান হয়ে আরয করলো–হুযুর অমুক ব্যক্তি যে আব্বাজানের সাথে শত্রুতা পোষণ করতো, ওনার ইন্তেকালের পর এখন আমার সাথে শত্রুতা পোষণ করে। অপ্রত্যাশিতভাবে তার মুখ থেকে বের হলো "সে কত দিন বেঁচে থাকবে।" কয়েকদিন পর হঠাৎ সেই ব্যক্তি মারা গেল। (তযকিরাতুর রশীদ ২য় খন্ড ২১৪ পৃঃ)

হয়তো গাঙুহী সাহেবের কাছে ওর জিন্দেগীর অবশিষ্ট দিনগুলোর কথা জানা হয়ে গিয়েছিল এবং তিনি প্রশ্নবোধক সুরে তা প্রকাশ করে দিলেন অথবা এটাও বলা যেতে পারে যে গাঙুহী সাহেবের মুখ থেকে সেই শব্দ বের হবার সাথে সাথে ওর মৃত্যু অবধারিত হয়ে গেল এবং ওকে বাধ্য হয়ে মৃত্যুবরণ করতে হলো। সম্ভাব্য এ দু'টি ধারণার যেটাই গ্রহণ করা হোক না কেন, দেওবন্দী মাযহাবের পক্ষে শিরক থেকে রেহাই পাওয়ার উপায় নেই।

চতুর্থ ঘটনা

এতক্ষণ পর্যন্ত অন্যদের মৃত্যু জ্ঞান সম্পর্কিত ঘটনাবলী বর্ণিত হলো। এবার স্বয়ং মওলভী রশীদ আহমদ গাঙুহী সাহেবের স্বীয় ঘটনা শুনুন। তার জীবনী রচয়িতা তাঁর মৃত্যুর আসল তারিখ এভাবে উদ্ধৃত করছেনঃ

> বিভিন্নমতে ৮ বা ৯ই জমাদিউচ্ছানী মুতাবিক ১১ই আগষ্ট ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে জুমাবার আযানের পর সাড়ে বারোটায় তিনি এ দুনিয়াকে বিদায় জানান। তযকিরাতুর রশীদ ৩৩১ পৃঃ

এরপর এ বিবরণটা পড়ুনঃ

> হযরত ইমাম রব্বানী (গাঙুহী) কুঃ সি ছয়দিন আগ থেকে জুমাবারের অপেক্ষায় ছিলেন। শনিবারে জিজ্ঞাস করলেন আজ কি শুক্রবার? খাদেম আরয করলেন, হুযুর আজ তো শনিবার। এরপর মাঝখানে আরও কয়েকবার জুমার

কথা জিজ্ঞাসা করলেন। শেষ পর্যন্ত জুমার দিন সকালে যেদিন তিনি ইন্তেকাল করেন, পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, আজ কি বার? যখন জান্‌তে পারলেন যে জুমার দিন, তখন বল্‌লেন ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন। তযকিরাতুর রশীদ ২য় খন্ড ৩৩১

এ বর্ণনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে ছয় দিন আগেই তিনি স্বীয় মৃত্যুর ব্যাপারে অবহিত হয়ে গিয়েছিলেন। এবং এ অবহিত হওয়াটা এত নিঃসন্দেহমূলক ছিল যে, যখন জুমাবার আসলো, তখন তিনি ইন্না লিল্লাহে পড়ে নিলেন।

লক্ষ্য করুন, একদিকে ঘরের বুযুর্গদের জন্য তাদের এ উদার মনোভাব এবং অন্যদিকে সেই মৃত্যুর জ্ঞান সম্পর্কে নবী ও ওলীগণের বেলায় তাদের আকীদা হচ্ছেঃ

"অনুরূপ, যখন কেউ স্বীয় অবস্থা সম্পর্কে জানে না যে কাল কি করবে, তাহলে অন্যদের ব্যাপারে কিভাবে জানতে পারে এবং যখন নিজের মৃত্যুর স্থান সম্পর্কে অবহিত নয়, তখন অন্যদের মৃত্যুর স্থান বা সময় কিভাবে জানতে পারে।" তকবিয়াতুল ঈমান ২৩ পৃঃ

এখন আপনারাই ফয়সালা করুন, উপরোক্ত ঘটনাবলী থেকে কি এ বাস্তব বিষয়টা পরিস্কার ভাবে প্রকাশ পায় না যে শিরক ও অস্বীকারের এ সমস্ত বিবরণ যা দেওবন্দী কিতাবসমূহে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত রয়েছে, তা কেবল নবী ও ওলীগণের বেলায় প্রযোজ্য। আপন বুযুর্গদের বেলায় ওগুলোর প্রয়োগ মোটেই হয় না।

(৪) গায়বী উপলব্ধি ক্ষমতার এক অনন্য ও দুর্লভ কাহিনী

'তযকিরাতুর রশীদ' এর লিখকের ভাষায় মওলভী গাঙুহী সাহেবের সম্পর্কে আর একটি অনন্য ও দুর্লভ কাহিনী শুনুন। মওলভী রশীদ আহমদ গাঙুহী সাহেবের ভক্তদের মধ্যে মীর ওয়াজেদ আলী কনুজী নামক এক ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর থেকেই কাহিনীটি সংগ্রহ করা হয়েছে। তিনি লিখেনঃ

"মীর ওয়াজেদ আলী কনুজী বলেন, আমার মুরশিদ হযরত মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম সাহেব আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, 'আমি একবার গঙুহ

গিয়ে ছিলাম। খানকায় একটি নতুন মৃৎপাত্র রাখা ছিল। আমি কূপ থেকে পানি উঠায়ে ওটায় নিয়ে যখন পান করলাম, তখন পানি তিক্ত মনে হলো। যোহরের নামাযের সময় যখন হুযুরের সাথে দেখা হলো তখন এ ঘটনাটা বর্ণনা করলাম। তিনি বল্‌লেন, তা কি করে হয়, কুপের পানিতো সুস্বাদু, তিক্ত নয়। আমি সেই নতুন মৃৎপাত্রটা পেশ করলাম, যার মধ্যে পানি ভর্তি ছিল। তিনি পানি মুখে নিয়ে দেখলেন ঠিকই তিক্ত। তিনি বল্‌লেন, ঠিক আছে, এটা রেখে দাও। একথা বলার পর যোহরের নামাযে নিয়োজিত হয়ে গেলেন। সালাম ফিরানোর পর হুযুর মুসাল্লীদেরকে বল্‌লেন, কলেমা তাইয়্যেবা যে যত বেশী পড়তে পারেন, পড়ুন এবং স্বয়ং হুযুরও পড়তে শুরু করলেন। কিছুক্ষণ পর হুযুর দুআর জন্য হাত উঠালেন এবং একান্ত কায়মনে দুআ করার পর হাত মুখে বুলায়ে নিলেন। এরপর মৃৎপাত্র উঠায়ে পানি পান করে দেখলো যে পাানি সুস্বাদু। ওসময় মসজিদে যতজন নামাযী ছিল, সবাই পান করে দেখলো যে পানিতে কোন রকম তিক্ততা নেই। হুযুর ফরমালেন, এ মৃৎপাত্রের মাটি সেই কবরের ছিল, যেটার উপর আযাব হচ্ছিল। খোদার শুকরিয়া। কলেমার বরকতে আযাব রহিত হয়ে গেল। (তযকিরাতুর রশীদ ২য় খন্ড ২১২ পৃঃ)

এ ঘটনাটি আলমে বরযখেব অদৃশ্য অবস্থাদি সম্পর্কিত। স্বীয় অদৃশ্য জ্ঞান সম্পর্কে আস্থাশীল করার জন্য কম বলা হয়নি। তিনি এতটুকু পর্যন্ত বলেছেন যে, সেই মৃৎপাত্রের মাটি ওই কবরের, যেই কবরে আযাব হচ্ছিল এবং সাথে সাথে এটাও জেনে নিয়েছিল যে এখন আযাব মওকুফ হয়ে গেছে। একেই বলে সার্বিক অদৃশ্য জ্ঞান। যে দিকেই দৃষ্টিপাত করা হয়েছে বাস্তবতার চেহারা অনায়াসে উন্মুক্ত হয়ে গেছে। নিজের অদৃশ্য জ্ঞানের এ অবস্থা তো বর্ণনা করা হয়। কিন্তু সায়্যিদুল আম্বিয়া (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর বেলায় এ গাঙুহী কি লিখেছেন, তা আপন চোখ দ্বারা দেখে পড়ুনঃ

"এ বিশ্বাস রাখা যে তাঁর (হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) অদৃশ্য জ্ঞান ছিল, সুস্পষ্ট শিরক। (ফতওয়ায়ে রশিদিয়া ২য় খন্ড ১৪১ পৃঃ)

(৫) আকীদায়ে তওহীদের বিপরীত এক দৃষ্টান্তমূলক ঘটনা

জলন্ধর জিলার অন্তর্গত কোন এক সরকারী স্কুলে মুন্‌শী রহমত আলী নামে এক ব্যক্তি চাকুরী করতেন। তাযকিরাতুর রশীদের লিখক ওনার সম্পর্কে লিখেছেন যে লোকটি প্রথমে চরম বেদাতী ছিলেন এবং হযরত পীরানে পীর আবদুল কাদের জিলানী (কুঃসিঃ) প্রতি সীমাহীন অনুরক্ত ছিলেন। হাফেজ মুহাম্মদ সালেহ নামক এক দেওবন্দী মওলভীর সুহবতে কিছুদিন থাকায় উপকৃত হওয়ার সুযোগ পেলেন। যার ফলে আকীদা ও চিন্তাধারায় অনেক পরিবর্তন সাধিত হলো। এর পরবর্তী ঘটনা লিখকের নিজের ভাষায় শুনুনঃ

হাফেজ মুহাম্মদ সালেহের সংশ্রবে থাকাকালীন প্রায় সময় উনি হযরত মাওলানা গাঙুহী(কুঃসিঃ) এর গুণকীর্তন ও জীবনবৃত্তান্ত শুনতেন। কিন্তু ওনার প্রতি কোন দুর্বলতা সৃষ্টি হয়নি এবং এ রকম ধারণা করে অটল রয়েছিলেন যে যতক্ষণ পর্যন্ত পীরানে পীর (রহমতুল্লাহে আলাইহে) স্বপ্নে তশরীফ এনে স্বয়ং বলবেন না যে অমুক ব্যক্তির মুরীদ হও, ততক্ষণ পর্যন্ত স্বেচ্ছায় কারো হাতে বায়াত করবো না। এ অবস্থায় একটি সময়কাল অতিবাহিত হয়ে গেল এবং উনি স্বীয় সিদ্ধান্তে অটল রইলেন।

পরিশেষে একরাত হযরত পীরানে পীর (কুঃসিঃ) এর সাক্ষাত লাভে ধন্য হলেন। হযরত শেখ এ রকম ইরশাদ করলেন যে এ যুগে মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙুহী সাহেবকে আল্লাহ তাআলা সেই জ্ঞান দান করেছেন যে যখন কোন আগত ব্যক্তি সালাম করে, তখন তিনি ওর উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত হয়ে যান এবং যে যিকির ও পেশা ওর উপযোগী হয়, সেটাই বলে দেন।" (তযকিরাতুর রশীদ ১ম খন্ড ৩১২ পৃঃ)

দেখলেন তো? একমাত্র আপন শেখের অদৃশ্য জ্ঞানের ডংকা বাজানোর জন্য হযরত সায়্যিদুল আওলিয়া সরকারে গাউছুল ওয়া (রাদি আল্লাহ তাআলা আনহু) এর জবান দিয়ে এমন আকীদা প্রচার করা হচ্ছে, যেটা দেওবন্দী মাযহাব মতে সম্পূর্ণরূপে শিরক, মজার ব্যাপার হলো বর্ণিত বিষয় এত সুস্পষ্ট, গা বাঁচানোর কোন উপায় নেই।

এক দিকে এ ঘটনার প্রতি দৃষ্টি রাখুন এবং অন্যদিকে তকবিয়াতুল ঈমানের এ অংশটুকু পড়ুন। তখন তওহীদবাদের সমস্ত রহস্য উদঘাটন হয়ে যাবেঃ

(যে কেউ কারো সম্পর্কে এ ধারণা করে যে) যে কথা আমার মুখ থেকে বের হয়, সে সব শুনে ফেলে এবং যে ধারণা ও কল্পনা আমার মনে আসে, সে সবকিছু সম্পর্কে অবহিত, তাহলে এসব বিশ্বাস দ্বারা মুশরিক হয়ে যায় এবং এ ধরণের সমস্ত বিশ্বাস শিরক।' তকবিয়াতুল ঈমান ৮ পৃঃ

বুকে হাত রেখে চিন্তা করুন, গাঙ্গুহী সাহেবের মধ্যে গায়বী উপলব্ধি ক্ষমতা প্রমাণ করার জন্য ওদেরকে শিরকের কত যে ধাপ অতিক্রম করতে হলো।

প্রথম শিরক হচ্ছে, হুযুর গাউছে পাক যদি অদৃশ্য জ্ঞানী না হতেন, তাহলে ওনার কিভাবে জানা হলো যে আমার অমুক ভক্ত মুরীদ হওয়ার ব্যাপারে আমার মতামতের অপেক্ষায় রয়েছে। দ্বিতীয় শিরক হচ্ছেঃ ওনার মধ্যে হস্তক্ষেপ করার এ ক্ষমতাটা স্বীকার করে নেয়া হলো যে ওফাতের পরও যাকে সাহায্য করতে চান, করতে পারেন। তৃতীয় শিরক হচ্ছে, সালামের পর যদি গাঙ্গুহী সাহেবের মনের অবস্থা ওনার চোখের সামনে না থাকতো, তাহলে ওনার কিভাবে জানা হলো যে মওলভী রশীদ আহমদ সাহেবকে আল্লাহ তাআলা এমন জ্ঞান দিয়েছেন যে তিনি সালামকারীদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত হয়ে যান। কিন্তু এ সমস্ত শিরক এ জন্য করে নিল যে আপন মাওলানার শান-মানের এ ঘটনাকে দলীল হিসেবে পেশ করাই উদ্দেশ্য ছিল। নচেৎ আকীদার ক্ষেত্রে এরা সরকারে গাউছে পাক (রাদি আল্লাহু তাআলা আনহু) এর বেলায় এ ধরণের গায়বী উপলব্ধি ক্ষমতার কক্ষণো বিশ্বাসী নয়, এবং তারা এ ধরণের প্রমাণাদিকে শিরক সাব্যস্ত করে। যেমন এ গাঙ্গুহী সাহেব "হে আবদুল কাদের জিলানী! আল্লাহর ওয়াস্তে কিছু দান করুন" বলে আহবান করা সম্পর্কে লিখেছেন:

"এ রকম বাক্য বলা কোন অবস্থায় জায়েয নেই। যদি শেখ (কুঃ সিঃ)কে অদৃশ্য জ্ঞানী মনে করে বলা হয়, তাহলে নিঃসন্দেহে শিরক এবং যদি এ রকম ধারণা করা না হয়, তাহলে নাজায়েয। কেননা, এ অবস্থায় যদিওবা এ আহবান শিরক হলো না কিন্তু শিরকের অনুরূপ।' (ফত্‌ওয়ায়ে রাশিদিয়া ১ম খন্ড ৫ পৃঃ)

দেখুন, এখানে সরকারে গাউছুল আযমের রূহানী হস্তক্ষেপ এবং গায়বী উপলব্ধি ক্ষমতার প্রশ্নে কতরকম সন্দেহের সৃষ্টি করে দিয়েছেন এবং কত রকম খুঁত বের করলেন। কিন্তু যখন নিজেদের মান সম্মানের কথা আসলো, তখন এ

সরকারে গাউছে পাকের জ্ঞান ও ক্ষমতা সম্পর্কে কোন রকম সন্দেহের সৃষ্টি হলো না।

(৬) গাঙ্গুহী সাহেবের মুরীদ কর্তৃক অদৃশ্য বিষয় সমূহ দর্শন

'তযকিরাতুর রশীদ' এর লিখক গাঙ্গুহী সাহেবের এক মুরীদের অবস্থা বর্ণনা পূর্বক লিখেনঃ

"এক ব্যক্তি চিঠি মারফত তাঁর থেকে বায়াত হন এবং লিখিত নির্দেশে যিকরে নিয়োজিত হন। কয়েক দিনের মধ্যে ওনার এমন অবস্থা হলো যে আওলিয়া কিরামের পবিত্র রূহসমূহের সাথে একটি যোগসূত্র সৃষ্টি হয়ে গেল। অতঃপর পর্যায়ক্রমে নবীগণের পবিত্র রূহসমূহের সাথে সাক্ষাৎ হলো। ক্রমান্নয়ে এ রকম মনে হতো যে আপাদমস্তক প্রতিটি রগ, প্রতিটি লোম পবিত্র রূহসমূহের সাথে সংযুক্ত। এ অবস্থায় এক প্রকার জ্ঞান শূন্যতা ও বিমোহিত ভাবের সৃষ্টি হতো। গোপন বিষয়সমূহের প্রকাশ লাভ এবং সরকারে আলম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর মজলিসের দারোয়ানের সম্মান লাভ করতেন।" (তযকিরাতুর রশীদ ২য় খন্ড ১২৩ পৃঃ)

এখন ওদের চিন্তাধারার এ বৈষম্যের অভিযোগ কার কাছে করবো যে দারোয়ানের এমন যোগ্যতা প্রকাশ করা হয়েছে যে অদৃশ্য জগতের কোন কিছু ওর দৃষ্টির অন্তরালে নয়। একেবারে পাশে পাশে অবস্থানকারী বন্ধুদের মত নবী ও ওলীগণের রূহসমূহের সাথে ওর একটি সম্পর্ক বিরাজমান। আলমে বরযখ ও অদৃশ্যের ভেদসমূহ ওর চোখের সামনে দৃশ্যমান, কিন্তু আকা (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) সম্পর্কে ওদের আকীদাটা কি, সেটাও একবার অবলোকন করুনঃ

'কোন নবী, ওলী বা ইমাম ও শহীদের বেলায় কক্ষণো এ বিশ্বাস রাখবেন না যে ওনারা অদৃশ্য বিষয় জানে এবং হযরত পয়গম্বরের বেলায় এ বিশ্বাস রাখবেন না এবং ওনার প্রশংসায় এ রকম কথা বলবেন না।" তকবিয়াতুল ঈমান-২৬ পৃঃ

(৭) আদীকার বিপরীত এক অদ্ভূত কাহিনী

হাজী দোস্ত মুহাম্মদ খান মওলভী রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী সাহেবের একজন একান্ত বিশ্বস্ত খাদেম ছিলেন। একবার ওনার স্ত্রীর শারীরিক অবস্থা খুবই খারাপ

হয়েছিল। অসুখের মারাত্মক পর্যায়ের অবস্থা বর্ণনা পূর্বক 'তযকিরাতুর রশীদ' এর গ্রন্থকার লিখেনঃ

"হাত-পা অবশ হয়ে গেছে, উর্ধশ্বাস এসে গেছে এবং সমস্ত শরীর ঠান্ডা হয়ে গেছে। স্ত্রীর প্রতি হাজী সাহেবের ভীষণ মহব্বত ছিল। অস্থির হয়ে কাছে এসে দেখলো যে অবস্থা খুবই খারাপ। কেবল বুকটা নড়াচড়া করছে মনে হচ্ছিল। হায়াতের আশা ছেড়ে দিয়ে কাঁদতে লাগলো এবং শিয়রে বসে ইয়াসীন সুরা পড়তে শুরু করলো। কয়েক মূহুর্ত অতিবাহিত হতে না হতে হঠাৎ রোগীনী চোখ খুল্‌লো এবং একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে পুনরায় চোখ বন্ধ করে ফেল্‌লো। সবাই মনে করলো শেষ সময় এসে গেছে। হাজী দোস্ত মুহাম্মদ খান এ করুন দৃশ্যের প্রতি তাকাতে পারলো না। অস্থির হয়ে ওখান থেকে উঠে গেল এবং মুরাকাবায় বসে হযরত ইমাম রব্বানী (গাঙুহী) এর প্রতি মনোনিবেশ করলো যে শেষ সময় এসে গেলে যেন শুভ সমাপ্তি হয় আর যদি হায়াত বাকী থাকে, তাহলে তিনদিন যাবত যে কষ্ট পাচ্ছে, তা যেন লাঘব হয়ে যায়। মুরাকাবা শেষ হবার আগেই রোগীনী চোখ খুললো, কথা বলা শুরু করলো, শিরা চালু হয়ে গেল এবং আরোগ্য হয়ে গেল। দু'তিন দিন পর শক্তিও এসে গেল এবং পরিপূর্ণভাবে সুস্থ হয়ে গেল। তযকিরাতুর রশীদ ২য় খন্ড ৩২১ পৃঃ

এ ঘটনার পর জীবনী রচয়িতার এ বর্ণনাটিও পড়ুন এবং গভীরভাবে চিন্তা করুন

"হাজী সাহেব মরহুম প্রায় সময় বল্‌তেন যে, যে সময় আমি মুরাকাবায় বসেছিলাম, হুযুরকে আমার সামনে দেখছি এবং এর পরে এমন অবস্থা হয়েছে, যে দিকে দৃষ্টি দিতাম, হযরত ইমাম রব্বানী (গাঙুহী)কে আসল আকৃতি সহকারে দেখতে পেতাম। অনবরতঃ তিন দিন এ অবস্থা ছিল। (তযকিরাতুর রশীদ ২য় খন্ড ২২১ পৃঃ)

চোখের পলক যদি ভারী হয়ে না আসে, তাহলে একই সাথে স্বয়ং গাঙুহী সাহেবের এ ফতওয়াটি পড়ে নিন।

"কোন একজন এ প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করলো যে মুরাকাবায় আওলিয়া কিরামের ধ্যান করা কেমন? এটাও জানতে ইচ্ছুক যে যখন আমরা ওনাদের

ধ্যান করি, তখন ওনারা আমাদের পাশে উপস্থিত হয়ে যায় এবং আমাদের জানা হয়ে যায়। এ রকম বিশ্বাস করা কেমন?

উত্তরঃ এ রকম ধ্যান ঠিক নয়, এতে শিরকের সম্ভাবনা রয়েছে। (ফত্‌ওয়াযে রশিদিয়া ১ম খন্ড ৮ পৃঃ)

এখানে আমার এর থেকে অধিক কিছু বলার প্রয়োজন নেই যে আল্লাহর ওলীগণের ব্যাপারে এটা হচ্ছে আকীদা আর আপন শেখের ব্যাপারে ওটা হচ্ছে ঘটনা।

একই বিষয় এক জায়গায় শিরক এবং অন্য জায়গায় প্রশংসনীয় ঘটনা। দৃষ্টিভঙ্গির এ পার্থক্যের যুক্তি সঙ্গত কারণ কি হতে পারে, তা আপনারাই বিবেচনা করে দেখুন।

আর দেওবন্দীদের মূল আকীদা মতে একই ব্যক্তিকে চারদিকে অবিকল আকৃতিতে দেখাটা কি করে সম্ভব? কিনতু তওহীদের সোল এজেন্টদেরকে ধন্যবাদ, এ অসম্ভবকে ওরা আপন মাওলানার জন্য শুধু সম্ভব বলেনি বরং বাস্তব ঘটনা হিসেবে উপস্থাপন করেছেন।

এ প্রসঙ্গে গাঙুহী সাহেবের আর একটি ঘটনা শুনুন। এ তযকিরাতুর রশীদ এর লিখক মওলভী আশেকে ইলাহী মিরটী নগীনা শহরের মওলভী মাহমুদুল হাসান নামক কোন ব্যক্তির উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেনঃ

"মওলভী মাহমুদ হাসান নগীনবী বলেন, আমার সেই ভাগ্যবতি আম্মাজান আমার আব্বাজানের সাথে বার বছর মক্কা শরীফে অবস্থান করেন। তিনি খুবই পূণ্যবতি ও ধর্মপরায়না ছিলেন এবং অগণিত হাদীছ তাঁর মুখস্থ ছিল। তিনি আমাকে বলেছেন, বৎস! হযরত গাঙুহীর অনেক শাগরিদ আছে কিন্তু কেউ হযরতকে চিনতে পারেনি। যে সময় আমি মক্কা শরীফে ছিলাম, প্রতিদিন হযরতকে হেরম শরীফে ফজরের নামায পড়তে দেখেছি এবং লোকদের থেকেও শুনেছি যে, ইনি হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙুহী, গাঙুহ থেকে তশরীফ নিয়ে আসতেন।" তযকিরাতুর রশীদ ২য় খন্ড ২১২ পৃঃ

উপরোক্ত ভাষ্যে 'প্রতিদিন' শব্দটা বলা হয়েছে। অর্থাৎ হেরম শরীফে ফজরের নামায পড়াটা ওনার কোন দিন বাদ পড়েনি। ভদ্র মহিলার অবস্থানকাল হিসেবে এ নিয়ম বার বছর পর্যন্ত বলবৎ ছিল।

৭৮

সূর্যোদয়ের তারতম্যের ভিত্তিতে ভারতবর্ষ ও মক্কা শরীফের সময়ের মধ্যে কয়েক ঘন্টার পার্থক্যটাও যদি মেনে নেয়া হয়, তবুও চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে কোন একটি নির্দিষ্ট সময়ে হেরম শরীফে পৌছার জন্য ওনার ঘর থেকে অদৃশ্য হওয়াটা একান্ত প্রয়োজন ছিল। কিন্তু সমস্যা হলো যে সেই মওলভী আশেকে ইলাহী তাঁর সেই কিতাবে (তযকিরাতুর রশীদ) ওনার দৈনন্দিন জীবনের কার্যাবলীর যে হিসেব পেশ করেছে, ওখানে ওনার চব্বিশ ঘন্টা গাঙুহে অবস্থান দেখায়েছেন।

অতএব অনররত বার বছর প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে ঘর থেকে অদৃশ্য হয়ে যাওয়া এবং পুনরায় ফিরে আসা এমন ব্যাপার নয় যে, যা লোকদের অগোচরেও প্রসিদ্ধ না হয়ে থাকতে পারে।

এ জন্য স্বীকার না করে উপায় নেই যে উনি একই সময় মক্কাতেও উপস্থিত থাক্‌তেন এবং গাঙুহেও হাজির থাকতেন। এখন দোস্ত মুহাম্মদ খানের সেই প্রত্যক্ষ দর্শন, যা একটু আগে উল্লেখিত হয়েছে এবং দেওবন্দের পূণ্যবতি মহিলার এ বর্ণনা উভয়টা দৃষ্টির সামনে রাখুন। তখন সুস্পষ্ট ভাবে প্রতিভাত হয় যে মওলভী রশিদ আহমদ একই সময়ে বিভিন্ন জায়গায় মওজুদ থাকতে পারে কিন্তু এটা শুনে আপনারা আশ্চর্য হয়ে যাবেন, যে অলৌকিক গুণকে দেওবন্দীরা নিজেদের আস্থাশীল পীরের জন্য বাস্তব ঘটনা বলে স্বীকার করেছেন, সেটা রসূলে আনোয়ার (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর জন্য সম্ভব বলেও স্বীকার করে না।

যেমন মীলাদ মাহফিল সমূহে হুযুর আনোয়ার (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর তশরীফ আনয়নের সম্ভাবনার উপর আলোচনা করতে গিয়ে দেওবন্দী জমাতের নেতা মওলভী আশরফ আলী থানবী লিখেনঃ

'যদি একই সময়ে কয়েক জায়গায় অনুষ্ঠিত হয়, তাহলে কি সব জায়গায় তশরীফ নিয়ে যাবেন, না কি কোন এক জায়গায়? যদি কোন জায়গায় তশরীফ নিয়ে যান এবং কোন জায়গায় তশরীফ না নেন, তাহলে সেটা বিনা কারণে অগ্রাধিকার বুঝায়। যদি সব জায়গায় তশরীফ নিয়ে যায় বলে মনে করা হয়, তাহলে তাঁর অস্থিত্ব যেহেতু এক, হাজার জায়গা কিভাবে যেতে পারে?" (ফতওয়ায়ে ইমদাদিয়া ২য় খন্ড ৫৮ পৃঃ)

নিজের বিবেক বুদ্ধিকে যদি অন্য কারো হাতে বন্ধক না রেখে থাকেন, তাহলে স্বীয় রসূল প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে ইনসাফ করুন এবং সেই আলোকে ওসমস্ত মতভেদ সমূহের রহস্যটাও জেনে নিন, যা আহলে সুন্নাত ও দেওবন্দীদের মধ্যে অর্ধ শতাব্দি ধরে চলে আসতেছে।

(৮) বিগত ঘটনাসমূহের জ্ঞান

মওলভী আশেকে ইলাহী মিরটী স্বীয় কিতাবে এমন অনেক ঘটনা উদ্ধৃত করেছেন, যেগুলো থেকে জানা যায় যে মওলভী রশীদ আহমদ গাঙুহীর কাছে কারো অবহিতকরণ ছাড়া অদৃশ্য ভাবে অনেক ঘটনার বিষয় জানা হয়ে যেত। নমুনা হিসেবে নিম্নের একটি ঘটনা দেখুন।

মুন্সী নেছার আলী ও গাউহার খান নামে দু'ব্যক্তি ইংরাজদের পদাতিক বাহিনীতে কর্মরত ছিলেন। ওনাদের সম্পর্কে এ ঘটনাটি বর্ণনা করেনঃ

> মুন্‌শী নেছার আলী ও গাওহার খান তাদের ৬৫নং পদাতিক বাহিনীর কর্মস্থল থেকে ছুটি নিয়ে বায়াত হবার উদ্দেশ্য লক্ষ্মৌ থেকে গাঙুহ যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন। বাহনও এসে দরজার সামনে হাজির। হঠাৎ কোন এক অধিনায়ক আগমনের টেলিগ্রাম আসলো এবং ঠিক যাত্রার মুহূর্তে ওদের অফিসারের নির্দেশে যাত্রা স্থগিত করতে হলো। দশদিন পর অবসর হয়ে যখন গাঙুহ পৌছলেন; তখন হুযুর (গাঙুহী) পরিস্কারভাবে ইরশাদ ফরমালেন 'তোমরা দুজনতো অমুক দিন আসতে চেয়েছিলে কিন্তু বাঁধা দেয়া হয়েছে।'
>
> এবং যখন খাবার দস্তর খানায় রাখা হলো, তখন বলতে লাগলেন তোমাদের সাথেতো দু'টি টাট্টু ঘোড়াও আছে, ওগুলোতো আমার মেহমান। প্রথমে গুলোকে ঘাস পানি দেয়া উচিত। অথচ উভয়ে টাট্টু ঘোড়ায় আরোহন করে আসার খবরটা তাঁকে কেউ অবহিত করেনি" (তযকিরাতুর রশীদ ২য় খন্ড ২৩৪ পৃঃ)

এ অংশটুকু "অথচ উভয়ে টাট্টু ঘোড়ায় আরোহন করে আসার খবরটা ওনাকে কেউ দেয়নি'' একমাত্র এ জন্যই বলা হয়েছে, যেন খুব ভালমতে প্রকাশ পায় যে এটা গায়বী খবর ছিল এবং কোন প্রকার যেন সন্দেহ করা না হয় যে কেউ তাকে হয়তো অবহিত করেছে।

(৯) ভবিষ্যৎ ঘটনাবলীর জ্ঞান

এবার ভবিষ্যৎ অর্থাৎ কাল বা এর পরের জ্ঞান সম্পর্কিত ঘটনাবলী অবলোকন করুন।

প্রথম ঘটনা

মওলভী সাদেকুল ইয়াকীন নামে কোন এক ব্যক্তি ছিল। ওনার বাপ সুন্নী ছিল। কিন্তু সে দেওবন্দী আলেমদের সংশ্রবে বদআকীদার অনুসারী হয়ে গিয়েছিল, যার কারণে ওর বাপ ওর প্রতি প্রায় সবসময় অসন্তুষ্ট থাক্‌তেন। যখন বাপবেটার মধ্যে মনোমালিন্য অধিক বেড়ে গেল, তখন মওলভী সাদেকুল ইয়াকীন গাঙুহে চলে গেল। এর পরের ঘটনা স্বয়ং মওলভী আশেকে ইলাহী মিরটীর মুখেই শুনুনঃ

"গাঙুহে তো এসে গেল কিন্তু বাপের অসন্তুষ্টির কথা প্রায় সময় মনে পড়তো। একদিন হুযুরের খেদমতে উপস্থিত ছিল। হঠাৎ হুযুর ওকে বল্‌লেন, আমি তোমার বাপের দিকে খেয়াল করেছিলাম। ওনার অন্তরে তোমার মহব্বত ঢেউ খেল্‌ছে এবং এ অসন্তোষ বাহ্যিক মাত্র। আশা করা যায় কাল–পরশুর মধ্যে তোমাকে যাবার জন্য ওনার চিঠিও আসতে পারে। ঠিকই পরদিন শাহ সাহেবের চিঠি আসলো।" (তযকিরাতুর রশীদ ২য় খন্ড ২২০ পৃঃ)

অদৃশ্য জ্ঞানের এ শান বাস্তবিকই প্রণিধানযোগ্য যে, আগামীকালের খবর ও দিয়ে দিল এবং হাজার হাজার মাইল দূর থেকে মনের লুকায়িত অবস্থানটাও জেনে নিল। এ দাবীর জন্য কুরআনের কোন আয়াত প্রতিরোধক হলো না এবং ওদের আকীদায়ে তওহীদের উপরও কোন আঘাত লাগলো না।

দ্বিতীয় ঘটনা

সূফী করম হুসাইন নামে কোন এক ব্যক্তি মওলভী রশীদ আহমদ গাঙুহীর খানকার সার্বক্ষণিক খাদেম ছিলেন। ওনার সম্পর্কে তযকিরাতুর রশীদের লিখক এ ঘটনাটি বলেছেনঃ

সূফী করম হুসাইন সাহেবের একবার অসুখ হয়েছিল এবং কয়েকদিন পর আরোগ্য লাভ করেন। ওনার বাড়ী থেকে বাড়ী যাবার জন্য চিঠি আসলে, উনি বাড়ী যাবার জন্য মনস্থ করলেন। হুযুরের কাছ থেকে যখন বিদায় নিতে গেলেন,

তখন তাঁর চিরাচরিত রীতির বিপরীত বললেন, কাল যেও না, তিনদিন পরে যেও। উদ্দেশ্যে বাঁধাপ্রাপ্ত হওয়ায় মনক্ষুন্ন হলো কিন্তু যাত্রা স্থগিত করলেন। পরের দিন হঠাৎ জ্বর আসলো এবং তাও এত অধিক ছিল যে, ইশার ওয়াক্ত পর্যন্ত উঠতেও পারেনি। ওসময় মনে পড়লো, আজকে যদি পথে হতাম, কী যে অবস্থা হতো। (তজকিরাতুর রশীদ ২য় খন্ড ২২৬ পৃঃ)

অর্থাৎ গাঙুহী সাহেবের জানা ছিল যে কাল জ্বর আস্‌বে।

তৃতীয় ঘটনা

মওলভী মুহাম্মদ ইয়াসীন নামে দেওবন্দ মাদ্রাসার এক শিক্ষক সম্পর্কে তযকিরাতুর রশীদে বর্ণিত আছে, উনি একবার গাঙুহে গিয়েছিলেন এবং ওনার দেওবন্দ ফিরে আসার প্রয়োজন ছিল। উনি বিদায় নেয়ার জন্য দ্বিপ্রহরের সময় মওলভী রশীদ আহমদ সাহেবের কাছে গেলেন এবং ওনার কাছ থেকে বিদায় চাইলেন। কিন্তু বারবার বলার পরও তিনি ওনাকে ফিরে যাবার অনুমতি দিলেন না। যখন কোন অজুহাত গ্রাহ্য হলো না, তখন তিনি শেষে বল্‌লেনঃ

কাল মাদ্রাসায় হাজির হওয়াটা আমার প্রয়োজন। হযরত (গাঙুহী) বললেন, মাদ্রাসার ক্ষতির কথা তো আমারও খুবই স্মরণ আছে। কিন্তু তোমার কষ্টের কারণে বলছি যে অনর্থক রাস্তায় অসুবিধায় পতিত হবে এবং ভীষণ কষ্ট পাবে। হুযুরের বার বার বলার পরও আমার মোটেই স্মরণ হলো না যে শেখ যা কিছু বলেন, দেখেই বলেন। আমি আমার কথাই বলে গেলাম। (তযকিরাতুর রশীদ ২য় খন্ড ১২২ পৃঃ)

এরপর উনি তার যাত্রার কথা, পথে অসুবিধা এবং সারারাত সীমাহীন কষ্টের কথা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেন।

এখানে অনুধাবনের বিষয় হচ্ছে "শেখ যা কিছু বলেন, দেখেই বলেন" এ আকীদাটা দেওবন্দী স্বীয় বুযুর্গদের জন্য সম্ভব মনে করে। অথচ সেটা সায়্যিদুল আম্বিয়া (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর বেলায় জঘন্য শিরক মনে করে।

চতুর্থ ঘটনা

'আরওয়াহে ছালাছা' কিতাবে বর্ণিত ঘটনাবলীর অন্যতম বর্ণনাকারী জনাব আমীর শাহ্ খান গাঙুহী সাহেবের হজ্বের সফরের কথা উল্লেখপূর্বক লিখেনঃ

ওনাদের জাহাজ যখন জিদ্দায় পৌছলো, তখন ওখানকার কর্মকর্তাগণ ওনাদেরকে নামার অনুমতি দিলেন না এবং পৃথক রাখার জন্য ওনাদেরকে কামরান ফিরে যাবার নির্দেশ দিলেন। এর পরের ঘটনা ওনার মুখেই শুনুনঃ

> কিছুক্ষণ পর একজন এরাবিয়ান আসলো এবং বল্‌লো যে এখানকার বন্দরের কর্মকর্তা ঘুষখোর। সে কিছু নেয়ার জন্য এ সব তালবাহানা করতেছে। তোমরা তাড়াতাড়ি কিছু টাকা তোল, আমি ওনাকে দিয়ে রাজি করাবো।
>
> যখন এ খবর মাওলানার (গাঙুহী) কানে পৌছলো, তখন তিনি বল্‌লেন এ ব্যক্তি ডাহা মিথ্যুক। কেউ ওকে কিছু দিওনা। আমাদেরকে কামরান ফিরে যেতে হবে না। আমরা এখানেই নামবো। ঠিকই কথামত পরদিন নির্দেশ দেয়া হলো যে হাজীগণ নেমে যাবে। (আরওয়াহে ছালাছা ২৮৬ পৃঃ)

আপনারা কয়েক পৃষ্ঠাব্যাপী গাঙুহী সাহেবের মুখে আগামীকালের ভবিষ্যদ্বাণী সমূহ পড়লেন। তাঁর এ অদৃশ্য বিষয়ের খবর সম্পর্কে আজ পর্যন্ত ওদের কেউ এ বলে আপত্তি করে নি যে খোদা ভিন্ন অন্য কারো বেলায় এ ধরণের বিশ্বাস কুরআনের বিপরীত। কিন্তু কীযে জঘন্য হীনমন্যতা যে আগামী কালের এ জ্ঞান ও খবরের প্রশ্নটা যখন মাহবুবে কিবরিয়া (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর বেলায় উত্থাপিত হয়, তখন প্রত্যেক দেওবন্দী আলেমের মুখে কুরআনের এ আয়াতটি শুনা যায়ঃ وَمَا تَدْرِىْ نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا

(কোন প্রাণী জানে না যে, কাল কি করবে)

মওলভী রশীদ আহমদ গাঙুহী সাহেবের আজগবী ঘটনাবলী ও অবস্থাদি সম্বলিত এ কিতাবের দ্বিতীয় অধ্যায় এখানে শেষ হলো, এ কিতাবের প্রথম পর্বে যে দৃশ্য আপনারা দেখেছেন, এটা হচ্ছে ওটার বিপরীত দ্বিতীয় দৃশ্যের দ্বিতীয় অধ্যায়। একটু সময় করে উভয় দৃশ্যটা তুলনা করে দেখুন এবং ন্যায় ও নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করুন যে, প্রথম দৃশ্যে যেসব আকীদা ও বিষয়কে ওরা শিরক সাব্যস্ত করে ছিল, দ্বিতীয় দৃশ্যে ও সমস্ত আকীদা ও বিষয় সমূহকে নিজেদের বেলায় গ্রহণ করে নিয়েছে। তাই কোন্ মুখে ওরা নিজেদেরকে তাওহীদবাদী এবং অন্যদেরকে মুশরিক বলে থাকে?

তৃতীয় অধ্যায়

দেওবন্দী জামাতের ধর্মীয় নেতা মওলভী আশরাফ আলী থানবী প্রসঙ্গেঃ

এ অধ্যায়ে জনাব মওলভী আশরাফ আলী থানবী সাহেব সম্পর্কে দেওবন্দী কিতাবাদি থেকে এমন ঘটনাবলী ও কাহিনীসমূহ উপস্থাপন করা হয়েছে, যেগুলো আকীদায়ে তাওহীদের সাথে সংঘাতময়, নিজেদের মাযহাবের বিপরীত এবং ওদের মুখে বলা শিরককে নিজেদের বেলায় ইসলাম ও ঈমান সম্মত করার প্রয়াসের অগণিত উদাহরণ প্রতিটি পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে। কৌতূহলী দৃষ্টিতে পড়ে দেখুন এবং বিবেকের রায় শুনার জন্য কানকে খাড়া রাখুন।

ঘটনা প্রবাহ

(১) থানবী সাহেবের বেলায় গায়ব জানার সুস্পষ্ট দাবী

থানবী সাহেবের বিশিষ্ট খলিফা মওলভী আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী স্বীয় কিতাব 'হাকীমুল উম্মতে' ওনার একটি মজলিসের বর্ণনা দিতে গিয়ে তাঁর যে মনোভাব প্রকাশ করেছেন, সেটা দেওবন্দী মাযহাবের প্রতি ভাল ধারণা পোষণকারীদেরকে হতভম্ব করার জন্য যথেষ্ট। তিনি লিখেনঃ

> অনেক বুযুর্গদের অবস্থাসমূহ তিনি (থানবী) স্বীয় মুখে এমন ভাবে বর্ণনা করেন যেন একের কথা বলে অপরকে শিক্ষা দেয়ার মত আমাদের জযবা ও মনের ধারণাসমূহ ব্যক্ত করা হতো। মন বলে যে, দেখুন এটা মনের কথা জানা নয় কি? আমাদের সমস্ত গোপন বিষয় ওনার কাছে প্রকাশ পায়। ওনার থেকে বড় কাশফ কারামতের অধিকারী আর কে হবে? (কয়েক লাইন পর) যা হোক ও সময় গভীর প্রভাবমূলক সেই অদৃশ্য জ্ঞান এবং কাশফ প্রকাশ পাচ্ছিল। মজলিস স্থগিত হয়ে গেল। (হাকীমুল উম্মত ২৪ পৃঃ)

শেষের এ বাক্যটা পুনরায় পড়ুন। এখানে বিষয়টা একেবারে পরিষ্কার হয়ে গেছে। রূপক ও ইঙ্গিতবহ শব্দ প্রয়োগ না করে একেবারে সুস্পষ্টভাবে থানবী সাহেবের বেলায় 'অদৃশ্য জ্ঞান' এর শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। অথচ এটা সেই শব্দ, যেটা নিয়ে পঞ্চাশ বছর যাবত এরা সংগ্রাম করে আসতেছে যে রসূলে

আকরম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর বেলায় এ শব্দের প্রয়োগ সম্পূর্ণরূপে কুফর ও শিরক। যেমন দেওবন্দী জমাতের নির্ভরযোগ্য ইমাম মওলভী আবদুশ শুকুর কাকুরবী সাহেব স্বীয় কিতাবে লিপিবদ্ধ করেনঃ

> আমরা এটা বলি না যে হুযুর (দঃ) গায়ব জান্‌তেন বা অদৃশ্য জ্ঞানী ছিলেন বরং এটা বলি যে, হুযুরকে গায়বী বিষয়সমূহের ব্যাপারে অবহিত করা হয়েছে। হানাফী মাযহাবের ফকীহগণ কুফরীর প্রয়োগ সেই গায়ব জানার উপর করেন, অবহিত হওয়ার উপর নয়। ফতেহ হক্কানী–২৫ পৃঃ

দেখলেন্ তো? ওদের মতে হানাফী মাযহাবের ফকীহগণ যেই গায়ব জানার উপর কুফর শব্দ প্রয়োগ করেন, সেই স্বীকৃত কুফর থানবী সাহেবের বেলায় কত যে আনন্দে গ্রহণ করে নেয়া হয়েছে। থানবী সাহেবের গায়ব জানার প্রশ্নে ইসলামের কোন দেয়াল ধ্বসে পড়লো না এবং কুরআনের সাথেও কোন প্রকারের দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হলো না।

এবার এটা থেকে বুঝে নিন যে ওদের কিতাবসমূহে কুফর শিরক নিয়ে শত শত পৃষ্ঠাব্যাপী যে আলোচনা হয়েছে, এর পিছনে আসল উদ্দেশ্য কি? তাদের তাওহীদবাদের জযবা যদি আন্তরিকতার উপর নির্ভরশীল হতো, তাহলে কুফর ও শিরকের প্রশ্নে আপন–পরের এ ভেদাভেদ কক্ষণো মেনে নিত না।

(২) একই সময় থানবী সাহেবের কয়েক জায়গায় অবস্থানের এক আশ্চর্যকর ঘটনা

খাজা আজীযুল হাসান সাহেব 'আশরাফুস সওয়ানেহে' নামে তিন খন্ডে থানবী সাহেবের জীবনী লিখেন, যেটা খানকায়ে ইমদাদিয়া থানাবোন, জিলা মুজাফ্‌ফর নগর থেকে প্রকাশ করা হয়েছে। তিনি তাঁর কিতাবে থানবী সাহেবের এ আশ্চর্যকর ঘটনাটি উদ্ধৃত করেনঃ

> অনেক দিন হলো, এক ব্যক্তি আমাকে এ খানকায় তাঁর ঘটনাটি এ ভাবে বর্ণনা শুরু করেন, হুযুরকে তো এখানে বসা দেখা যাচ্ছে কিন্তু কি জানি, এখন তিনি কোথায় আছেন। কেননা আমি একবার নিজেই হুযুরকে থানাবুনে থাকা সত্ত্বেও আলীগড়ে দেখেছি। তখন সেখানে একটি মেলা হচ্ছিল এবং মেলায় মারাত্মক আগুন লেগেছিল। আমিও সেই মেলায় দোকান নিয়ে গিয়েছিলাম। যেদিন আগুন লাগছিল সেদিন আসরের সময় থেকে আমার মনে

অস্বাভাবিকভাবে একটি ভয় হচ্ছিল, যার কারণে বেচাকেনার মোক্ষম সময়ে আমি দোকানের সমস্ত মালপত্র আগে ভাগে কুড়ায়ে বাক্সের মধ্যে রাখতে শুরু করলাম। যখন মগ্‌রিবের পর অগ্নিকান্ডের শোরগোল উঠলো, তখন আমি ভীষণ বিচলিত হয়ে পড়লাম, হে আল্লাহ! কি ভাবে দোকানের বাইরে নিয়ে যাই, কারণ আমি একাকী আর বাক্সগুলোও ভারী।

সে সময় হঠাৎ আমি দেখি, হুযুর (থানবী) আমার সামনে হাজির এবং বাক্সগুলোর এক একটির কাছে গিয়ে বললেন, তাড়াতাড়ি উঠাও। সেমতে একদিকে তিনি ধরলেন, অন্যদিকে আমি ধরলাম। এভাবে অল্পক্ষণের মধ্যে সমস্ত বাক্স বের করে ফেলা হলো। সেই অগ্নিকান্ডে অন্যান্য দোকানদারদের অনেক ক্ষতি হয়েছে। কিন্তু খোদার রহমতে আমার সমস্ত মালপত্র রক্ষা ফেল।

এ ঘটনা শুনে অধম (অর্থাৎ গ্রন্থকার) ওকে জিজ্ঞাসা করলাম-আপনি কি হুযুরকে জিজ্ঞাসা করেন নি যে আপনি এখানে কিভাবে? এতে তিনি বল্‌লেন, জী না, ওসময় আমার জিজ্ঞাসা করার হুঁশ ছিল না। আমিতো নিজের চিন্তায় ব্যস্ত ছিলাম। (আশরাফুস সাওয়ানেহ ২য় খন্ড ৭১ পৃঃ)

বিস্ময় ও আশ্চর্য না হয়ে থাকলে, এ কাহিনীটা আর একবার পড়ে নিন। এক ব্যক্তির কয়েক জায়গায় মওজুদ থাকার উল্লেখ এখানে সুস্পষ্টভাবে করা হযেছে। কোথাও দ্বৈত অর্থবোধক ও রূপক অর্থের কোন অবকাশ নেই। এখানে আমার ইচ্ছে হচ্ছে যে মীলাদ মাহফিল সমূহে হুযুর আনোয়ার (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর তশরীফ আনয়নের সম্ভাবনা সম্পর্কে থানবী সাহেবের সেই প্রশ্নটা পুনরায় উল্লেখ করিঃ

"যদি একই সময় কয়েক জায়গায় মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়, তাহলে কি সব জায়গায় তশরীফ নিয়ে যাবেন, না কি নির্দিষ্ট কোন জায়গায়? যদি কোন জায়গায় যান এবং কোন জায়গায় না যান, তাহলে এটা বিনা কারণে অগ্রাধিকার দেয়া বুঝাবে আর যদি সব জায়গায় যান, তাহলে তাঁর অস্থিত্ব যেহেতু এক, হাজার জায়গায় কিভাবে যেতে পারেন?" (ফত্‌ওয়ায়ে ইমদাদিয়া ৪র্থ খন্ড ৫৮ পৃঃ)

কিভাবে যেতে পারেন? এখন এ প্রশ্নের জবাব দেয়ার আর প্রয়োজন নেই। আর আমরা এ বিষয়ের দাবীদারও নই যে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) প্রত্যক মাহফিলে তশরীফ নিয়ে যান। তবে থানবী সাহেবের এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে যে কোন ব্যক্তির মাথায় নিম্নের প্রশ্নগুলো না এসে পারে না।

প্রথম প্রশ্নঃ দেওবন্দীদের কাছে শুদ্ধ অশুদ্ধ যাচাই পদ্ধতি পৃথক পৃথক কেন? কোন বিষয় অশুদ্ধ হলে সব ক্ষেত্রে অশুদ্ধ হওয়া চায় এবং শুদ্ধ হলে, অন্যদের বেলায়ও কেন শুদ্ধ হিসেবে গ্রহণ করা হয় না? এ রকম কেন করা হয় যে একই বিষয় রসুলে কাওনাইন (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর বেলায় কুফর, শিরক এবং অসম্ভব। কিন্তু আপন বুযুর্গদের বেলায় ইসলাম, ঈমান ও বাস্তব ঘটনা।

দ্বিতীয় প্রশ্নঃ থানাবুনে অবস্থান করে আলীগড়ে সংঘটিতব্য দুর্ঘটনা সম্পর্কে আগেভাগে জেনে নেওয়াটা গায়বী উপলব্ধির সেই ক্ষমতা নয় কি, যেটা পয়গম্বরে আযম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর বেলায় দেওবন্দীগণ অনবরত অস্বীকার করে আসছে এবং সেই অস্বীকারের ভিত্তিতে ওরা নিজেদের জমাতকে একত্ববাদের জমাত বলে থাকে।

তৃতীয় প্রশ্নঃ চোখের পলকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় গিয়ে কোন বিপদগ্রস্থকে সাহায্য করা দেওবন্দী মাযহাব মতে এটা খোদায়ী ক্ষমতার আওতাভুক্ত বিষয় নয়কি?

যে ক্ষমতা, হস্তক্ষেপ, জ্ঞান ও কাশফকে ওরা সায়্যিদুল আম্বীয়া (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বেলায় কঠোরভাবে অস্বীকার করে, আশ্চর্যের বিষয়! সেগুলো নিজেদের বেলায় প্রমাণ করতে গিয়ে ওদের কাছে আকীদায়ে তাওহীদের বিপরীতে কোন কিছু মোটেই দৃষ্টিগোচর হলো না। এ প্রশ্নগুলোর উত্তরের জন্য আপনাদের বিবেকের কাছে ন্যায় বিচার কামনা করবো।

(৩) আর একটি দৃষ্টান্তমূলক কাহিনী

একত্ববাদের অহংকারে সরল প্রাণ মুসলমানদেরকে বিনাদ্বিধায় মুশ্‌রিক বেদাতী ও কবরপুজারী বলে আখ্যায়িতকারীদের আর একটি দৃষ্টান্তমূলক কাহিনী শুনুন।

মওলভী আশরাফ আলী থানবীর সেই জীবনী রচয়িতা আশরাফুস সওয়ানেহ গ্রন্থে থানবী সাহেবের প্রপিতামহ মুহাম্মদ ফরিদ সাহেবের ওফাতের কথা আলোচনাপূর্বক লিখেনঃ

"কোন বরযাত্রীদের সাথে যাচ্ছিলেন, ডাকাতদল এসে আক্রমণ করলো। ওনার কাছে তীর ধনুক ছিল। তিনি সাহস করে ডাকাতদের প্রতি তীর নিক্ষেপ করতে শুরু করলেন। কিন্তু ডাকাতেরা সংখ্যাধিক্য আর এ দিকে নিরস্ত্র হওয়ায় তিনি সেই মুকাবিলায় শাহদাত বরণ করেন।" আশরাফুস সওয়ানেহ ১ম খন্ড ১২ পৃঃ

এর পরের ঘটনাটি বিস্ময় সহকারে পড়ার মত। তিনি লিখেছেনঃ

"শাহাদতের পর এক বিস্ময়কর ঘটনা ঘটলো। রাত্রে নিজের ঘরে জীবিত ব্যক্তির মত তশরীফ আন্‌লেন এবং স্ত্রীর হাতে মিষ্টি দিলেন এবং বললেন, যদি তুমি কারো কাছে প্রকাশ না কর, তাহলে আমি এভাবে প্রতিদিন আসবো। কিন্তু তাঁর স্ত্রী এটা ভয় করলো যে পরিবারের লোকেরা যখন ছেলেমেয়েদের হাতে মিষ্টি দেখবে, তখন আল্লাহ জানে কি সন্দেহ করে। এ জন্য প্রকাশ করে দিল। এরপর আর তশরীফ আনেন নি। এ ঘটনাটি তাদের বংশের মধ্যে প্রসিদ্ধ আছে।" (আশরাফুস সওয়ানেহ ১ম খন্ড ১২ পৃঃ)

আল্লাহু আকবর! আমরা যদি নবীগণ, নিকটতর শহীদগণ এবং কামেল ওলীগণের কেবল রূহসমূহের বেলায় এ আকীদা পোষণ করি যে সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাআলা ওনাদেরকে আলমে বরযখে (কবরের মধ্যে) জীবিতদের মত হায়াত ও হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতা দান করেন, তাহলে বেদাত, শিরক, কবরপূজা ও মুর্খতার অপবাদে আমাদেরকে কোনঠাসা করে ফেলে এবং ফতওয়া বিভাগ থেকে বৃষ্টির মত ফত্‌ওয়া বর্ষিত হতে থাকে।

কিন্তু থানবী সাহেবের নিহত প্রপিতামহ সম্পর্কিত এ ঘটনাবলী প্রকাশিত হওয়ায় যে তিনি জীবিতদের মত ঘরে ফিরে আসা, সামনাসামনি কথা বলা, মিষ্টি প্রদান করা এবং সেভাবে প্রতিদিন শর্তসাপেক্ষ আগমনের ওয়াদা করা এবং শর্ত ভঙ্গ করায় আসা বন্ধ করে দেয়া ইত্যাদি বিষয়ে কেউ প্রতিবাদ মুখর হয়নি, কেউ ওগুলোকে শিরক সাব্যস্ত করেনি। কেউ এটা জিজ্ঞাসা করেননি যে ওনার কবরে মিষ্টির দোকান কে খুলেছিল এবং কুরআন হাদীছে এ ধরণের

ক্ষমতাবলীর দলীল কোথায় আছে? অধিকন্তু ওনার কাছে এ খবর কিভাবে পৌছলো যে তাঁর স্ত্রী ওনার আগমনের গোপন কথা ফাঁস করে দিল এবং উনি আসা বন্ধ করে দিলেন।

আছে কোন সততা ও ন্যায় বিচারের সমর্থক? যিনি দেওবন্দী আলেমদের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করবেন, যে আকীদা রসূল নবী গাউছ কুতুবের বেলায় শিরক, সেই আকীদা থানবী সাহেবের প্রপিতামহের বেলায় কিভাবে ঈমান ও ইসলাম হয়ে গেল? চোখে ধূলা দিয়ে আর কতদিন একত্ববাদের ধোঁকা দিবে?

ঈমান বিধ্বংসী আরও একটি ঘটনা শুনুন। এর বর্ণনাকারী হচ্ছেন স্বয়ং মওলভী আশরাফ আলী থানবী। তিনি বলেনঃ

মাওলানা ইসমাঈল দেহলভীর কাফেলায় বেদার বখত নামে এক ব্যক্তি শহীদ হয়েছিলেন। এ মুজাহিদ দেওবন্দের অধিবাসী ছিলেন। যথা সময়ে ওনার শাহাদতের খবর পৌছে ছিল। ওনার পিতা হাশমত আলী খান দেওবন্দের স্বীয় ঘরে একরাতে যথাসময়ে যখন তাহাজ্জুদ নামায পড়ার জন্য উঠলেন, তখন ঘরের বাইরে ঘোড়ার পায়ের আওয়াজ শুনলেন। তিনি ঘরের দরজা খুলে তার ছেলে বেদার বখতকে দেখে ভীষণ আশ্চর্য হয়ে গেলেন। কারণ এতো বালাকোটে শহীদ হয়েছিল। এখানে কিভাবে আসলো?

বেদার বখত বল্লেন, তাড়াতাড়ি কার্পেট ইত্যাদি বিছায়ে দিন, হযরত মাওলানা ইসমাঈল সাহেব ও সাইয়েদ (আহমদ) সাহেব এখানে তশরীফ আনতেছেন। হাশমত আলী খান তাড়াতাড়ি একটি বড় মাদুর বিছায়ে দিলেন। একটু পরে সাইয়্যেদ সাহেব ও মাওলানা শহীদ এবং আরও কয়েকজন সঙ্গী-সাথী সহ এসে গেলেন। হাশমত আলী খান সাহেব পিতৃস্নেহের কারণে জিজ্ঞাসা করলেন,

বাবা! তোমার কোথায় তলোয়ার লেগেছিল? বেদার বখত মাথা থেকে পট্টি খুললেন এবং নিজের অর্ধেক চেহারা স্বীয় হাতদ্বয় দ্বারা ধরে বাপকে দেখালেন যে এখানেই তলোয়ার লেগেছিল। হাশমত আলী খান বল্লেন, বেটা, এ পট্টি তাড়াতাড়ি পুনরায় বেঁধে ফেল। এদৃশ্য আমার সহ্য হচ্ছে না। কিছুক্ষণ পর এরা সবাই ফিরে চলে গেলেন।

সকালে হাশমত আলী খানের সন্দেহ হলো যে এটা কি কোন স্বপ্ন ছিল কিন্তু মাদুরকে ভাল করে দেখলেন যে ওখানে রক্তের ফোটা বিদ্যমান ছিল। এটা সেই ফোঁটা, যেটা বেদার বখতের কপাল থেকে পড়তে পিতা দেখেছিলেন। এ ফোঁটাসমূহ দেখে হাশমত আলী খান বুঝতে পারলেন যে এটা জাগ্রতাবস্থারই ঘটনা, স্বপ্নের নয়। শেষে কয়েকজন বর্ণনাকারীদের নাম উল্লেখ পূর্বক বলেন যে, এ ঘটনার আরও অনেক নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী রয়েছে।

মলফুজাত মাওলানা আশরফ আলী থানবী (পাকিস্তানী ছাপা) ৪০৯ পৃঃ

এ বিস্ময়কর ঘটনা পর্যালোচনা করার আগে এটা বলে ফেলাটা আমার নৈতিক দায়িত্ব মনে করি যে দেওবন্দের এ শহীদে আযম, যিনি স্বীয় কিরামতিতে অন্যান্য সমস্ত শহীদগণকে তার পিছনে ফেলে দিয়েছেন, তিনি কোন্ ধরণের যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন? সেটাকি কোন ধর্মযুদ্ধ ছিল? নাকি স্বাধীনতার যুদ্ধ ছিল? সত্যের সামনে মিথ্যা পরাভূত। এ বিতর্কের ফয়সালাও দেওবন্দীদের নেতা জনাব মওলভী হুসাইন আহমদ সাহেব দিয়েছেন। তিনি তাঁর আত্ম রচিত জীবনী গ্রন্থের দ্বিতীয় খন্ডে লিপিবদ্ধ করেনঃ

সায়্যিদ সাহেবের আসল উদ্দেশ্য ছিল হিন্দুস্থান থেকে ইংরেজ রাজত্বের অবসান, যেটার জন্য হিন্দু মুসলমান উভয়ই নাখোশ ছিল। এ কারণে তিনি তাঁর সাথে যোগদান করার জন্য হিন্দুদেরকেও আহবান জানান এবং তিনি ওদেরকে সুস্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন যে তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে দেশ থেকে ভিন দেশী লোকদের রাজত্বের পতন ঘটানো। এরপর রাজত্ব কার হবে সে ব্যাপারে তাঁর কোন মাথাব্যথা নেই। যারা রাজত্ব করার উপযুক্ত হবে, হিন্দু হোক বা মুসলমান বা উভয়, তারাই রাজত্ব করবে। (নক্‌শে হায়াত ২য় খন্ড ১৩ পৃঃ)

আপনারাই ইনসাফ করে বলুন, উপরোক্ত বক্তব্যের আলোকে সাইয়েদ সাহেবের সেই বাহিনী সম্পর্কে এটা ছাড়া কি বলা যেতে পারে যে সেটা ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর একটি অংশ ছিল, যারা হিন্দুস্থানে ধর্মনিরপেক্ষ রাজত্ব কায়েম করার জন্য তৎপর ছিল।

শহীদগণের জিন্দেগী এবং ওনাদের রূহানী ক্ষমতা সম্পর্কিত কুরআন শরীফে অনেক আয়াত রয়েছে। কিন্তু এ সমস্ত ফযীলত ওই সমস্ত মুজাহিদদের বেলায় প্রযোজ্য, যারা আল্লাহর জমীনে আল্লাহর দীন এবং ইসলামী হুকুমত

কায়েম করার জন্য নিজেদের রক্ত দিয়েছেন। ধর্মনিরপেক্ষ রাজত্ব এবং 'মিলেমিশে সরকার' গঠন করার জন্য যে বাহিনী তৈরী করা হয়, সেটাকে ইসলামী বাহিনী বলা যেতে পারে না এবং সেই বাহিনীর নিহত কোন সৈন্যকে শহীদ সাব্যস্ত করাও যায় না।

কিন্তু ব্যক্তি পূজার এ অবিচারটা দেখুন, এ কাহিনীতে স্বাধীনতা যুদ্ধের এক নিহত ব্যক্তিকে বদর ও উহুদ যুদ্ধের শহীদগণ থেকেও উচ্চস্থান দেয়া হয়েছে। কেননা ইসলামের সমস্ত শহীদগণের উপর ওনাদের উচ্চ মর্যাদা অর্জিত হওয়া সত্বেও ওনাদের সম্পর্কে এমন কোন রেওয়ায়েত পাওয়া যায় না যে ওনারা কাটা মাথা নিয়ে জীবিতদের মত নিজেদের ঘরে এসেছেন এবং ঘরের অধিবাসীদের সাথে যথারীতি কথা বলেছেন।

দেওবন্দীদের উর্বর মস্তিষ্কের এ বিষয়টাও দেখার মত যে ক্ষমতা ও ইখতিয়ারের যে বিষয়টি ওরা নিজেদের একজন রাজনৈতিক হত্যাকান্ডে নিহত ব্যক্তির জন্য বিনাবাক্যে স্বীকার করেছে, সেটা যদি আমরা হুনাইন ও কারবালায় শহীদগণের বেলায় স্বীকার করি, তাহলে আমাদেরকে মুশরিক বলা হয়। কিন্তু ওদের আকীদায়ে তাওহীদের সোল এজেন্সীর কোন তারতম্য হয় না।

আত্ম গৌরবের এক লজ্জাস্কর কাহিনী

এবার আর একটি মনমুগ্ধকর কাহিনী শুনুন। সেই 'আশরাফুস সওয়ানেহ'' এর লিখক থানবী সাহেব সম্পর্কে লিখেনঃ

> হুযুর তাঁর এক মহিলা মুরীদের কথা প্রায় সময় বল্‌তেন যে, সে সকরাতের অবস্থায় আমার নাম উচ্চারণ করে বল্‌লো তিনি উষ্টী নিয়ে এসেছেন এবং বলছেন 'ওটার উপর বসে যাত্রা কর।' এরপর ওর ইন্তেকাল হয়ে গেল। (আশরাফুস সওয়ানেহ ৩য় খন্ড ৮৬ পৃঃ)

নিজের অদৃশ্য জ্ঞান ও হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতার এ নিরব প্রচারটা একটু অবলোকন করুন। অন্য কেউ নয়, নিজেই নিজের সম্পর্কে বলছেন। অপরিচিত কেউ শুনলে হয়তো এ ঘটনার সত্যতার ব্যাপারে সন্দেহ করতে পারতো। কিন্তু মুরীদ ও অনুরক্তগণ কোন্ মানসিকতার হয়ে থাকে, তা বলার প্রয়োজন রাখে না। পীর সাহেব অস্বীকার করলেও সেটাকে ভদ্রতা মনে করে।

থানবী সাহেব এ ঘটনাটিকে প্রকাশ করে স্বীয় ভক্ত অনুরক্তদের মধ্যে এ ধারণাটা দিতে চেয়েছেন যে তাঁর কাছে স্বীয় মুরীদিনীর মৃত্যুর সময় জানা হয়ে গিয়েছিল। তাই ওকে বহন করার জন্য উটের সওয়ারী নিয়ে ওর কাছে পৌছে গেলেন।

এ ঘটনা থেকে তাঁর অদৃশ্য জ্ঞান সম্পর্কে যেমন জানা যায়, তেমন তাঁর হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতার কথাও প্রকাশ পায় যে নিজের অস্থিত্বকে বিভিন্ন জায়গায় পৌছিয়ে দেয়াটা অন্য কারো জন্য অসম্ভব হলেও তাঁর জন্য বাস্তব ব্যাপার।

আরও একটি সূক্ষ্ম বিষয়ঃ উপরোক্ত ঘটনা বর্ণনার মাধ্যমে গ্রন্থ রচয়িতা তাঁর এ অভিমতটা ব্যক্ত করেছেন যে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে থানবী সাহেব স্বীয় মুরীদ ও ভক্তদের রক্ষাকারী ও মুক্তিদাতা ছিলেন।

এ অভিমতটা প্রমাণ করার জন্য লেখক বিভিন্ন ঘটনা উদ্ধৃত করেছেন। নমুনা হিসেবে কয়েকটি উদ্ধৃত ঘটনা নিম্নে প্রদত্ত হলোঃ

"হযরতের (থানবী) অনুসারীদের শুভ সমাপ্তির অনেক ঘটনা বর্ণিত আছে, যেগুলোর দ্বারা তার সিলসিলা মকবুল ও কল্যাণকর বলে প্রমাণিত হয়। যেমন হযরত (থানবী) প্রায় সময় বল্‌তেন, হযরত হাজী সাহেবের (থানবী সাহেবের পীর) সিলসিলার এ বরকত যে, যে প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে হযরত থেকে বায়াত হয়, খোদার ফজলে ওর সমাপ্তি খুবই ভাল হয়ে থাকে। এমনকি ভক্তদের অনেকে মুরীদ হওয়ার পর দুনিয়াদারী নিয়েও ব্যস্ত থাকতো। কিন্ত ওনাদের সমাপ্তিও খোদার ফজলে আওলিয়া কিরামের মত হয়েছে। (আশরাফুস সওয়ানেহ ২য় খন্ড ৮২ পৃঃ)

এখানে লক্ষ্য করার বিষয় হলো আওলিয়া কিরামের মত ইন্তেকালের জন্য ইবাদত, তক্‌ওয়া, নেক আমলের মোটেই প্রয়োজন নেই। থানবী সাহেবের হাতে কেবল মুরীদ হলেই সে বিষয়ের নিশ্চয়তা পাওয়া যায় যে ওর জন্য আওলিয়া কিরামের মত পরিণতি লিপিবদ্ধ হয়ে গেল।

এর থেকে আরও দৃষ্টান্তমূলক কাহিনী শুনুন। গ্রন্থ প্রণেতা লিখেনঃ

'আমার কাছে অনেক পীর ভাই তাদের স্ত্রীদের শুভ ইন্তেকালের দুর্লভ ও বিস্ময়কর ঘটনাবলী বর্ণনা করেছেন, যারা হযরতের মুরীদ ছিলেন।

আমার এক ভগ্নিপতি ছিল, যিনি বেশ কিছুদিন হলো কানপুরে গিয়ে হুযুরের হাতে বায়াত হয়েছিলেন, যখন ঘটনাক্রমে হুযুর তথায় তশরীফ এনেছিলেন। ওনার মৃত্যুর পর এক নেককার মহিলা স্বপ্ন দেখলেন যে, তিনি বলছেন, অনেক ভাল হয়েছে যে আমি কানপুর গিয়ে হুযুরের হাতে বায়াত হয়ে এসেছিলাম। আমি এখানে খুবই আরামে আছি। (আশরাফুস সওয়ানেহ ৩য় খন্ড ৮৬ পৃঃ)

দেখুন, কেবল হাত ধরার বরকতে পরকালের সমস্ত কিছু সহায় হয়ে গেল। সেই জগতের একজন নবাগতের এটা বলা -"খুবই ভাল হলো যে আমি হযরতের মুরীদ হয়েছিলাম। অপ্রাসঙ্গিক নয়, নিশ্চয় সে তথায় স্বীয় পীরের গোলামীর কোন সুফল দেখেছে।

এবার একদিকে খোদার দরবারে থানবী সাহেবের প্রভাব প্রতিপত্তির এ শান দেখুন, তার এক নগণ্য মুরীদও তাঁর সাথে সম্পর্কিত হওয়ার সুফল থেকে বঞ্চিত হয়নি, অন্যদিকে মাহবুব কিবরিয়া (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর বেলায় ওদের মনের কৃপণতা অবলোকন করলে চক্ষু থেকে রক্তাশ্রু বের হবে। তকবিয়াতুল ঈমানের প্রণেতা লিখেনঃ

তিনি (দঃ) স্বীয় বেটীকে সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিলেন যে আপনজনের হক আদায় করাটা ওসব বিষয়ে হতে পারে যেগুলো নিজের অধীনে হয়ে থাকে এবং আল্লাহর সেখানকার বিষয়সমূহ আমার অধিকারের বাইরে। ওখানে কারো কল্যাণ করতে পারি না, কারো সুপারিশকারী হতে পারি না। সুতরাং ওখানকার ব্যাপারে প্রত্যেকে নিজেকে নিজে শুধরিয়ে নিন এবং দোযখ থেকে বাঁচার জন্য সবরকম চেষ্টা করুন। তকবিয়াতুল ঈমান-৩৮ পৃঃ

(৫) থানবী সাহেবের অদৃশ্য জ্ঞান নিয়ে অনুসারীদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা

থানবী সাহেবের অদৃশ্য জ্ঞান সম্পর্কে তাঁর খাদেম ও মুরীদের মনোভাবটাও জানা দরকার। এর থেকে সেই পরিবেশটার অনুমান করা যাবে, যেটার উপর যে কোন ধর্মীয় নেতার চিন্তাধারার প্রতিফলন ঘটে।

'আশরাফুস সওয়ানেহ এর প্রণেতা লিখেনঃ

এ বিষয়ের স্বীকৃতি অনেকবার লোকদের মুখে শুনা গেছে এবং নিজেরও অনেকবার এর অভিজ্ঞতা হয়েছে যে, মনে মনে যে ধারণা করে আসে বা মনের

মধ্যে যে ধারণা সৃষ্টি হয়, প্রকাশ করার আগেই এর জবাব হুযুরের (থানবী) মুখ দিয়ে বের হয়ে গেল অথবা কেউ মানসিক অশান্তির অবস্থায় উপস্থিত হলো, তখন বিশেষ আলোচনায় বা সাধারণ আলোচনায় এমন কিছু বক্তব্য পেশ করলেন, যদ্বারা সান্তনা অর্জিত হয়ে গেল। (আশরাফুস সওয়ানেহ ৫৯ পৃঃ)

থানবী সাহেবের অদৃশ্য জ্ঞান সম্পর্কে ওনার এক অনুসারীর দৃঢ় বিশ্বাস এবং থানবী সাহেবের মনোপুত জবাব সম্পর্কিত আর একটি কাহিনী শুনুনঃ

"একজন নামকরা আলেম দৃঢ়ভাবে স্বীয় এ আকীদা (থানবী সাহেবের অদৃশ্য জ্ঞান) লিপিবদ্ধ করে পাঠালেন। তখন হযরত (থানবী) ওনার ধারণাটাকে অস্বীকার করলেন। কিন্তু এরপরও যখন উনি মানতে রাজি হলেন না এবং অস্বীকারকে বিনয় হিসেবে ধরে নিলেন, তখন হযরত উত্তরে লিখেন–'সেই ব্যবসায়ী বড় ভাগ্যবান যে নিজে নিজের জিনিসের বদ্‌নাম করছে, কিন্তু ক্রেতা এরপরও এটা বলছে, না এটা খারাপ নয়, অনেক মূল্যবান।" (আশরাফুস সওয়ানেহ ৩য় খন্ড ৫৯ পৃঃ)

এবার বলুন, এমন কোন বদবখত মুরীদ আছে, যে স্বীয় পীরের খোশ কিসমত দেখতে চায় না। এ উত্তরে তাঁর অদৃশ্য জ্ঞান সম্পর্কে ধারণা পোষণকারীদের জন্য উৎসাহব্যঞ্জক যে বক্তব্য রয়েছে, তা কিছুতেই অস্বীকার করার উপায় নেই। থানবী সাহেবের বেলায় অদৃশ্য জ্ঞানের আকীদাই যদি শিরক ছিল, তাহলে এখানে ফত্‌ওয়ার ভাষা কেন ব্যবহার করলেন না?

এবং সবচে মারাত্মক অভিযোগ হলো যে, থানবী সাহেবের অস্বীকারকে বিনয় হিসেবে ধরে নেয়া হলো এবং তিনি নিজেও অস্পষ্ট ভাষায় এর স্বীকৃতি প্রদান করলেন। কিন্তু এটা কোন্ ধরনের গোমরাহী যে কতেক বিষয়ের জ্ঞান ও অবগতি সম্পর্কে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর অস্বীকারকে হাজার হাজার দলীল থাকা সত্বেও বিনয় হিসেবে গ্রহণ করা হয় না। বরং অর্ধ শতাব্দি ধরে এটাই বার বার বলে আসতেছে যে মা যাল্লা বাস্তবেই তিনি (দঃ) গোপন বিষয় সমূহের জ্ঞান ও খবর থেকে অসমর্থ ছিলেন।

এ অভিযোগের বিচার আপনাদের উপর ছেড়ে দিলাম

www.Yqadri.blogspot.com

(৬) আর একটি ঈমান বিধ্বংসী বাহিনী

আশরাফুস সওয়ানেহের লিখক থানবী সাহেব সম্পর্কে ওনার জন্মের আগের এক ভবিষ্যদ্বাণী উদ্ধৃত করেছেন। উদ্ধৃত বক্তব্যের এ অংশটুকু উল্লেখযোগ্যঃ

'আশরফ আলী' এ নামটা হযরত হাফেজ গোলাম মরতুজা পানিপতী সাহেব (রহমতুল্লাহ আলাইহে) যিনি সেই যুগের সর্বজন মান্য ও প্রখ্যাত জন কল্যাণকামী মজযুব ছিলেন, হযরতের (থানবী সাহেব) জন্মের আগে বরং গর্ব ধারণ করার সাথে সাথেই আগাম বাছাই করে দিয়েছিলেন। (আশরাফুস সওয়ানেহ ১ম খন্ড ৭ পৃঃ)

থানবী সাহেব 'হিসামুল ইবরত' নামক কিতাবের ভূমিকায় নিজেই নিজের জন্মবৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করেন। এতে তিনি একান্ত মনঃপুত একটি রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন, যা পড়ার মত। তিনি লিখেনঃ

তিনি (থানবীর নানী) হযরত হাফেজ গোলাম মরতুজা মজযুব পানিপতীর কাছে অভিযোগ করলেন যে, হুযুর আমার এ মেয়ের ছেলে বাঁচে না। হাফেজ সাহেব দুর্বোধ্য ভাষায় বললেন যে আলী ও উমরের সংঘর্ষে মারা যাচ্ছে। এবার আলীকে সোপর্দ কর, বেঁচে থাকবে। (কয়েক লাইন পর) পুনরায় বল্লেন ওর দু'ছেলে হবে এবং জীবিত থাকবে। একজনের নাম আশরাফ আলী খান এবং অন্য জনের নাম আকবর আলী খান রেখো। নাম বলার সময় জোশে এসে 'খান' শব্দটা বাড়িয়ে বলেছিলেন। কোন একজন জিজ্ঞাসা করলেন, ওনারা কি পাঠান হবে? বললেন, না, না, আশরাফ আলী ও আকবর আলী নাম রেখো।

এটাও বললেন, একজন আমার হবে। সে মওলভী ও হাফেজ হবে এবং অন্যজন দুনিয়াদার হবে। কথামত এসব ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে সঠিক প্রমাণিত হলো। (এরপর গ্রন্থ প্রণেতা লিখেন)

হযরত সাহেব (থানবী সাহেব) প্রায় সময় বলতেন, এযে মাঝে মধ্যে আমি দুঃসাহসিক কথাবার্তা বলে থাকি সেই মজযুবের রূহানী মনোনিবেশের প্রভাব, যার দুআয় আমি জন্ম গ্রহণ করেছি। (আশরাফুস সওয়ানেহ ১ম খন্ড ১৭ পৃঃ)

মায়ের পেটে কি আছে? এটা সেই অদৃশ্য জ্ঞান, যেটা দেওবন্দীদের মতে খোদা ভিন্ন অন্য কারো জন্য স্বীকার করা শিরক। কিন্তু কী জঘন্য মানসিকতা দেখুন, নিজের বেলায় গর্ভাবস্থায় নয় বরং গর্ভধারণেরও আগের জ্ঞান মেনে নেয়া হয়েছে। শুধু নিজের ব্যাপারে নয়, সাথে সাথে নিজের ভাই এর বেলায়ও এবং তাও এত পরিস্কারভাবে যে নাম পর্যন্ত বাছাই করে দিয়েছেন এবং স্বভাব চরিত্র ও গুণাবলীর কথাও আলোকপাত করেছেন।

দেওবন্দী মাযহাবে এ ধরণের ক্ষমতার নাম খোদায়ী ইখতিয়ার। কিন্তু নিজের শান প্রকাশ করার জন্য এ খোদায়ী ক্ষমতাও গায়রুল্লার বেলায় বিনা বাক্যে গ্রহণ করে নেয়া হয়েছে এবং এতে ওদের আকীদায়ে তওহীদের উপর সামান্য আঁচড়ও পড়লো না।

(৭) দেওবন্দী জমাতের এক শেখ মওলভী আবদুর রহীম শাহ রায়পুরী সম্পর্কে 'আরওয়াহে ছালাছা' কিতাবে থানবী সাহেবের মুখে বলা এ কথাটি উদ্ধৃত করা হয়েছে।

> "বলা হয়েছে যে, মাওলানা শাহ আবদুর রহীম সাহেব রায়পুরীর কলবটা খুব নুরানী ছিল। আমি ওর কাছে বসতে ভয় করতাম, যেন আমার দোষগুলো ওনার কাছে প্রকাশ না পায়। আরওয়াহে ছালাছা-৪০১ পৃঃ

এর থেকে বড় ধর্মীয় ধোকাবাজি আর কি হতে পারে যে, একজন সাধারণ উম্মতের কলব এতটুকু নুরানী হয়ে যেতে পারে যে আমলসমূহ ও শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের আভ্যন্তরীণ অবস্থাসমূহ ওর থেকে গোপন থাকতে পারে না এবং গোপনে কৃত দোষসমূহের ব্যাপারেও সে অবহিত হয়ে যায়। কিন্তু এরা এ আকীদা পয়গম্বরগণের বেলায় পোষণ করাকে মৃত্যুদন্ড উপযোগী অপরাধ মনে করে থাকে।

সত্য কথা বলতে কি, দেওবন্দীদের সাথে ধর্মীয় মত পার্থক্য ও মনমালিন্যের অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে এরা আপন বুযুর্গদের বেলায় যতটুকু খোলামন, এর নিরানব্বই ভাগের এক ভাগ বরাবরও যদি মদনী সরকার (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর বেলায় সহানুভূতি থাকতো, তাহলে সমঝোতার অনেক পথ খুঁজে বের করা যেত।

নিজের জমাতের আর এক বুযুর্গের বেলায় সেই অদৃশ্য জ্ঞান সম্পর্কে থানবী সাহেবের স্বীকৃতি অবলোকন করুন। তাঁর মল্‌ফুজাতের সংগ্রাহক লিখেনঃ

(একদিন থানবী সাহেব) হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব সাহেব (রহমতুল্লাহে আলাইহে) সম্পর্কে বলেন, তিনি সেই মহামারীর আগাম খবর দিয়েছিলেন, যেটায় তাঁর আপনজন মারা গিয়েছিল।

পুনরায় তিনি বলেছেন, মাওলানা সাহেব বড় সাহেবে-কাশফ ছিলেন। রমাযান মাসেই তিনি বলে দিয়েছিলেন যে রমাযানের পর এক বড় মসীবত আসবে। এখনই এসে যেত কিন্তু রমাযানের বরকতে বাঁধাপ্রাপ্ত হয়েছে। যদি লোকেরা বাঁচতে চায়, তাহলে যেন প্রত্যেক জিনিস থেকে দান-খয়রাত করে। (হুসনুল আজীজ ১ম খন্ড ২৯৩)

কাল কি হবে, এর সম্পর্কও গায়বের সাথে। কিন্তু আপনারা দেখলেন যে কাল থেকে আরো আগে এগিয়ে গেছে। আর শুধু মসীবত আসার জ্ঞান নয় এবং এটাও জানা ছিল যে সেটা এখনই আসার ছিল কিন্তু রমাযানের বরকতে বাঁধাপ্রাপ্ত হয়েছে এবং লোকেরা দান খয়রাত করলে ফিরে যাবে।

এখন আপনারা বিচার করুন যে এ আকীদা যদি আমরা কোন নবী বা ওলীর বেলায় জায়েয মনে করি, তাহলে আমাদের ঈমান ও ইসলাম বিপদগ্রস্ত হয়ে যায়। অথচ এরা তাদের আপন জনদের বেলায় ডংকা বাজাচ্ছে। এতে কোন ক্ষতি নেই।

ছোট মিয়ার কাহিনীঃ এতক্ষণ তো সম্প্রদায়ের শেখদের আলোচনা ছিল। এবার ছোট মিয়ার কাহিনী শুনুন। আশরাফুস সওয়ানেহের লিখক থানবী সাহেবের খলিফা হাফেজ উমর আলীগড়ীর অদৃশ্য অবলোকনের একটি সুন্দর ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তিনি লিখেনঃ

একবার হাফেজ সাহেব রাতের ট্রেনে থানাবুন এসেছিলেন। যখন ট্রেন (থানবী সাহেবের) খানকার পাশ দিয়ে যাচ্ছিল, তখন তিনি জাগ্রতবস্থায় দেখলেন যে খানকা সংলগ্ন মসজিদের গুম্বদ থেকে আসমান পর্যন্ত একটি নুরানী তার সংযোজিত রয়েছে। (আশরাফুস সওয়ানেহ ২য় খন্ড ৬ পৃঃ)

একেই বলে একগুলিতে দু'শিকার। একদিকে স্বীয় অদৃশ্য অবলোকনের ক্ষমতার দাবী করা হয়েছে। কারণ নূরের এ সিলসিলার সম্পর্ক অদৃশ্য জগতেরই সাথেই সংশ্লিষ্ট, অন্যদিকে এটাও প্রকাশ করা উদ্দেশ্য যে পৃথিবীর বুকে খানায়ে কাবা ও গুম্বদে খাজরার মত থানবী সাহেবের খানকা সংলগ্ন মসজিদের গুম্বদও অদৃশ্য নূর ও তজল্লী অবতরণের কেন্দ্রস্থল।

যখন একজন খলিফার অদৃশ্য উপলব্ধি ক্ষমতার এ শান যে কপালের চোখে অদৃশ্য জগত দেখতেছে, তাহলে এর থেকে বুঝে নিন যে শেখের অদৃশ্য ক্ষমতা কোন্ পর্যায়ের হবে।

www.Yqadri.blogspot.com

চতুর্থ অধ্যায়

শেখে দেওবন্দ জনাব মওলভী হুসাইন আহমদ মদনী সাহেব প্রসঙ্গে

এ অধ্যায়ে শেখে দেওবন্দ জনাব মওলভী হুসাইন আহমদ সাহেব সম্পর্কে দেওবন্দী কিতাবাদি থেকে ও সমস্ত ঘটনাবলী ও অবস্থাদি একত্রিত করা হয়েছে, যে গুলোতে আকীদায়ে তওহীদের সাথে দ্বন্দ্ব, স্বীয় মাযহাবের বিপরীত এবং নিজেদের মুখে বলা শিরক্‌কে নিজেদের বেলায় ইসলাম ও ঈমান সাব্যস্ত করার লজ্জাষ্কর উদাহরণসমূহ প্রতিটি পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে। ইনসাফের দৃষ্টিতে পড়ুন এবং বিবেকের রায় শুনার জন্য কান খাড়া রাখুন।

ঘটনা প্রবাহ

অদৃশ্য জ্ঞান ও রূহানী হস্তক্ষেপের অদ্ভুত কাহিনী দিল্লীর দৈনিক আল জমিয়ত দেওবন্দের মওলভী হুসাইন আহমদ সাহেবের জীবন বৃত্তান্তের উপর "শেখুল ইসলাম সংখ্যা" নামে একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করে। জমিয়তে উলামার মুখপাত্র হিসেবে সেই পত্রিকার প্রতি দেওবন্দীদের যে আস্থা রয়েছে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

সেই "শেখুল ইসলাম সংখ্যায়" মওলভী হুসাইন আহমদ সাহেবের ছেলে মওলভী আসাদ মিয়ার বরাত দিয়ে একটি ঘটনা উদ্ধৃত করা হয়েছে। ওনার কারামাত ও আধ্যাত্মিক দৃষ্টি সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে লিখেনঃ

> গায্যালী সাহেব দেহলভী মদীনা তায়্যেবায় আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, আমি দিল্লীর এক রাজনৈতিক সমাবেশে গিয়াছিলাম। হযরতও (হুসাইন আহমদ মদনী) সেই সমাবেশে যোগদান করেছিলেন। ওখানে আমি দেখলাম যে, মহিলাগণও মঞ্চে বসে আছে। মনে মনে ধারণা হলো যে ওই ব্যক্তি কি ওলী হতে পারে, যিনি এ ধরণের সমাবেশে, যেখানে মহিলাগণও উপস্থিত থাকে, যোগদান করেন। এ ধারনা এসে হযরতের প্রতি এমন অবজ্ঞা সৃষ্টি হলো যে, আমি সমাবেশ থেকে চলে গেলাম।
>
> সেই রাত্রেই স্বপ্ন দেখলাম যে হযরত আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরেছেন। সেই সময় আমার মন কৃতজ্ঞ হয়ে গেল এবং সেই অবজ্ঞা আস্থায় পরিণত হলো। শেখুল ইসলাম সংখ্যা ১৬২ পৃঃ

এ ঘটনার বিস্ময়কর বিষয়াবলীর প্রতি একটু দৃষ্টিপাত করুন। এটা কত বড় অদৃশ্য জ্ঞান যে সমাবেশ থেকে ফিরে যাওয়া এক অপরিচিত ব্যক্তির মনের অবস্থা জেনে নিল। শুধু জেনে নেয়নি বরং নিজেকে একটি মনোরম আকৃতিতে পরিবর্তন করে স্বপ্নে ওর কাছে তশরীফ নিয়ে গিয়েছিলেন। একই সাথে এ অনন্য ক্ষমতাও দেখুন যে বুকে হাত রাখতেই হঠাৎ সেই অবজ্ঞা আস্থায় পরিণত হয়ে গেল এবং তৃতীয় রহস্য হচ্ছে, সেই সময় থেকে ঘুমন্ত ব্যক্তির বুকের লতিফাসমূহও জাগ্রত হয়ে গেল।

এ বিষয় গুলোকে যদি আমরা কোন নবী বা ওলীর বেলায় আকীদা হিসেবে প্রকাশ করি, তাহলে নানা দোষারোপের ছাপে গরদান নুইয়ে পড়বে। অথচ নিজেদের শেখের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য ঈমানের উপর আঘাত আসলেও সব জায়েয।

নিজের মৃত্যুর জ্ঞান

জমিয়তে উলামা মৈসুরের সভাপতি মওলভী রিয়াজ আহমদ সাহেব ফয়জাবাদী সেই শেখুল ইসলাম সংখ্যায় মওলভী হুসাইন আহমদ সাহেবের সাথে তাঁর শেষ সাক্ষাতের কথা উল্লেখ করেছেন। জীবন সায়াহ্নের এ আলোচনা বিশেষ করে স্মরণ রাখার মতঃ

"আমি বললাম, হযরত, ইন্‌শাআল্লাহ বছরের শেষে নিশ্চয় আসবো। তিনি বললেন, বলে দিয়েছি যে, সাক্ষাৎ হবে না। ইনশাআল্লাহ পরবর্তীতে আমাদের দেখা হবে হাশরের ময়দানে। আমার পাশে যারা সমবেত ছিল, অধমের সমবেদনায় অশ্রুসজল হয়ে গেল। হযরত বল্‌লেন, কান্নার কি আছে? আমার কি মৃত্যু হবে না? এর পর অধম একান্ত ভদ্রতার সাথে অদৃশ্য জ্ঞান ও হায়াত বৃদ্ধি সম্পর্কে কিছু কথা বল্‌তে চাইলাম কিন্তু বিরহ ব্যথার কারণে বল্‌তে পারলাম না। (শেখুল ইসলাম সংখ্যা ১৫২ পৃঃ)

এ আলোচনার সারকথা এটা ছাড়া আর কি হতে পারে যে, মওলভী হুসাইন আহমদ সাহেবের কাছে কয়েক মাস আগেই তাঁর মৃত্যুর ব্যাপারটা জানা হয়ে গিয়েছিল এবং "বলে দিয়েছি যে, সাক্ষাত হবে না" এ ভাষ্যটা সন্দেহ জনক ও অনিশ্চয়তামূলক নয় বরং দৃঢ় আস্থামূলক। "সমবেত সবাই অশ্রুসজল

হয়ে গেল" এ বাক্য দ্বারাও প্রকাশ পায় যে, লোকদের মনে সত্যি সত্যি সে ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছিল।

এ ঘটনায় বিশেষ করে যে বিষয়টা উপলব্ধি করার মত, সেটা হচ্ছে মৃত্যুর দৃঢ় জ্ঞান অদৃশ্য বিষয়াবলীর সাথে সম্পর্কিত। কিন্তু কুরআনের কোন আয়াত বা হাদীছের কোন রেওয়ায়েত মওলভী হুসাইন আহমদের সেই জ্ঞানের নিরব দাবী থেকে বাঁধা দিতে পারলো না এবং সেই খবরের উপর আস্থা জ্ঞাপনকারীদের বেলায় কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করলো না। এখন সেটার এমনভাবে প্রচার করা হচ্ছে যেন পৃথিবীর কোন বাস্তব স্বীকৃত বিষয়ে পরিণত হয়।

বৃষ্টি কবে হবে, সেটার জ্ঞান সম্পর্কিত একটি কাহিনী

দারুল উলুম দেওবন্দের মুফতী মওলভী জমীলুর রহমান সিয়ুহারী সেই শেখুল ইসলাম সংখ্যায় সাহাসপুর জিলার বিজনুরের এক জনসভার কথা বর্ণনা করেছেন, যেটা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আয়োজন করা হয়েছিল এবং সেখানে মওলভী হুসাইন আহমদ সাহেবও অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

তিনি লিখেছেন যে সভার কাজ শুরু হবার একটু আগে হঠাৎ আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে গেল। সভার আয়োজনকারীগণ আবহাওয়ার পরিবর্তন দেখে নিরাশ হয়ে গেল। এর পরের কাহিনী স্বয়ং ঘটনা বর্ণনাকারীর মুখেই শুনুনঃ

> সেই সময় ঘটনাবর্ণনাকারীকে উলঙ্গ মাথা মজযুব প্রকৃতির অপরিচিত এক ব্যক্তি সভাস্থল থেকে এক কিনারে নিয়ে গিয়ে হুবহু এ ভাবে বল্‌লেন-মওলভী হুসাইন আহমদকে গিয়ে বল, এ এলাকার দেখাশুনাকারী হলাম আমি। যদি সে বৃষ্টি অপসারণ করতে চায়, তাহলে এ কাজ আমার মাধ্যমে হবে।
>
> বর্ণনাকারী সঙ্গে সঙ্গে তাবুর কাছে গেলেন হযরত পায়ের আওয়াজ শুনে আসার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন এবং সেই সংবাদ শুনে এক অদ্ভুত রাগান্বিত স্বরে শোয়া অবস্থায় বল্‌লেন, যাও, বলে দাও, বৃষ্টি হবে না" (শেখুল ইসলাম সংখ্যা-১৪৭)

বিছানায় শায়িতাবস্থায় যে বলেছেন 'বৃষ্টি হবে না' এটা আসমানের রং দেখে বলেননি এবং এ বক্তব্যের পিছনে সেই জ্ঞানের দাবী রয়েছে, যা অদৃশ্য বিষয়াবলীর সাথে সম্পর্কিত। অর্থাৎ স্বীয় অদৃশ্য জ্ঞানের মাধ্যমেই তিনি

ভবিষ্যতের অবস্থা জেনে নিয়েছিলেন এবং দৃঢ় আস্থা ও নিশ্চিত ভাবে বলে দিলেন "বৃষ্টি হবে না।"

অথবা এ ঘটনায় সেই বিষয়টা প্রকাশ করা উদ্দেশ্য যে, পৃথিবীর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতাবলী সেই মজযুবের হাতে নয় বরং আমার হাতে। আমি বৃষ্টি বন্ধ করতে চাইলে কারো সাহায্য ছাড়া নিজেই এর ক্ষমতা রাখি।

যা হোক উভয় ধারণার মধ্যে যেটাই হোক না কেন এটা মযহাবী চিন্তা ধারার সাথে বিরোধীতার একটি নিকৃষ্টতম উদাহরণ। কেননা, দেওবন্দী জমাতের মূল কিতাব তকবিয়াতুল ঈমানে বর্ণিত আছেঃ

> অনুরূপ বর্ষণের সময়ের খবর কারো জানা নেই অথচ এর ঋতু নির্দিষ্ট এবং সেই ঋতুতেই বৃষ্টিপাত হয় এবং সমস্ত নবী বাদশাহ এবং শাসক এর কামনাও করে। তাই যদি এর নির্দিষ্ট সময় জানার কোন পথ থাকতো, তাহলে নিশ্চয় জেনে নিতেন। (তকবিয়াতুল ঈমান-২২ পৃঃ)

এ জায়গায় আমি আপনাদেরকে পুনরায় ঈমানের দোহাই দিয়ে বলবো ন্যায়ের সাথে ইনসাফ করার বেলায় কারো পক্ষপাতিত্ব করবেন না।

একদিকে পার্থিব কাজ কর্মের বেলায় দেওবন্দী শেখের বিশ্বগ্রাসী ক্ষমতা দেখলেন, অন্যদিকে জগতসমূহের আকা মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসালাম) এর শানের বেলায় ওদের কলমের খোঁচা অবলোকন করুনঃ

> "বিশ্বের সমস্ত কাজকর্ম আল্লাহর ইচ্ছায় হয়ে থাকে, রসুলের ইচ্ছায় কিছু হয়না। (তকবিয়াতুল ঈমান ৫৮ পৃঃ)

(৪) খোদায়ী ইখতিয়ারাধীন বিষয়ে প্রভাব বিস্তার ও হস্তক্ষেপ করার আজব কাহিনী

সেই শেখুল ইসলাম সংখ্যায় জনাব আহমদ মিয়া স্বীয় মুরব্বী সম্পর্কে সাবেরমতি কারাগারের একটি ঘটনা উদ্ধৃত করেছেন। এটা তখনকার কথা যখন মওলভী হুসাইন আহমদ সাহেবও সেই করাগারে নযরবন্দী ছিলেন। তিনি লিখেছেন, সেই সময় কারাগারের এক কয়েদীর ফাঁসীর হুকুম হয়েছিল। এ হুকুম শুনে ওর রক্ত শীতল হয়ে গিয়েছিল। মুন্‌শী মুহাম্মদ হুসাইন নামে এক কয়েদীর

www.Yqadri.blogspot.com

মাধ্যমে সে মওলভী হুসাইন আহমদ সাহেবের কাছে দু'আর আবেদন করলো। এর পরবর্তী ঘটনা স্বয়ং ঘটনা বর্ণনাকারীর মুখেই শুনুনঃ

> মুন্‌শী মুহাম্মদ হুসাইন হযরত (রহমতুল্লাহে আলাইহে) এর কাছে খুবই অনুরোধ করলো। হযরত ফরমালেন ঠিক আছে, ওকে গিয়ে বল যে, ওর রেহাই হয়ে গেছে। মুন্‌শী মুহাম্মদ হুসাইন সাহেব ওর কাছে গিয়ে বল্‌লো, বাবুজী বলে দিয়েছেন যে, তোমার রেহাই হয়ে গেছে। দু'টি দিন অতিবাহিত হওয়ার পর সেই কয়েদী পুনরায় অস্থিরতা প্রকাশ করলো যে এখনও কোন হুকুম আসলো না এবং আমার ফাঁসীর মাত্র কয়েক দিন বাকী রয়েছে। মুন্‌শী হুসাইন পুনরায় গিয়ে আরয করলে তিনি বলেনঃ আমিতো বলে দিয়েছি যে ওর রেহাই হয়ে গেছে। এরপর ফাঁসীর মাত্র দু এক দিন বাকী ছিল, ওর রেহায়ের হুকুম এসে গেল। (শেখুল ইসলাম সংখ্যা ১২২ পৃঃ)

দুআ প্রার্থনার উত্তরে 'রেহাই হয়ে যাবে' বল্‌লে আশাদায়ক উত্তর হিসেবে মনে করা যেত। কিন্তু 'রেহাই হয়ে গেছে' এ বাক্যটা ও ধরণের লোকের মুখ দিয়ে বের হতে পারে, যার হাতে এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতা আছে অথবা অদৃশ্য জগতের সমস্ত কাজ কর্ম যার চোখের সামনে, সে বলতে পারে। এ ছাড়া এ বাক্যের অন্য কোন রকম ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ হতে পারে না।

বিশ্বজগতের কাজ কর্মে মওলভী হুসাইন আহমদ সাহেবের কর্তৃত্ব ও হস্তক্ষেপ প্রমাণ করার জন্যইতো এসব ঘটনা সাজানো হয়েছে। কিন্তু উভয় জাহানের সুলতান (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর হস্তক্ষেপ ও ইখতিয়ারের প্রশ্নে ওদের আকীদার ভাষ্য হচ্ছেঃ

> "যার নাম মুহাম্মদ বা আলী, সে কোন কিছুর শক্তি রাখে না।" তকবিয়াতুল ঈমান ৪২ পৃঃ

এবার আপনারাই বলুন, হক-বাতিলের পার্থক্য উপলব্ধি করার জন্য আরও অধিক কিছু বলার প্রয়োজন আছে কি?

আর এক আশ্চর্য তামাশা

যদি অধৈর্য না হয়ে থাকেন, তাহলে আর একটি আশ্চর্যজনক মজার কাহিনী শুনুন। মওলভী মুহাম্মদ হুসাইন লাহেরপুরী নামে এক ব্যক্তি এ শেখুল ইসলাম সংখ্যায় নিজের এক দুর্লভ ও আশ্চর্য কাহিনী বর্ণনা করেন। তিনি বলেন যে আমার জীবনের প্রথম দিকে প্রায় নামায বিশেষ করে ফযজর ও যোহর নামায বাদ পড়তো। এতে আমি মর্মাহত হয়ে এ বিষয়ে হযরত শেখের কাছে একটি চিঠি লিখে পাঠালাম। এর জবাবে তিনি আমাকে তাগিদ দিলেনঃ

"এরপর আমার এমন অবস্থা হয়ে গেল যে, বিরতিহীনভাবে ফজর ও যোহরের নামাযের সময় স্বপ্নে হযরতকে রাগান্বিত দেখতাম এবং বল্‌তেন কি নামায পড়ার ইচ্ছে নেই?

আমি ঘাবরিয়ে উঠে যেতাম। এ অবস্থা প্রায় দেড় মাস পর্যন্ত বলবৎ ছিল। যখন নিয়মিত নামাযের অনুসারী হয়ে গেলাম, তখন এ অবস্থার ইতি হলো। শেখুল ইসলাম সংখ্যা ৩৯ পৃঃ

হাজার হাজার মাইল দূর থেকে নিয়মিত ফজর ও যোহরের সময় এসে প্রতিদিন কাউকে উঠায়ে দেয়াটা যেমন বাতেনী হস্তক্ষেপের অসাধারণ কৃতিত্ব, তেমন অসাধারণ কাশ্‌ফ-ক্ষমতার মাহিত্ব যে হাজার হাজার মাইলের দূরত্ব থেকে তিনি প্রতিদিন এটাও জেনে নিত যে, অমুক ব্যক্তি শুইয়ে রয়েছে, সে এখনও নামায পড়েনি। এবং এরপর যখন সে নামাযের পাবন্দ হয়ে গেল, সেটাও তাঁর জানা হয়ে গিয়েছিল এবং তিনি স্বপ্নে আসাটা বাদ দিলেন।

এ ঘটনাটি খোলামনে পড়লে এটাই মনে হয় যে ঘরের পাশ্ববর্তী কামরার কাউকে যেন উঠায়ে দিতেন।

মনের ধারণা সম্পর্কে অবহিত হওয়ার আর এক অদ্ভূত কাহিনী

দিল্লীর মওলভী আখলাক হুসাইন কাসেমী সেই শেখুল ইসলাম সংখ্যায় বর্ণনা করেন যে হাজী মুহাম্মদ হুসাইন গজকওয়ালা দিল্লী প্রবাসী পাঞ্জাবীদের সরদার ছিলেন। তিনি হাফেজে কুরআনও ছিলেন কিন্তু তাঁর কাছে কুরআন ভালমতে স্মরণ ছিল না, একবার কোন এক উপলক্ষে মওলভী হুসাইন আহমদ সাহেব ওনাকে হাফেজ সাহেব বলে ডাকলেন, এর পরের ঘটনাটি স্বয়ং হাজী সাহেবের মুখে শুনুনঃ

হযরতের পবিত্র মুখ থেকে 'হাফেজ সাহেব' শব্দ শুনে হতভম্ব হয়ে গেলাম। মনে মনে লজ্জিত হলাম যে আমার তো কুরআন শরীফ ভালমতে স্মরণ নেই। এ হযরত কী যে বলে ফেললেন। এ মনোভাব নিয়ে ভিতরে গিয়ে বসলাম। বসার সাথে সাথেই হযরত বল্‌লেন, হাফেজ সাহেব আমার স্মরণ শক্তিও দুর্বল। সামান্য লালিমা মিশ্রিত কাল রং এর এক প্রকার বিশেষ পাখী দেখা যায়, সেটা খাও, স্মরণ শক্তি ভাল হয়ে যাবে। (শেখুল ইসলাম সংখ্যা ১৬৩পৃঃ)

এ ঘটনায় সবচে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে মওলভী আখলাক হুসাইন কাসেমীর মনোভাব, যা তিনি সেই ঘটনা প্রসঙ্গে প্রকাশ করেছেন। তিনি লিখেনঃ

লেখক বলেন, হাজী সাহেবের মনে যে ধারণা এসেছিল, হযরত মদনীর ঈমানী শক্তি বলে তা অনুধাবন করে নিয়েছিলেন। একে পরিভাষায় 'কশফুল কুলুব' বলা হয়। (শেখুল ইসলাম সংখ্যা ১৬৩ পৃঃ)

এ প্রশ্নটা পুনরায় উল্লেখ করার জন্য এর থেকে যথার্থ জায়গা আর একটা হতে পারে বলে আমার মনে হয় না। প্রশ্নটা হচ্ছে মনের লুকায়িত ধারণা উপলব্দি করার জন্য, এ ঈমানী শক্তি ওদের মতে স্বয়ং পয়গম্বরে আযম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর মধ্যে বিদ্যমান ছিল কিনা? যদি মওজুদ থাকে, তাহলে তাদের আকীদার এ ভাষা কার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে?

"এ বিষয়েও ওনার গর্ব করার কিছু নেই যে আল্লাহ সাহেব গায়বী জ্ঞান ওনার ইখতিয়ারাধীনে দিয়েছেন যে, কারো মনের অবস্থা যখন ইচ্ছে জেনে নিল। (তকবিয়াতুল ঈমান ৩ পৃঃ)

এখন এ ঈমান বিধ্বংসী মনোভাবের বিচার আপনাদের বিবেকের কাছে ছেড়ে দিলাম যে দেওবন্দী মাযহাব মতে যে ঈমানী শক্তি আল্লাহ তাআলা স্বীয় পয়গম্বরকে দান করেননি, সেটা দেওবন্দের শেখুল ইসলামের কিভাবে অর্জিত হলো?

গায়বী উপলব্দি ক্ষমতা ও বাতেনী হস্তক্ষেপের আর এক ঈমান বিধ্বংসী ঘটনা।

এবার গায়বী উপলব্ধি ক্ষমতা ও বাতেনী হস্তক্ষেপের একটি একান্ত রহস্যজনক ঘটনা শুনুন। মওলভী হুসাইন আহমদ সাহেবের এক মুরীদ ডাঃ হাফেজ মুহাম্মদ জাকারিয়া সেই শেখুল ইসলাম সংখ্যায় নিজের চোখের দেখা এ ঘটনাটি প্রকাশ করেন। তিনি বলেছেন যে, তার এক পীর ভাই এর মারাত্মক অসুখ হয়েছিল, অবস্থা খুবই কাহিল হয়ে গিয়েছিল। এর পরবর্তী ঘটনা তাঁর নিজের মুখেই শুনুনঃ

"ডাক্তার হিসেবে আমাকে ডাকা হলো, গিয়ে দেখি শরীর একেবারে অনড়, চোখ স্থির হয়ে রয়েছে, মৃত্যুর লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে। এ দৃশ্য দেখে আমি চিন্তিত ও অস্থির হয়ে গেলাম। হঠাৎ দেখি, রোগী আস্তে আস্তে হাত উঠায়ে কাউকে সালাম করতেছে। অতঃপর বলতেছে, হুযূর এখানে তশরীফ রাখুন। কিছুক্ষণ পর উঠে বসে যায় এবং নিজের বাপ ও অন্যান্যদেরকে জিজ্ঞাসা করে, হুযূর কোথায়

তশরীফ নিয়ে গেলেন? উত্তরে ঘরের লোকেরা বললেন, হুযূরতো এখানে তশরীফ আনেননি। সে আশ্চর্য হয়ে বলে, হুযূরতো তশরীফ এনেছিলেন এবং আমার চেহারা ও শরীরে হাত বুলায়ে বলেছেন যে, 'ভাল হয়ে যাবে, ভয় কর না। (ডাক্তার সাহেব বলেন) তখনও আমি বসা ছিলাম। দেখি জ্বর একদম অদৃশ্য হয়ে গেছে এবং সে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেছে।" (শেখুল ইসলাম সংখ্যা-১৬৩ পৃঃ)

এবার এর পরবর্তী ঘটনার সংকলনকারী মওলভী সুলায়মান আযমী (ফাজেলে দেওবন্দ) এর এ বর্ণনাটা বিশেষ মনোযোগ সহকারে পড়ুনঃ

"সংকলনকারী বলেন, হযরত শেখের এটা হচ্ছে মামুলী কারামাত। এর থেকে অনুমান করা যায় যে স্বীয় মুরীদদের সাথে হুযূরের কীযে গভীর সম্পর্ক ছিল।" (শেখুল ইসলাম সংখ্যা-১৬৩ পৃঃ)

কি বুঝতাছেন? আসলে এটাই বুঝাতে চেয়েছে যে, হযরত শেখের আগমনের ঘটনা সেই রোগীর মনের কল্পনার প্রতিফলন ছিল না বরং বাস্তবেই হযরত শেখ ওর কাছে তশরীফ এনেছিলেন এবং চোখের পলকে আরোগ্য দান করে চলে গেলেন।

এক মূহুর্তের জন্য খোলা মনে চিন্তা করে দেখুন, এ ঘটনার প্রেক্ষাপটে কত যে প্রশ্ন উঁকি মারছে।

প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে, যদি মওলভী হুসাইন আহমদ সাহেবের অদৃশ্য জ্ঞান না থাকতো, তাহলে তিনি হাজার হাজার দূরত্ব থেকে এটা কিভাবে জানতে পারলেন যে, আমার অমুক মুরীদ অসুখে করুণ অবস্থায় গিয়ে পৌছেছে, সহসা গিয়ে ওর সাহায্য করা চায়।

দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, সেই রোগীর কাছে তিনি স্বপ্নে নয় বরং ওর পূর্ণ জাগ্রতাবস্থায় তশরীফ এনেছেন এবং সেটাও এমন এক মনোরম আকৃতিতে যে, রোগী ছাড়া আশ পাশের অন্যান্য সকলের দৃষ্টির আড়ালে রইলেন। তাই যখন ইচ্ছে রূহের মত এক মনোরম আকৃতি কোথায় থেকে পেলেন?

আর আরোগ্য দান করার এ আশ্চর্যকর ক্ষমতাও দেখুন যে এ দিকে মসীহ হাত বুলায়ে দিল, ওদিকে প্রাণহীন রোগী চোখ খুললো।

দেওবন্দী মাযহাবে এ বিষয়গুলোর নাম যদি খোদায়ী হস্তক্ষেপ নয়, তাহলে তকবিয়াতুল ঈমানের লেখক কলমের খোঁচায় খোদায়ী ইখতিয়ার সমূহের যে চিত্র অংকন করেছে, সেটা কার চিত্র?

ইনসাফ ও ন্যায়নীতির প্রতি এটা কীযে মর্মান্তিক অবজ্ঞা যে অদৃশ্য অনুধাবণের ক্ষমতা এবং হস্তক্ষেপ ও ইখতিয়ারের যে আকীদা দেওবন্দীদের মতে রসূলে কাওনাইন (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর বেলায় প্রমাণিত নয়, সেটা ওদের শেখের মামুলী কারামত।

আর এক ভয়ংকর কাহিনী

গায়বী উপলব্ধি ক্ষমতা এবং বাতেনী হস্তক্ষেপের আর একটি কাহিনী শুনুন।

দেওবন্দী জমাতের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক মুফতী আযিযুর রহমান বিজনুরী 'আনফাসে কুদসিয়া' নামে একটি কিতাব লিখেছেন, যেটা মদীনা বুক ডিপো বিজনূর থেকে প্রকাশ করা হয়েছে। কিতাবটি মওলভী হুসাইন আহমদ সাহেবের জীবন বৃত্তান্ত নিয়ে রচিত। তিনি সেই কিতাবে মওলভী হুসাইন আহমদ সাহেবের কোন এক মুরীদের একটি ঘটনা উদ্ধৃত করেছেন। ঘটনাটি আসামের একটি পাহাড়ী এলাকায় সংঘটিত হয়েছিল। এবার পুরা ঘটনাটা ওনার ভাষায় শুনুনঃ

'বালিনুদীস্থ মওলভী বাজারের এক ব্যক্তি স্বাধীনতার আগে ঢাকা থেকে মোটরযোগে শিলং যাচ্ছিল। আসাম প্রদেশের প্রায় জায়গা পাহাড়ী; মোটর ও বাস চলার যে রাস্তা আছে, তা খুবই সরু। মাত্র একটি গাড়ী চলাচল করতে পারে, দু'টা চলার কোন সুযোগ নেই। এ লোকটি হযরতের মুরীদ ছিল। যখন অর্ধেক পথ অতিক্রম করলো, তখন দেখতে পেল যে সামনের দিক থেকে একটি ঘোড়া খুবই দ্রুতগতিতে আসতেছে। এ ব্যক্তি ও অন্যান্য সবাই ঘাবড়িয়ে গেলেন যে এখন কী অবস্থা হবে। মোটর থামিয়ে রাখলেন। কিন্তু তা সত্বেও ভীষন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হলেন, কেননা ঘোড়া কোন আরোহী ছাড়া দ্রুতগতিতে দৌড়ে আসতেছিল।

বর্ণনাকারী বলেন, সেই লোকটি স্বীয় মনে চিন্তা করলেন, 'পীর মুরশিদ এখানে হতো, অবশ্য দুআ করতেন। শুধু এতটুকু চিন্তা করছিল, এদিকে হযরত শেখ ঘোড়ার লাগাম ধরে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেলেন। (আনফাসে কুদসীয়া-১৮৬ পৃঃ)

কোথায় দেওবন্দ আর কোথায় আসামের পাহাড়। মাঝখানে অনেক মাইলের ব্যবধান। কিন্তু মনের মধ্যে ধারণা আসার সাথে সাথেই হযরত চোখের পলকে উপস্থিত হয়ে গেলেন এবং ঘোড়ার লাগাম ধরে বিজলীর মত অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

শত শত মাইল দূর থেকে তিনি মনের ফরিয়াদ শুনে ছিলেন। শুধু শুনেনি বরং ওখান থেকে ঘটনার স্থানটাও জেনে নিয়েছিলেন এবং শুধু জেনে বসে থাকেননি বরং নিমিষে ওখানে পৌছেও গিয়েছিলেন এবং শুধু পৌছে নাই বরং সেই দ্রুতগামী ঘোড়ার লাগাম ধরে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

ন্যায় বিচারের নাম নিশানা যদি এখনও দুনিয়া থেকে বিলুপ্ত না হয়ে থাকে, তাহলে প্রথম পর্বে (নাটকের প্রথম দৃশ্য) দেওবন্দী জমাতের যে সব অভিমত উদ্ধৃত করা হয়েছে, ওগুলো সামনে রেখে ফয়সালা করুন যে, মওলভী হুসাইন আহমদ সাহেবের গায়বী ক্ষমতার এ কাহিনী কী এ ধারণাটা দেয় না যে ওদের কাছে শিরকের ওই সমস্ত আলোচনাদি কেবল নবী ও ওলীগণের মানসম্মান নিয়ে ছিনিমিনি খেলার জন্য। অন্যথায় সত্যিকার আকীদায়ে তাওহীদের জযবা যদি এর পিছনে অনুপ্রেরণা যোগাতো, তাহলে শিরকের প্রশ্নে আপন পরের এ পার্থক্যটা কেন বৈধ রাখা হয়? লক্ষ্য করুন! এ পুরা ঘটনাটা অদৃশ্য উপলব্ধি ও হস্তক্ষেপ ক্ষমতার সাথে সম্পৃক্ত, যেটা দেওবন্দীদের মতে কোন মখলুকের বেলায় মেনে নেয়াটা শিরক। কিন্তু ধন্যবাদ! শেখের প্রেমে এ শিরকও তারা হজম করে নিলেন।

আশ্চর্যের বিষয়! দেওবন্দের এ মূর্তি নির্মাতা আযর আজ তাওহীদের দাবীদার হয়ে গেছে।

মৃত্যুর পর কবর থেকে বের হয়ে বন্ধুর বাড়ীতে আসা

আগের কাহিনীটা ছিল হযরত শেখের জীবিত থাকাকালীন সময়ের। তিনি বিজলীর মত চমকালো, অদৃশ্য হয়ে গেল এবং লোকেরা স্বচক্ষে তাকে দেখেও নিল। কিন্তু এবার মৃত্যুর পর স্বীয় কবর থেকে বের হয়ে বন্ধুর বাড়ীতে তশরীফ আনার এক অদ্ভুত কাহিনী শুনুনঃ

কিছু দিন হলো দেওবন্দের মুখপত্র মাসিক দারুল উলুমে মওলভী ইব্রাহীম সাহেব বলিয়াবীর মৃত্যু সম্পর্কে এক বিস্ময়কর খবর প্রকাশিত হয়েছিল। মৃত্যুর

সময়ে প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা মতে যখন মওলভী ইব্রাহীম সাহেবের শেষ সময় ঘনিয়ে এলো, তিনি আপন ছেলেকে সম্বোধন করে বললেনঃ

'হযরত আব্বাজান দাঁড়িয়ে আছেন, তুমি সম্মান করতেছ না। হযরত মদনী দাঁড়িয়ে হাসতেছেন এবং ডাকতেছেন। শাহ ওসিউল্লাহ সাহেবও এসেছেন আমাকে উঠাও।' (দারুল উলুম মার্চ ১৯৬৭ ইং ৩৭ পৃঃ)

অনেক দিন হলো, মওলভী হুসাইন আহমদকে দেওবন্দের মাটিতে দাফন করা হয়েছে আর শাহ ওসি উল্লাহ সাহেব সম্পর্কে কি আর বলবো, ওনার ভাগ্যে জমীনের দু'গজ জায়গাও জুটেনি। জাহাজ থেকে সমুদ্রবক্ষে ছেড়ে দেয়া হয়েছিল।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এদের যদি অদৃশ্য জ্ঞান না থাকে, তাহলে মওলভী হুসাইন আহমদ সাহেব দেওবন্দের গোরস্থানে রয়ে এবং শাহ ওসি উল্লাহ সাহেব সমুদ্রের তলদেশে হয়ে কিভাবে জানতে পারলেন যে মওলভী ইব্রাহীমের শেষ সময় ঘনিয়ে এসেছে, গিয়ে ওকে আমাদের সাথে নিয়ে আসা দরকার এবং শুধু এতটুকু নয়, অদৃশ্য উপলব্ধি ক্ষমতার সাথে সাথে ওদের মধ্যে ইচ্ছামাফিক চলাফেরা করার এ ক্ষমতাও স্বীকার করে নেয়া হয়েছে যে, আলমে বরযখ থেকে সোজা মৃত্যুশয্যায় শায়িত ব্যক্তির কাছে গেলেন এবং ওকে সাথে নিয়ে কবরস্থানে ফিরে আসলেন।

এখন আমাদের অপরাধের ইনসাফ করুন যে এ জ্ঞান, উপলব্ধি, ক্ষমতা ও ইখতিয়ারের আকীদা আমাদের আকায়ে বরহক সায়্যিদুল আলম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর শানে জায়েয মনে করলে, দেওবন্দের এ সব একত্ববাদীরা আমাদেরকে আবু জেহলের সমতুল্য মুশরিক মনে করে।

ভাগলপুরের এক মুরীদ মুরাকাবার মাধ্যমে জানাযায় অংশগ্রহণ

এতক্ষণ পর্যন্ততো স্বয়ং শেখ সাহেবের কথাই বলা হচ্ছিল। এবার তাঁর এক নগণ্য মুরীদের অদৃশ্য উপলব্ধি ক্ষমতা দেখুনঃ

ভাগলপুর জিলার কোন এক গ্রামে হাজী জামাল উদ্দীন নামে এক মুরীদ ছিলেন। তিনি সেই শেখুল ইসলাম সংখ্যায় তাঁর পীরের ওফাতের পর এক বিস্ময়কর ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তিনি লিখেনঃ

আমি হযরতের ইন্তেকালের পর জুমা রাতে (উল্লেখ্য যে হযরতের ইন্তেকাল বৃহস্পতিবারে হয়েছিল) বার তসবীহ থেকে ফারেগ হওয়ার পর কিছুক্ষণ মুরাকাবায় বসলাম। দেখি, হযরতের ইন্তেকাল হয়ে গেছে, অনেক লোকের সমাবেশ এবং হযরতের জানাযা পড়া হচ্ছে। আমিও ওসব লোকদেরকে দেখে জানাযায় শরীক হয়ে গেলাম। এরপর লোকেরা হযরতকে কবরস্থানের দিকে নিয়ে গেলেন। (শেখুল ইসলাম সংখ্যা ১৬৩ পৃঃ)

কত যে আশ্চর্যকর মুরাকাবা যে, কোন বার্তা বাহক ছাড়া হযরতের ইন্তেকালের খবর জানা হয়ে গেল। ঘরে বসে জানাযার সমাবেশও দেখে নিলেন এবং চোখের পলকে ওখানে পৌছে জানাযাতে শরীকও হয়ে গেলেন। উল্লেখ্য যে মুরাকাবার অবস্থা স্বপ্নের অবস্থার মত নয় বরং মুরাকাবা জাগ্রতাবস্থায় হয়ে থাকে।

এখন একদিকে আবরনহীনভাবে দর্শন এবং খোদায়ী হস্তক্ষেপের এ সুস্পষ্ট দাবী অবলোকন করুন যে মাঝখানের আবরন অপসারনের জন্য হযরত জিব্রাইল (আলাইহিস সালাম) এরও কোন সাহায্যের প্রয়োজন হয়নি, অন্যদিকে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর বেলায় এদের আকীদা হচ্ছে মাযাল্লা, সরকারে কায়েনাত (সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর কাছে দেওয়ালের পিছনেরও খবর নেই এবং তাঁর জ্ঞান ও উপলব্ধির প্রতিটি বিষয় হযরত জিব্রাইলের লজ্জাষ্কর সহানুভূতি।

অদৃশ্য জ্ঞানের আরও কয়েকটি বিস্ময়কর ঘটনাবলী

মুফতী আযীযুর রহমান বিজনূরী স্বীয় রচিত "আনফাসে কুদসীয়া' কিতাবে হযরতের (শেখুল ইসলাম) অদৃশ্য জ্ঞান সম্পর্কে দু'টি বিস্ময়কর ঘটনা উদ্ধৃত করেছেন। নিম্নে ঘটনা দু'টি পড়ুন এবং তাওহীদ পুজার মুকাবিলায় পীর পুজার তামাশা দেখুনঃ

প্রথম ঘটনা

রমাযান মুবারকের সময় অনেক বার এমন হয়েছে যে, যেদিন, তিনি (শেখুল ইসলাম) বিতরের নামাযে সুরা "ইন্না আনযাল্‌নাহু' তিলাওয়াত করেছেন, সেদিন শবে কদর হতো এবং ঈদের চাঁদ–রাতের ব্যাপারেও অনেকবার এটা লক্ষ্য করা

লক্ষ্য করা গেছে যে, যেদিন চাঁদরাত হতো, হযরত সেই দিন ভোর থেকে ঈদের আয়োজন শুরু করে দিতেন এবং একদিন আগে কুরআন শরীফ খতম করতেন, যদিওবা উনত্রিশ তারিখ হয়ে থাকে। হযরতের এ নিয়মের ভিত্তিতে তাঁর প্রত্যেক খানকার লোকেরা বলতে পারতেন যে আজ চাঁদ-রাত। (আনফাসে কুদসীয়া ১৮৫ পৃঃ)

"যে দিন তিনি বিতর নামাযে সুরা ইন্না আনযালনাহ তিলাওয়াত করতেন, সেদিন শবে কদর হতো-এর ভাবার্থ যদি এটাও গ্রহণ করা না হয় যে তাঁর তিলাওয়াতের কারণে বাধ্য হয়ে সেই দিন শবে কদর হয়েছিল, তবুও এ অর্থটা যথাস্থানে সুস্পষ্টভাবে অটল আছে যে তাঁর শবে কদরের খবর জানা হয়ে যেত। অথচ উলামায়ে কিরাম ভালমতে জানেন যে শবে কদর সৃষ্টিকুলের কাছে একটি খোদায়ী ভেদ হিসেবে গোপন রাখা হয়েছে। স্বয়ং রসুলে পাক সাহেবে লওলাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) ও খোলা খুলিভাবে এটা সম্পর্কে নির্দিষ্ট করে বলেননি। কিন্তু দেওবন্দের এসব হযরত স্বীয় অদৃশ্য উপলব্ধি ক্ষমতার মাধ্যমে খোদার গুপ্ত ভান্ডারে উঁকি দিয়ে জেনে নিতেন যে আজ শবে কদর। শুধু এতটুকু নয়, বরং কয়েকদিন আগে তার কাছে এটাও কাশফ হয়ে যেত যে, কোন্ দিন চাঁদ দেখা যাবে এবং সেই জানাটা এত নিশ্চয়তা সহকারে হতো যে তাঁর সেই জ্ঞানের ভিত্তিতে তিনি নিজেও ঈদের আগ থেকে প্রস্তুতি শুরু করে দিতেন এবং তাঁর খানকার দরবেশদেরও চাঁদরাত জানার জন্য আসমানের দিকে থাকানোর প্রয়োজন হতো না।

আপন হযরত সম্পর্কে তথাকথিত তওহীদবাদীদের এ মানসিকতা একটু লক্ষ করুন যে কুরআন সুন্নাহের সমস্ত বাণী এখানে অকেজো হয়ে গেল। এখন শুধু হযরতের জযবাই আকীদা, অন্য কিছু নয়।

দ্বিতীয় ঘটনা

'মওলভী ইসহাক সাহেব হাবীবগনজী বর্ণনা করেছেন যে, প্রতি রমাযানুল মুবারকের সময় সিলেটবাসীদের বারবার অনুরোধে তিনি সিলেট তশরীফ নিয়ে যেতেন। এ ব্যাপারে সিলেটের এক দোকানদার থেকে চাঁদা নেয়ার সময় কথা কাটাকাটি হয়েছিল। সে বিরক্ত হয়ে এগার টাকা চাঁদা দিল এবং এ বাক্যটি বললো-এটা কি ট্যাক্স? যাহোক আদায়কৃত চাঁদার একটি অংশ হযরতের কাছে

পাঠিয়ে দেয়া হলো। কয়েক দিন পর ওখান থেকে এগার টাকা ফেরত এসে গেল এবং কুপনের উপর লিখা ছিল যে দোকানদার থেকে টাকা নিয়ে পাঠানোটা আমার অপছন্দ হয়েছে। ওকে এ টাকা ফেরত দিয়ে দাও। (আনফাসে কুদসীয়া-১৮৬ পৃঃ)

আল্লাহু আকবর! কোথায় সিলেট আর কোথায় দেওবন্দ! কিন্তু ঘটনার বিবরণ পড়ে একেবারে এ রকম মনে হয় যে ওই দোকানদারের বিরক্ত হওয়ার ঘটনাটা যেন হযরতের সামনেই হয়েছে।

এটা হচ্ছে অতি বিশ্বাসের প্রতিফলন। যেটা মেনে নিতে ইচ্ছে হয়েছে, মেনে নিয়েছে।

তৃতীয় ঘটনা

দিল্লীর মওলভী আবদুল ওহীদ সিদ্দিকী স্বীয় সংবাদপত্র নয়ী দুনিয়ার একটি বিশেষ সংখ্যা 'আযীম মদনী সংখ্যা' নামে প্রকাশ করেছিলেন। তিনি তার এ বিশেষ সংখ্যায় মওলভী হুসাইন আহমদ সাহেবের অদৃশ্য জ্ঞান সম্পর্কিত মুরাদাবাদ কারাগারের দু'টি ঘটনা উদ্ধৃত করেছেন, যা নিম্নে প্রদত্ত হলো। তিনি লিখেনঃ

একদিন হযরতের নামে একটি পানের পার্সেল আসলো, যেটার খবর কেবল কারারক্ষকের ছিল, অন্য কেউ জানতো না। তিনি (কারারক্ষক) সেই পার্সেলটা সতর্কতার সাথে আটকে রাখলেন। অল্প কিছুদিন পর নিয়ম মাফিক তিনি কারাকক্ষসমূহ পরিদর্শন করতে যান। হযরত মদনীর সাথে ওই সময় হাফেজ মুহাম্মদ ইব্রাহীম সাহেব ও অন্যান্য সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ ছিল। যে মাত্র কারারক্ষক সাহেব হযরতের সামনে আসলেন, হযরত ফরমালেন, সাহেব, আপনি আমার পানের পার্সেল আটকে রাখলেন কেন? ঠিক আছে কোন অসুবিধা নেই। আজ ওখান থেকে কেবল ছয়টি পান দিয়ে দিন। পরশুর মধ্যে অপর পার্সেল এসে যাবে

জনাব কারারক্ষক ভীষণ আশ্চর্য হয়ে গেলেন যে এ ঘটনার খবর হযরতের কীভাবে জানা হয়ে গেল। তিনি গোপনে পান এনে দিয়ে দিলেন। হযরত ওখান থেকে মাত্র ছয়টি পান রেখে অবশিষ্ট গুলো ফেরত দিয়ে দিলেন এবং বললেন, আমার পান পরশুর মধ্যে এসে যাবে। ওটা আটক করবেন না। তৃতীয় দিন

কথামত পানের পার্সেল আসলো। এবার কারারক্ষকের ধারণা হলো যে এ ব্যক্তি কোন সাধারণ ব্যক্তি নয় বরং সফলকাম কোন সাধু পুরুষ মনে হয়।'' দৈনিক নয়ী দুনিয়ার 'আজীম মদনী সংখ্যা' ২০৮ পৃঃ)

একেই বলে একগুলিতে দু'শিকার। আগের খবরও বলে দিলেন যে, 'আমার পানের পার্সেল এসেছিল, আপনি আটকে রেখেছেন এবং ভবিষ্যতের খবরও দিয়ে দিলেন যে পরশুর মধ্যে আমার পানের আর একটি পার্সেল আসবে, ওটা আটকে রাখবেননা।'

এ ঘটনার পিছনে সবচে দুঃখজনক বিষয় হচ্ছে ওদের সেই পাষাণ মনোভাব যে এখানে বিগত ও ভবিষ্যতের জ্ঞানতো সফলকাম সাধু পুরুষের আলামত বলে স্বীকার করে। কিন্তু যে মাহবুবের পদার্পণ জাতে কিবরীয়া পর্যন্ত, ওনার বেলায় এ আলামত স্বীকার করতে গেলে ওদের কাছে শিরকের গন্ধ লাগে।

চতুর্থ ঘটনা

সেই কারাগারের দ্বিতীয় ঘটনা হচ্ছেঃ

ওই সময় কারাগারে মাওলানার নামে কোন এক জায়গা থেকে একখানা চিঠি এসেছিল, যেটার উপর সেন্সর কোর্টের সীল ছিল। কারারক্ষক সেই চিঠি মাওলানাকে দিয়ে দিলেন। ইন্সপেক্টর জেনারেলের পক্ষ থেকে তদন্ত হলো এবং সেই অপরাধে কারারক্ষককে সাময়িক বরখাস্ত করা হলো।

এ ঘটনার পরক্ষণে তিনি (কারারক্ষক) মাওলানার খেদমতে গিয়ে দেখেন যে মাওলানা মুচকি হেসে বল্লেন পান যা দিয়েছেন, এর ফলে সাময়িক বরখাস্ত হয়েছেন। পান না দিলে কী অবস্থা হতো? তিনি ভীষণ আশ্চর্য হয়ে গেলেন যে সবেমাত্র অফিসে ঘটনাটি ঘটলো, এখনও কেউ জানেনি। কিন্তু তাঁর কীভাবে জানা হয়ে গেল! তিনি স্বীয় দুঃখের কথা প্রকাশ করলে, হযরত বলেন, ইনশাআল্লাহ কালকের মধ্যে পুনঃবহালের হুকুম আসবে, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। ওনার বিস্ময়ের সীমা ছিল না। পরদিন ডাক যোগে প্রথম যে জিনিষটা হাতে আসলো সেটা ছিল তাঁর বরখাস্তের হুকুম বাতিলকরণ এবং পুনঃবহালের নির্দেশ। এ ঘটনা থেকে কারারক্ষক ও কারাগারের অন্যান্য কর্মচারীগণ হযরতের ভক্ত হয়ে গেলেন। নয়ী দুনিয়ার আজীম মদনী সংখ্যা ২০৮ পৃঃ

এখানেও এক গুলিতে দু'শিকার। আগের খবরও দিয়ে দিলেন এবং ভবিষ্যতের অবস্থাও বলে দিলেন।

এটা চিন্তা করলে চোখ থেকে পানি টপকে পড়ে যে, যে কামালিয়াতকে নিজেদের শেখের বেলায় কাফিরদের আকৃষ্ট হওয়ার মাধ্যম স্বীকার করা হয়েছে, সেই কামালিয়াতকে যখন মুসলমানগণ আপন নবীর বেলায় স্বীকার করেন, তখন এরা ওদেরকে মুশরিক মনে করতে থাকে।

শেখে দেওবন্দ মওলভী হুসাইন আহমদ সাহেবের অবস্থা ও ঘটনালী সম্বলিত চতুর্থ অধ্যায় এখানে শেষ হলো।

এখন আপনাদের এটা ফয়সালা করতে হবে যে, প্রথম পর্বে (নাটকের প্রথম দৃশ্যে) যেসব আকীদা সমূহ এরা নবী ও ওলীগণের বেলায় শিরক সাব্যস্ত করেছিল, সেগুলো নিজেদের বুযুর্গগণের বেলায় কীভাবে ইসলাম সম্মত হয়ে গেল?

প্রথম পর্বে নিজেদের যেসব আকীদাসমূহ প্রকাশ করা হয়েছে, সেগুলো হয়তো বাতিল অথবা দ্বিতীয় পর্বে যে ঘটনাবলী উদ্ধৃত করা হয়েছে, সেগুলো ভুল। এ দু'টির যেটাই গ্রহণ করা হোক না কেন, মাযহাবী সাধুতা, দ্বীনি বিশ্বাস ও জ্ঞান গরিমার বিসর্জন অপরিহার্য।

পঞ্চম অধ্যায়

হযরত মাওলানা হাজী ইমদাদুল্লাহ সাহেব প্রসঙ্গে

এ অধ্যায়ে হযরত শাহ হাজী ইমদাদুল্লাহ সাহেব সম্পর্কে মওলভী মুহাম্মদ কাসেম নানুতুবী সাহেব, মওলভী আশরাফ আলী থানবী সাহেব, মওলভী রশীদ আহমদ গাঙুহী সাহেব ও অন্যান্যদের রেওয়ায়েত থেকে ওসব ঘটনাবলী ও অবস্থাবলী একত্রিত করা হয়েছে, যেগুলো আকীদায়ে তাওহীদের সাথে সংঘাত মূলক, মাযহাবের বিপরীত ও নিজেদের মূখের বলা শিরককেও আপন বুযুর্গদের বেলায় ইসলাম ও ঈমান সাব্যস্ত করার প্রমাণ সমূহ ইনসাফের দৃষ্টিতে দেখুন এবং বিবেকের রায় শুনার জন্য কান খাঁড়া রাখুন।

ঘটনা প্রবাহ

(১) খবর পৌঁছানোর এক নতুন মাধ্যম

হযরত শাহ ইমদাদুল্লাহ সাহেব সম্পর্কে নিম্নের প্রায় ঘটনা 'কারামাতে ইমদাদিয়া' নামক কিতাব থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রায় ঘটনা মওলভী কাসেম নানুতুবী সাহেব, মওলভী রশীদ আহমদ গাঙুহী সাহেব ও মওলভী আশরাফ আলী থানবী সাহেব প্রমূখ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। উক্ত কিতাবটি কুতুবখানায়ে হাদী, দেওবন্দ থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

এ কিতাবে হযরত শাহ সাহেবের মুরীদ মাওলানা মুহাম্মদ হাসান সাহেব একটি ঘটনা বর্ণনা করেনঃ

> একদিন যোহরের পর আমি, মওলভী মনোয়ার আলী ও মোল্লা মুহিব্বুদ্দীন সাহেব কোন এক জরুরী কথা আরয করার জন্য হযরতের খেদমতে হাজির হলাম। হযরত নিয়ম মাফিক উপরে চলে গিয়ে ছিলেন। খবর দেয়ার মত কোন লোকও ছিল না। ডাক দেয়াটাও আদবের খেলাফ। তাই আমরা পরস্পর পরামর্শ করলাম যে হযরতের কলবের প্রতি মনোনিবেশ করে বসে গেলে কথার জবাব পাওয়া যাবে বা হযরত স্বয়ং তশরীফ আনবেন।
>
> কিছুক্ষণ অতিবাহিত হতে, না হতে হযরত উপর থেকে নীচে তশরীফ আনলেন। আমরা ক্ষমা চাইলাম যে ওই সময় হযরত সম্ভবতঃ শুইয়ে ছিলেন, অনর্থক কষ্ট দিলাম। হযরত বললেন কী করে শুইবো, তোমরাতো আমাকে শুইতে দিলে না। (কারামাতে ইমদাদিয়া ১৩ পৃঃ)

দেখলেন তো? এদের কাছে মুরাকাবা খবর পৌঁছানোর কীযে সহজ মাধ্যম। যখন ইচ্ছে এবং যেখানে ইচ্ছে, মাথা ঝুঁকালো, আলোচনা করে নিল বা অবস্থা জেনে নিল। এ দিক থেকে কোন কষ্ট করা হলো না, ওদিক থেকেও কোন প্রশ্ন করা হলো না। কিন্তু মনের লুকায়িত উদ্দেশ্য সম্পর্কে কীভাবে অবহিত হয়ে গেলেন। ওয়ারলেসের মত একদিকে সিগনেল দিল, অন্য দিকে পেয়ে গেল।

কিন্তু কত যে লজ্জাষ্কর পক্ষপাতিত্ব যে, নিজেদের এবং নিজেদের শেখের প্রশ্নে শিরকের সমস্ত নিয়ম কানুন লংঘিত হলো এবং যে বিষয়গুলো নবী ও

ওলীর বেলায় কুফর ছিল সেটা নিজেদের শেখের বেলায় কীভাবে ইসলাম হয়ে গেল?

(২) একটি মাযহাব ধ্বংসাত্মক ঘটনা

মওলভী মোজাফ্ফর হুসাইন কান্দলভী সাহেব দেওবন্দী মাযহাবের গণ্য মান্য বুযুর্গদের অন্তর্ভূক্ত। থানবী সাহেব ওনার থেকে রেওয়ায়েত পূর্বক স্বীয় পীর ও মুরশিদ হযরত শাহ সাহেবের এক অদ্ভুত ঘটনা উদ্ধৃত করেন।

> হযরত মাওলানা মোজাফফর হুসাইন সাহেব মরহুম মক্কা মুয়াজ্জামায় অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং তার ইচ্ছে ছিল যেন মৃত্যুটা মদীনা মনোয়ারায় হয়। হাজী সাহেব থেকে জানতে চাইলেন, আমার মৃত্যুটা মদীনা মনোয়ারায় হবে কিনা? হাজী সাহেব বললেন, আমি কি জানি? আরয করলেন, হুযূর, এ অজুহাত বাদ দিন, মেহেরবানী করে জবাব দিন। হাজী সাহেব মুরাকাবায় বসে বললেন, আপনি মদীনা মনোয়ারায় মারা যাবেন। (কাসাসুল আকাবের ১৩৬ পৃঃ) মওলভী আশরফ আলী থানবী প্রণীত)

বলুন, এটা চক্ষু থেকে রক্ত ঝরার মত কথা নয় কি? অর্ধ শতাব্দি থেকে এসব লোক গলাবাজি করে আসতেছে যে আল্লাহ তাআলা ব্যতীত কারো জানা নেই যে কে কোথায় মারা যাবে। এমন কি পয়গম্বরে আযম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর অদৃশ্য জ্ঞানের অস্বীকারে (এবং কোন ব্যক্তি জানেনা যে কোন্ জায়গায় মারা যাবে) আয়াতটি ওদের মুখে ও কলমে সদা লেগেই আছে। অথচ সেই আয়াত এখনও কুরআন করীমে মওজুদ আছে, কিন্তু নিজেদের শেখের বেলায় ওদের কীযে দৃঢ় বিশ্বাস দেখুন। তিনি মুবাকাবায় বসার সাথে সাথে এমন বিষয় জেনে নিল যা কেবল আল্লাহ তাআলার হক এবং স্বীয় মখলুকের কাউকে আল্লাহ তাআলা এ জ্ঞান দান করেননি। যেমন ফতেহ বেরেলী কা দিলকশ নাযযারা নামক কিতাবে দেওবন্দী জমাতের নির্ভরযোগ্য সংগঠক মওলভী মনজুর নোমানী লিখেনঃ

> সেই পঞ্চ অদৃশ্য বিষয়, যার মধ্যে মৃত্যুস্থানের জ্ঞানটাও অন্তর্ভূক্ত। ওসব বিষয় গুলোকে আল্লাহ তাআলা নিজের জন্য নির্দিষ্ট করে নিয়েছেন। ওগুলোর খবর না কোন নিকটতর ফিরিশতাদেরকে দিয়েছেন, না কোন নবী রসূলকে। (৮৫ পৃঃ)

মুরাকাবা ও রূহানী মনোনিবেশের এ ক্ষমতা যেটার বলে অদৃশ্যের একটি গোপনীয় ভেদ জেনে নিলেন, সেই ক্ষমতা রসূলে আরবী (সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর বেলায় এরা স্বীকার করে না। যেমন, এ থানবী সাহেব, যিনি স্বয়ং স্বীয় পীর ও মুর্শিদের বেলায় এ মহান ক্ষমতা স্বীকার করলেন, তার কিতাব হিফজুল ঈমানে হুযূর (সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর গায়বী উপলব্ধি ক্ষমতা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে লিখেনঃ

"অনেক বিষয়ে তাঁর বিশেষ মনোনিবেশ প্রদান বরং চিন্তা ও পেরেশানীতে পতিত হওয়ার কথা প্রমাণিত আছে। ইফকের কাহিনীতে তাঁর চেষ্টা তদবির, চিন্তা ভাবনার কথা সিহা সিত্তায় বর্ণিত আছে। কিন্তু কেবল মনোনিবেশের দ্বারা উদ্‌ঘাটিত হয়নি। একমাস পর ওহীর মাধ্যমে সান্ত্বনা লাভ করেন। (৭ পৃঃ)

থানবী সাহেবের এ বর্ণনা যদি শুদ্ধ হয়, তাহলে বাহ্যিক ভাবে দু'টি বিষয় বুঝে আসে–হয়তো হুযূরে আনোয়ার (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর অদৃশ্য উপলব্ধি ক্ষমতা মাযাল্লা এত দুর্বল ছিল যে, গোপন বিষয়ের গভীরে পৌছতে অক্ষম ছিলেন। অথবা মাযাল্লা আল্লাহ তাআলার দরবারে তাঁর নৈকট্য লাভের সেই মর্যাদা ছিল না যে মনোনিবেশ করার সাথে সাথে জানা হয়ে যেত এবং একমাস ব্যাপী চিন্তাভাবনায় লিপ্ত থাকার প্রয়োজন হতো না। আর এ ধরণের ঘটনার সম্মুখীন শুধু একবার হননি, যেটাকে ব্যতিক্রম হিসেবে ধরা যেত। কিন্তু থানবী সাহেবের কথা মুতাবিক অনেক বিষয়ে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)–কে এ রকম অবস্থার সম্মূখীন হতে হয়েছে।

এবার আপনারাই বিচার করুন। রসূলের বেলায় মনের বিমাতাসূলভ আচরণ এবং কলমের অকৃতজ্ঞতার এর চেয়ে আরও বড় কোন প্রমাণের প্রয়োজন আছে কি? নিজের শেখের জ্ঞানের ব্যাপকতা ও রসূলের জ্ঞানের সংকীর্ণতা উভয় বক্তব্যের লিখক একই ব্যক্তি। এ ঘটনার সবচে মজার বিষয় হচ্ছে, যখন শাহ সাহেব কুরআনের আয়াতের আলোকে নিজের অজ্ঞতা প্রকাশ করলেন, তখন এতে তিনি নিশ্চুপ হয়ে যাননি বরং 'এ অজুহাত রাখুন, বলে ওনার অদৃশ্য জ্ঞান সম্পর্কে নিজের মনের ধারণাকে একেবারে প্রকাশ করে দিলেন।

এখন এটার ফয়সালা আপনারাই করুন যে প্রায় একই রকম বিষয়ে ওদের চিন্তাধারায় আপন–পরের এ পার্থক্য কেন?

(৩) সারা বিশ্বের জ্ঞান পুঞ্জিভূত করার এক অদ্ভুত ঘটনা

এবার একটি খুবই মজাদার এবং বিস্ময়কর কাহিনী শুনুন। শাহ সাহেবের খাস মুরীদগণের মধ্যে মওলভী মুহাম্মদ ইসমাঈল নামে এক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি কারামাতে ইমদাদিয়ায় স্বীয় ভাই এর মুখে শুনা একটি আশ্চর্যকর ঘটনা উদ্ধৃত করেনঃ

আমি আমার সম্মানিত বড় ভাই হাজী আবদুল হামিদ সাহেব থেকে শুনেছি যে একবার "মওলভী মুহিউদ্দীন সাহেব বলেছেন, হাজী সাহেব দীর্ঘ দিন ধরে শারীরিক দূর্বলতার কারণে হজ্ব করা থেকে অপারগ ছিলেন। আমি আমার এক বন্ধুকে বললাম, আজ ঠিক আরাফাতের দিন (হজ্বের দিন) দেখতে হবে হযরত কোথায় আছেন? তারা মুরাকাবায় বসে দেখলেন যে, হযরত আরাফাত পর্বতের পাদদেশে বসে আছেন। আমরা পরে আরয করলাম, আপনি আরাফাতের দিন কোথায় ছিলেন? হযরত বললেন, কোন জায়গায় নয়, ঘরেই ছিলাম। আমরা আরয করলাম, হযরত! আপনিতো অমুক জায়গায় তশরীফ রেখেছিলেন। হযরত বললেন, ইয়া আল্লাহ! লোকেরা কোথাও লুকিয়ে থাকতে দেয় না।" (কারামাতে ইমদাদিয়া ২০ পৃঃ)

এটাতো কিছুতেই বলা যায় না যে, শাহ সাহেব ভুলবশতঃ বলে দিলেন যে তিনি ঘরে ছিলেন। শাহ সাহেবকে ভুল বলার এ অভিযোগ থেকে বাঁচানোর জন্য এটা মানতেই হবে যে ওই দিন শাহ সাহেব ঘরেও ছিলেন এবং আরাফাত পর্বতের পাদদেশেও ছিলেন।

কিন্তু নিজেদের শেখের বেলায় মনের আত্মহারার এ ধারণা স্মরণ রাখার মত যে একই ব্যক্তিকে বিভিন্ন জায়গায় মওজুদ মনে করাটা ওদের কাছে অসম্ভব মনে হলো না। এবং শরীয়তের বিপরীত বলেও অনুভব হলো না। আর অশেষ প্রশংসার দাবীদার ওসব অনুসন্ধানকারীগণ. যারা ঘরে বসে সারা পৃথিবী তালাশ করে শেষ পর্যন্ত আরাফাত পর্বতের পাদদেশে স্বীয় শেখকে পেয়েছেন। একেই বলে জ্ঞান ও উপলব্ধির অদৃশ্য ক্ষমতা, যা খানকায়ে ইমদাদিয়ার দরবেশদের রয়েছে। কিন্তু দেওবন্দী মাযহাব মতে সায়্যিদুল আম্বিয়ার এ জ্ঞান নেই। আর শাহ সাহেবের এ উত্তর 'ইয়া আল্লাহ লোকেরা কোথাও লুকায়ে থাকতে দেয় না' মুরীদ ও অনুসারীদের অদৃশ্য জ্ঞান প্রমানের জন্য ইলহামী বাণী থেকে কম নয়।

ঈমানের ওজনী সাক্ষ্যসমূহকে সাক্ষী করে বলুন, হক বাতিল পথের পার্থক্য বুঝার জন্য এর থেকে কি আরও অধিক নিদর্শনের প্রয়োজন আছে?

(৪) আকীদায়ে তাওহীদের সাথে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ

যদি বিরক্তিবোধ না লাগে, তাহলে ওদের আকীদায়ে তাওহীদের সাথে এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের কাহিনী শুনুন। সেই কারামাতে ইমদাদিয়ায় বর্ণিত হয়েছে যে শাহ সাহেবের এক মুরীদ কোন এক সামুদ্রিক জাহাজ যোগে সফর করার সময় ভয়ানক তূফানের সম্মূখীন হয়েছিল। ঢেউ এর ধাক্কায় জাহাজের তলা ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছিল। এর পরের ঘটনা স্বয়ং বর্ণনাকারীর মূখেই শুনুনঃ

ওনারা দেখলেন যে, এখন মৃত্যু ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। সেই সঙ্কটময় মূহর্তে ভীত হয়ে স্বীয় পীরের কথা স্মরণ করলেন। কারণ এ সময় থেকে অধিক সাহায্যের প্রয়োজন আর কোন্ সময় হতে পারে। আল্লাহ তাআলা সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা এবং সবকর্ম আঞ্জাম দানকারী। সেই সময় জাহাজ ডুবা থেকে রক্ষা পেল এবং সমস্ত লোক বেঁচে গেল।

এদিকে তো এ ঘটনা সংঘটিত হলো, ওদিকে ওলীয়ে জাহান (হাজী সাহেব) পরের দিন স্বীয় খাদেমকে বললেন, আমার কোমরটা একটু টিপে দাও, খুবই ব্যথা অনুভব হচ্ছে। খাদেম টিপতে টিপতে যখন কোমর থেকে লুঙি একটু হটালো, তখন দেখলো যে কোমর ক্ষতবিক্ষত এবং প্রায় জায়গার চামড়া উঠে গেছে। সে জিজ্ঞাসা করলো, হুযূর ব্যাপার কি, কোমর কিভাবে ক্ষতবিক্ষত হলো? বললেন, কিছুই না। পুনরায় জিজ্ঞাসা করলো কিন্তু তিনি নিশ্চুপ রইলেন। তৃতীয়বার আবার জিজ্ঞাসা করলো, হুযূর এটাতো কোথায় আঘাত লেগেছে; কিন্তু আপনিতো কোন জায়গায় তশরীফ নিয়ে যাননি। বললেন, একখানা জাহাজ ডুবে যাচ্ছিল, ওটাতে তোমাদের দ্বীনি সিলসিলার এক ভাই ছিল। ওর কান্নাকাটি আমাকে অস্থির করেছিল এবং জাহাজকে কোমরের সাহায্যে উপরে উঠায়েছি। যখন আগে বাড়লো তখন খোদার বান্দাগণ রক্ষা পেল। এর ফলে হয়তো চামড়ায় ঘষা লেগেছে এবং ব্যথা অনুভব হচ্ছে। কিন্তু এটা কাউকে বল না।" (কারামাতে ইমদাদিয়া ১৮ পৃঃ)

নিজেদের শেখের অদৃশ্য উপলব্ধি ক্ষমতা ও খোদায়ী ইখতিয়ার ও হস্তক্ষেপের এ অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি হাজার হাজার মাইল দূর

থেকে মনের নীরব আকুতি শুনে ফেললেন। শুধু শুনেননি বরং সঙ্গে সঙ্গে এটাও জেনে নিল সমুদ্রের কোন্ জায়গায় বিপদের সম্মুখীন হয়েছিল এবং শুধু জেনে বসে থাকেননি চোখের পলকে ওখানে চলে গেলেন এবং জাহাজকে তুফান থেকে রক্ষা করে পুনরায় ফিরে আসলেন। কিন্তু হায়রে দুর্ভাগ্য! রসূলে কাওনাইন (সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর বেলায় এদের আকীদা হচ্ছেঃ

> অনেক লোকেরা যে আগের বুযুর্গগণকে দূর দুরান্ত থেকে আহবান করে এবং এতটুকু বলে যে ইয়া হযরত! আপনি আল্লাহর কাছে দুআ করুন যেন আমাদের হাজত পূর্ণ করেন। এরপর এটা মনে করে যে আমরা কোন শিরক করিনি, কেননা ওনাদের কাছে হাজত প্রার্থনা করা হয়নি বরং দুআ চাওয়া হয়েছে। এ কথাটি ভুল, কেননা প্রার্থনার দ্বারা যদিওবা শিরক প্রমাণিত হয়নি কিন্তু আহবান করার দ্বারা প্রমাণিত হয়ে যায়। তকবিয়াতুল ঈমান।

কিন্তু এখানে প্রার্থনা ও আহবান দু'শিরক একত্রিত হওয়ার পরও তাওহীদের ব্যাপারে ওদের ইজারাদারী এখনও অটল রয়েছে আর আমরা কেবল এ জন্য মুশরিক হলাম, যে সব বিশ্বাসসমূহ ওরা আপন বুযুর্গগণের বেলায় জায়েয মনে করে ওগুলোকে আমরা রসূলে কাওনাইন, শহীদে কারবালা, গাউছে জীলানী এবং খাজায়ে খাজেগানের বেলায় একান্ত আন্তরিকতার সাথে বিশ্বাস করি। এর নাম যদি শিরক হয়, তাহলে আমরা এ অপবাদকে আন্তরিকতার সাথে স্বাগত জানাই; কেননা সমস্ত উম্মতের এটাই অভিমত। হযরত শাহ ইমদাদল্লাহ সাহেবের অবস্থাদি ও ঘটনাবলী সম্বলিত পঞ্চম অধ্যায় এখানে শেষ হলো।

নাটকের উভয় দৃশ্য (প্রথম পর্ব ও দ্বিতীয় পর্ব) নিরপেক্ষভাবে অবলোকন করার পর এটা নিশ্চয় অনুভব করবেন যে, ওদের কাছে দু'রকম শরীয়ত সমান্তরালে চালু আছে–একটি নবী ও ওলীগণের বেলায় এবং অপরটি নিজেদের বুযুর্গগণের বেলায়।

একই আকীদা যেটা প্রথম শরীয়তে কুফর, শিরক এবং অবাস্তব, সেটা দ্বিতীয় শরীয়তে ইসলাম ও ঈমানসম্মত এবং বাস্তব ব্যাপার। বিবেকের এ হুংকারকে কোন অবস্থাতে দমিয়ে রাখা যাবে না যে, এ দু'মূখী ইসলাম কক্ষণো সেই ইসলাম নয়, যেটা আল্লাহ তাআলার শেষ পয়গম্বরের মাধ্যমে আমরা পর্যন্ত পৌঁছেছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

অন্যান্য ব্যক্তিদের প্রসঙ্গে

এ অধ্যায়ে দেওবন্দী জমাতের অন্যান্য মাশায়েখ ও বুযর্গদের ওসব অবস্থাদি ও ঘটনাবলী ওদের কিতাবাদি থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে, যেগুলোতে আকীদায়ে তাওহীদের সাথে দ্বন্দ্ব, স্বীয় মাযহাবের বিপরীত এবং মূখে বলা শিরককে নিজেদের বেলায় ইসলাম ও ঈমানসম্মত করার এমন নমুনাসমূহ দেখবেন, যেগুলো পড়ে আপনারা হতভম্ব হয়ে যাবেন।

ঘটনা প্রবাহ

দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক মওলভী মুহাম্মদ ইয়াকুব সাহেবের ঘটনা, কাশফ ও অদৃশ্য জ্ঞানের দীর্ঘ কাহিনী

দৈনিক আল জমিয়ত, দিল্লী 'খাজা গরীবে নেওয়াজ সংখ্যা' নামে একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করেছিল, সেই সংখ্যায় দেওবন্দ মাদ্রাসার তৎকালীন মুহতামিম কারী তৈয়ব সাহেবের একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তিনি মওলভী মুহাম্মদ ইয়াকুব সাহেব প্রসঙ্গে লিখেনঃ

> হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব সাহেব (রহমতুল্লাহে তাআলা আলাইহে) দারুল উলুম দেওবন্দের প্রথম প্রধান শিক্ষক ছিলেন। তিনি শুধু আলেমে রব্বানী নয়, বরং আরেফ বিল্লাহ ও কাশফ ও কারামতের অধিকারী পূর্বসূরী মনীষীদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। ওনার অনেক কাশফের কথা পূর্বসূরী মনীষীদের মূখে শুনা গেছে। হযরত মাওলানার মধ্যে মজযুবী বৈশিষ্ট্যও ছিল এবং কোন কোন সময় মজযুবের মত যে কথাগুলো মুখ দিয়ে বের হতো, ওগুলো হুবহু ঘটনার আকারে বাস্তবায়িত হতো। দারুল উলুম দেওবন্দের নাওদরা নামক বৃহৎ পাঠদান কক্ষের মাঝের অংশে মরহুম ইয়াকুব সাহেবের হাদীছ পড়ানোর রুম ছিল। নাওদরার মাঝখানের দরজার সম্মূখস্থ জায়গা সম্পর্কে তিনি বলেছেন, যার জানাযা এ জায়গায় হয়, সে ক্ষমা লাভ করে। (অর্থাৎ ওকে ক্ষমা করে দেয়া হয়) (খাজা গরীবে নওয়াজ সংখ্যা ৫ পৃঃ)

এটাতো পাগলের কথা ছিল। কিন্তু এবার বুদ্ধিমানদের ঈমান ও আস্থার কথা শুনুনঃ

> তখন প্রায় সময় দারুল উলুমের সাথে সম্পর্কিত ও শহরের গণ্যমান্যদের যত জানাযা দেওবন্দ মাদ্রাসায় আসতো, উক্ত জায়গায় নিয়ে রাখার রেওয়াজ ছিল। অধম সেই জায়গাটা সিমেন্ট দ্বারা চিহ্নিত করে দিয়েছি। (৫ পৃঃ)

বুযুর্গানে কিরামের ঈসালে ছওয়াবের জন্য কোন সময় বা যিকির আযকারের জন্য কোন দিন নির্দিষ্ট করা হলে, এরা বিদআত ও হারাম বলে হৈ চৈ শুরু করে দেয়, কিন্তু এখানে এ ব্যাপারে ওনাদের কাছে কেউ জিজ্ঞাসা করে না যে জানাযার নামাযতো দারুল উলুমের এরিয়ার যে কোন স্থানে হতে পারে কিন্তু একটি বিশেষ জায়গা নির্দিষ্ট করণ এবং সেটার প্রতি গুরুত্বারোপ বিদআত নয় কি?

কথা প্রসঙ্গে মাঝখানে অন্য কথা এসে গেল। চলুন পুনরায় আসল বক্তব্যে ফিরে যাই। তিনি বলেনঃ

> এ মজযুবী অবস্থায় মাওলানার মনে এ ধারণাটা বদ্ধমূল হয়েছিল যে আমি অপরিপূর্ণ রয়ে গেলাম। হযরত পীর ও মুরশিদ হাজী ইমদাদুল্লাহ সাহেব (কুঃ সিঃ) তো মক্কায়, ওখানে যাওয়া মুশকিল। তবে আমার পূর্ণতা দান দু'বুযুর্গ হযরত নানুতুবী ও হযরত গাঙুহী করতে পারেন। তাই তিনি ওনাদেরকে বারবার বলতেন, 'ভাই আমাকে পূর্ণতা দান করুন'। তাঁরা জবাবে বলতেন, 'এখনতো আপনার মধ্যে কোন ঘাটতি নেই আর যৎসামান্য থাকলেও সেটা দেওবন্দ মাদ্রাসায় হাদীছ পড়ানোর দ্বারা পূর্ণ হয়ে যাবে। তাই আপনি শিক্ষাদানে নিয়োজিত থাকুন এবং এ শিক্ষাদান আপনার পূর্ণতার জিম্মাদার'। এতে তিনি অসন্তুষ্ট হয়ে বলতেন, এরা উভয়ে কৃপণতা করছেন, সব কিছু নিয়ে বসে আছেন এবং আমার বেলায় কৃপণতা করছেন। (৫ পৃঃ)

এর পর লিখেন যে এদিক থেকে নিরাশ হয়ে যাবার পর তিনি আজমীর শরীফ যাওয়ার মনস্থ করলেন যেন খাজা গরীবে নেওয়াজের কাছ থেকে স্বীয় পূর্ণতা লাভ করেন। সে মতে একদিন তিনি উৎসাহ উদ্দীপনা সহকারে আজমীর শরীফ রওয়ানা দিলেন। ওখানে গিয়ে রাওজার নিকট একটি পাহাড়ে আস্তানা স্থাপন করলেন এবং ওখানে থাকতে লাগলেন। প্রায় সময় মাযার শরীফে গিয়ে

অধিক্ষন মুরাকাবায় থাকতেন। একদিন মুরাকাবায় হযরত খাজার পক্ষ থেকে ইরশাদ হলোঃ

"আপনার পূর্ণতা দেওবন্দ মাদ্রাসায় হাদীছ পড়ানোর দ্বারাই হবে। আপনি ওখানে চলে যান এবং একই সাথে হযরত খাজার এ উক্তিটাও ওনার কাছে কাশফ হলো,'আপনার জীবনের দশ বছর বাকী আছে'। এর মধ্যে এ পূর্ণতা হয়ে যাবে'। (৬পৃঃ)

এ ঘটনার পরদিন তিনি আজমীর শরীফ ত্যাগ করলেন এবং সোজা নিজের জন্মস্থান নানুতা পৌঁছলেন। ওখান থেকে পুনরায় গাঙুহ যাত্রা দিলেন। হযরত গাঙুহী নিয়মমাফিক স্বীয় খানকাতে তশরীফ রেখেছিলেন। কোন একজন খবর দিল যে মাওলানা ইয়াকুব সাহেব আসতেছে। হযরত গাঙুহী নাম শুনামাত্র খাট থেকে দাঁড়িয়ে গেলেন। এর পরের ঘটনা স্বয়ং কারী সাহেবের মূখে শুনুনঃ

'যখন মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব সাহেব কাছে আসলেন, তখন কোন কথাবার্তা ছাড়াই সালামের পর হযরত গাঙুহী বললেন, "আমাদের প্রতি কোন সহানুভূতি নেই। আমাদের প্রতি কোন সহানুভূতি নেই। খাদেমরাওতো ওই কথা বলছিলেন, যা খাজা বলেছেন। কিন্তু নগণ্যদের কথা কে শুনে? যখন উর্ধ্বতন থেকেও সেই কথা বলা হলো, যা নগণ্য খাদেমরা বলেছিলেন, তখন আপনি মেনে নিলেন।" (খাজা গরীবে নওয়াজ সংখ্যা ৬ পৃঃ)

মাযহাবী চিন্তাধারার বিপরীত হওয়া সত্বেও এ ঘটনাটা কেবল এ জন্য স্বীকৃতি পেল যে এতে দেওবন্দ মাদ্রাসার ফযীলত প্রকাশ পায়। অন্যথায় খাজা গরীবে নেওয়াজের রূহানী ক্ষমতা ও অদৃশ্য হস্তক্ষেপ সম্পর্কিত যা কিছু বর্ণিত আছে, এরা শুধু সেগুলো অস্বীকারকারী নয় বরং এর বিরুদ্ধে জিহাদ করা স্বীয় দ্বীনের প্রথম কর্তব্য মনে করে। যেমন ইতোপূর্বে উল্লেখিত এ রকম অনেক উদ্ধৃতি আপনাদের দৃষ্টিগোচর হয়েছে।

যাহোক যে কোন জযবার প্রভাবে এ ঘটনা যখন কাগজের পাতায় স্থান পেয়েছে, আমরা কারী সাহেবের কাছে কয়েকটি প্রশ্ন রেখে মনের তৃপ্তিবোধ করতে চাই।

প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে, খাজা গরীবে নওয়াজ (রহমতুল্লাহে তাআলা আলাইহে) এর যদি অদৃশ্য জ্ঞান না থাকতো, তাহলে ওনার কীভাবে জানা হয়েছিল যে

দেওবন্দে একটি মাদ্রাসা আছে, যেখানে হাদীছের শিক্ষা দেয়া হয় এবং মওলভী মুহাম্মদ ইয়াকুব ওখান থেকে হাদীছের শিক্ষাদান ত্যাগ করে আমার এখানে এসেছে।

দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, ওনার এ খবর কীভাবে হলো যে আগত ব্যক্তি সলুকের স্তরের পূর্ণতার জন্য এসেছে এবং ওর পূর্ণতা এখানে হবে না, দেওবন্দ মাদ্রাসায় হবে।

তৃতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, এটাতো একান্ত আশ্চর্যের বিষয়, ওনার এটাও কীভাবে জানা হয়ে গেল যে ওর জিন্দেগীর দশ বছর বাকী আছে এবং এ সময়ের মধ্যে পূর্ণতা অর্জিত হবে।

চতুর্থ প্রশ্ন হচ্ছে, এটাতো সবচে বিস্ময়কর ব্যাপার যে মুরাকাবায় খাজা গরীবে নওয়াজ মওলভী ইয়াকুব সাহেবকে যে কথা বলছিলেন, কোন অবহিতকরণ ছাড়া সে কথা মওলভী রশীদ আহমদ গাঙুহী সাহেবের কীভাবে জানা হয়ে গেল?

কিন্তু সবচে দুঃখজনক ব্যাপার হচ্ছে, এত রকম শিরকের সাথে সম্পৃক্ত হওয়া সত্বেও এরা এখনও তাওহীদের পূর্ণ ইজারাদার। আর আমাদের জন্য মুশরিক, কবরপূজারী ও বিদআতীর লকবগুলো নির্ধারিত করে রেখেছে। কিন্তু আস্তিনসমূহ থেকে রক্ত ঝরার পর হত্যাকান্ড লুকানো বড় মুশকিল।

হযরত শাহ ওলী উল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলবীর কাহিনী

মায়ের পেট থেকে অদৃশ্য উপলব্ধি

মওলভী হাফেজ রহীম বখশ দেহলভী সাহেব 'হায়াতে ওলী' নামে হযরত শাহ সাহেব কেবলার একটি জীবনী গ্রন্থ লিখেছেন। ওখানে তাঁর জন্মের আগের এক অদ্ভুত ঘটনা উদ্ধৃত করেছেন। তিনি লিখেনঃ

মাওলানা শাহ ওলী উল্লাহ সাহেব তখন তাঁর সম্মানিতা মায়ের পেটে ছিলেন। একবার তাঁর মান্যবর পিতা জনাব শেখ আবদুর রহীমের কাছে এক ভিখারিনী আসলো। তিনি একটি রুটিকে দু'টুকরা করে এক টুকরা ওকে দিল এবং এক টুকরা রেখে দিলেন। কিন্তু ভিখারিনী যেমাত্র গেইট পর্যন্ত গেল, শাহ সাহেব পুনরায় ডাকলেন এবং অবশিষ্ট টুকরাটাও দিয়ে দিলেন। এরপর যখন চলে

যেতে লাগলো, তখন পুনরায় ডাক দিলেন এবং যে পরিমাণ রুটি ঘরে মওজুদ ছিল, সব দিয়ে দিলেন। অতঃপর পরিবারের লোকদেরকে সম্বোধন করে বললেন, পেটের শিশু বার বার বলছিল যে যত রুটি ঘরে আছে,সব এ অভাবী মিসকীনকে আল্লাহর পথে দিয়া দাও। হায়াতে ওলী ৩৯৭ পৃঃ

যেন শাহ সাহেব মায়ের পেট থেকেই দেখছিলেন যে রুটির এক টুকরা বাঁচিয়ে ঘরে রেখে দেয়া হয়েছে এবং যখন তাঁর বলার পর অবশিষ্ট টুকরাটিও ওনার পিতা দিয়া দিলেন, তখন সেটাও তিনি দেখে নিলেন এবং সাথে সাথে এটাও জেনে নিলেন যে ঘরে আরও রুটি রয়েছে। যখন ওনার বলায় সব দিয়ে দিলেন, তখন তিনি নিশ্চুপ হলেন।

রসূলে আরবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর জ্ঞান ও উপলব্ধির ব্যাপারে অগণিত প্রশ্ন উথাপন করা হয়। কিন্তু এখানে কেউ জিজ্ঞাসা করলো না যে, একটি অজন্ম শিশুর কপালে সেটা কোন্ ধরণের চোখ ছিল যে গর্ভের অন্তরাল থেকে দেয়াল ও ঘরের অবরোধ ভেদ করে বরতনে উঁকি দিয়ে সম্পূর্ণ লুকায়িত জিনিষগুলো দেখে নিলেন?

(৩) হযরত শাহ আবদুর রহীম সাহেবের কাহিনী। পৃথিবীর বিস্তীর্ণ এলাকা দৃষ্টির আওতায়

হায়াতে ওলীর লিখক স্বয়ং শাহ সাহেবের মূখে বর্ণিত ওনার বুযুর্গ পিতার অদৃশ্য উপলব্ধির এক বিরল কাহিনী উদ্ধৃত করেছেন। তিনি লিখেনঃ

একবার মুহাম্মদ কুলী আওরঙ্গজেবের বাহিনীর সাথে কোন একদিকে যুদ্ধ যাত্রা করেছিল। যেহেতু দীর্ঘ দিন ধরে ওর আত্মীয় স্বজন কোন খবর পাননি, সেহেতু ওর এ যোগাযোগহীনতা বিশেষ করে ওর ভাই মুহাম্মদ সুলতানকে খুবই অস্থির করে দিল এবং যখন একেবারে অস্থির হয়ে গেলেন, তখন শেখ সাহেবের খেদমতে হাজির হয়ে অনুরোধ করলেন যেন তাঁর হারানো ভাই এর খবরদেন।

শেখ সাহেব ফরমান, আমি ধ্যান করেদেখলাম এবং সেই বাহিনীর প্রত্যেক তাবুতে অনুসন্ধান করলাম কিন্তু কোথাও ওর পাত্তা পাওয়া গেল না। লাশের স্তুপেও তালাশ করেছি, ওখানেও কোন হদিস পেলাম না। অতঃপর সৈন্য বাহিনীর এদিক সেদিক খুবই মনোযোগ সহাকারে দৃষ্টিপাত করার পর দেখলাম

যে সে গোসল করে লালচে রং এর পোষাক পরে একটি চেয়ারে বসে আছে এবং দেশে ফিরে আসার প্রস্তুতি নিচ্ছে। তাই আমি ওর ভাইকে বললাম, মুহাম্মদ কুলি জীবিত আছে এবং দু'তিন মাসের মধ্যে ফিরে আসার ইচ্ছা আছে। যখন সে ফিরে আসলো, তখন অবিকল সেই কাহিনীই বর্ণনা করলো। হায়াতে ওলী ২৭২ পৃঃ

এখন আপনারাই ঈমান ও ইনসাফের সাথে ফয়সালা করুন যে এ ঘটনা শুনার পর, যে কোন দৃষ্টিকোণ থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে পৃথিবীর বিস্তৃত এলাকায় এ অনুসন্ধান, সৈন্যবাহিনীতে পৌছে প্রতিটি তাবুতে তল্লাসী, এরপর মৃত্যু স্তুপে ও যুদ্ধক্ষেত্রের আশেপাশে খুঁজে দেখা ইত্যাদি কাজ তিনি ওখানে গিয়ে করেননি বরং দিল্লীতে বসেই অদৃশ্য উপলব্ধি ক্ষমতার সাহায্যে এ কাজ আঞ্জাম দিয়েছিলেন। কিন্তু মাথা থাপরাতে ইচ্ছে হয় যে, অদৃশ্য উপলব্ধি ক্ষমতা ও রূহানী হস্তক্ষেপের যে যোগ্যতা এরা একজন মামুলী উম্মতের জন্য বিনা বাক্যে গ্রহণ করে নেয়, সেটা রসূলে আরবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর বেলায় শিরক বলতে ওরা মোটেই দ্বিধাবোধ করে না।

হযরত শাহ আবদুল কাদের দেহলভী সাহেবের কাহিনী

কাশফ ও অদৃশ্য জ্ঞানের আর এক অদ্ভুত কাহিনী

দেওবন্দী জমাতের নির্ভরযোগ্য প্রচারক শাহ আমীর খান অদৃশ্য জ্ঞান সম্পর্কে স্বীয় কিতাব আরওয়াহে ছালাছায় এ অদ্ভুত ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেনঃ

যদি ঈদের চাঁদ ত্রিশ দিনের হতো, তখন শাহ আবদুল কাদের সাহেব প্রথম দিন তারাবীহ নামাযে এক পারা পড়তেন এবং যদি চাঁদ উনত্রিশ দিনের হতো, তাহলে প্রথম দিন তিনি দু'পারা পড়তেন।

যেহেতু এটা পরীক্ষিত হয়োছল, সেহেতু শাহ আবদুল আর্যিয সাহেব প্রথম দিন লোক পাঠাতেন যেন আবদুল কাদের আজ কয় পারা পড়ে, তা দেখে আসে। যদি প্রেরিত লোক এসে বলতো যে আজ দু'পারা পড়েছেন, তখন শাহ সাহেব বলতেন যে ঈদের চাঁদ উনত্রিশ দিনের হবে। অবশ্য মেঘ ইত্যাদির কারণে চাঁদ দেখা না গেলে এবং চাঁদ দেখার হুকুম জারী করার মত কোন প্রমান পাওয়া না গেলে, তা ভিন্ন কথা। এর সাথে মওলভী মাহমুদুল হাসান সাহেব এটা পরিবর্ধন করেছেন যে একথাটি দিল্লীতে এত প্রসিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল যে ব্যবসায়ী ও পেশাদারদের ব্যবসা বাণিজ্য ও কাজ কর্মে সেটাকে ভিত্তি করা হতো। আরওয়াহে ছালাছা (৪৯ পৃঃ)

কাহিনীর ভাষ্য থেকে প্রকাশ পায় যে, এ অবস্থা নির্দিষ্ট কোন এক রমাযানের জন্য ছিল না বরং নিয়মিত ভাবে প্রতি রমাযানে তিনি এক মাস আগেই জেনে নিতেন যে চাঁদ উনত্রিশ দিনের হবে, নাকি ত্রিশ দিনের।

আর মওলভী মাহমুদ হাসান সাহেব দেওবন্দীর এটা বলা "ব্যবসায়ী ও পেশাদারদের কাজ কর্মে সেটার উপর ভিত্তি করা হতো' সে বিষয়টাকে একেবারে সুস্পষ্ট করে দেয় যে ওনার কাশফ কক্ষনো ভুল হতো না। এবার আপনারাই বিচার করুন। এটা চোখ থেকে রক্ত ঝরার মত বিষয় নয় কি? ঘরের বুযুর্গদের জন্য এ অবস্থা বর্ণনা করা হলো যে, প্রতি বছর তিনি নিয়মিত ভাবে এক মাস আগে গোপন বিষয় জেনে নিতেন। কিন্তু রসুলে আনোয়ার (সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহে ওয়াআলিহি ওয়াসাল্লাম) সম্পর্কে ওদের আকীদাসমূহ ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, একমাস দীর্ঘ সময়েও মাসাল্লা তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) গোপন বিষয় জেনে নিতে পারেন নি।

(৫) গায়বী উপলব্ধি ক্ষমতার আর একটি বিস্ময়কর কাহিনী

এ খান সাহেব আরওয়াহে ছালাছায় শাহ আবদুল কাদের সাহেব সম্পর্কে আর একটি ঘটনা উদ্ধৃত করেছেন। তিনি বর্ণনা করেনঃ

আকবরী মসজিদ যেখানে শাহ আবদুল কাদের সাহেব থাকতেন, এর উভয় পার্শ্বে বাজার ছিল এবং মসজিদের উভয় পার্শ্বে হুজরা ও বারান্দা ছিল। এর মধ্যে একটিতে তিনি থাকতেন। প্রতিদিন তাঁর হুজরার বাইরে বারান্দায় পাথরে হেলান দিয়ে বসতেন। বাজারে আনাগোনাকারীগণ তাঁকে সালাম করতেন। যদি সুন্নী লোক সালাম করতো, ডান হাতে জবাব দিতেন এবং শিয়ালোক সালাম করলে বাম হাতে জবাব দিতেন। এটা বর্ণনা করার পর মাওলানা আদুল কাইয়ুম সাহেব বলেন, আমি কি এর রহস্য বলবো? اَلْمُؤْمِنُ يَنْظُرُ بِنُوْرِ اللّٰهِ (অর্থাৎ মুমিন আল্লাহর নূর দ্বারা দেখেন।) (আরওয়াহে ছালাছা-৫৫ পৃঃ)

এ বাক্য দ্বারা এটাই বুঝায়েছেন যে, শিয়া সুন্নীর বেলায় এ পার্থক্য কোন বাহ্যিক আলামতের ভিত্তিতে ছিল না বরং সেই অদৃশ্য উপলব্ধি ক্ষমতার বলেই ছিল, যার ব্যাখ্যা মওলভী আবদুল কাইয়ুম সাহেব নূরে ইলাহী দ্বারা করেছেন।

এ ঘটনার ভাষ্য থেকে প্রকাশ পায় যে, এটা ওনার প্রতিদিনের নিয়ম ছিল যে, বারান্দায় বসতেন, তখন কাশফের এ সিলসিলা নিয়মিত জারী থাকতো।

এখন চিন্তার বিষয় হলো শাহ আবদুল কাদের সাহেবের বেলায় কাশফের একটি স্থায়ী ও সার্বক্ষণিক ক্ষমতা স্বীকার করে নেয়া হয়েছে, যেটা দৃষ্টি শক্তির মত সব সময় বিদ্যমান থাকতো। কিন্তু একান্ত লজ্জার বিষয় যে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর বেলায় কাশফের এ স্থায়ী ও সার্বক্ষণিক ক্ষমতা স্বীকার করতে গেলে ওদের তওহীদের আকীদায় আঘাত আসে এবং শিরকের ভয় লাগে।

(৬) শুধু কাশফ আর কাশফ

এ শাহ আবদুল কাদের সাহেবের অদৃশ্য জ্ঞান সম্পর্কে থানবী সাহেবের কিতাব 'আশরাফুত্তানবীহ' এর উদ্ধৃতি দিয়ে এ ঘটনাটি বর্ণনা করা হয়েছেঃ

> মওলভী ফজল হক সাহেব শাহ আবদুল কাদের সাহেব (রহমতুল্লাহে আলাইহে) এর কাছে হাদীছ পড়তেন। শাহ সাহেব বড় সাহেবে কাশফ ছিলেন এবং সেই পরিবারে তাঁর কাশফ সবচে ব্যাপক ছিল। যে দিন মওলভী ফজল হক সাহেব কোন চাকরের দ্বারা কিতাব বহন করায়ে নিয়ে যেতেন এবং ওনার কাছে যাবার আগে নিজে নিয়ে নিতেন, তা শাহ সাহেবের কাছে কাশফ দ্বারা জানা হয়ে যেত। ওই দিন মওলভী সাহেবকে সবক পড়াতেন না এবং যে দিন নিজে বহন করে নিয়ে যেতেন, সেদিন সবক পড়াতেন। সংগ্রাহক বলেনঃ
>
> پیش اہل دل نگہدارید دل تا نباشد از گمان بد خجل
>
> অর্থাৎ বুযুর্গদের সামনে সতর্ক থাকুন যেন কোন খারাপ ধারণা পোষণ করে লজ্জিত হতে না হয়। আরওয়াহে ছালাছা-৫৭ পৃঃ

এখন একই সাথে সেই পরিবারের শাহ ইসমাঈল দেহলভীর এ ইবারতটুকুও পড়ে নিন। তখন তাদের আকীদা ও আমলের দ্বন্দ্ব সুস্পষ্ট ভাবে বুঝাযাবে।

> এরা সব, যারা অদৃশ্য জ্ঞানের দাবী করে, কেউ কাশফের দাবী রাখে, কেউ ইস্তেখারার আমল শিখায় ------এরা সব মিথ্যুক এবং ধোঁকাবাজ। তকবিয়াতুল ঈমান ২৩ পৃঃ।

উলামায়ে দেওবন্দের কাছে শাহ আবদুল কাদের সাহেবও বিশ্বস্ত এবং শাহ ইসমাঈল দেহলভীও। এখন এ ব্যাপারে রায় দান তাদের জিম্মা যে এ দুজনের মধ্যে কে মিথ্যুক ও কে সত্যবাদী?

আমি এখানে শুধু এতটুকু বলতে চাই যে ব্যাপারটা একদিনের ছিল না বরং প্রতিদিন ওনার কাছে কাশফ হতো এবং দেয়ালের আবরণ ভেদ করে তিনি দেখে নিতেন যে, কিতাব কে বহন করে আনতেছে এবং কে কার থেকে কখন নিয়ে নিচ্ছে। কিন্তু আমি এখানে এ টুকু কথা বলার অনুমতি চাইবো যে আপন নবীর বেলায় দেওবন্দী আলেমগণের মনের কুটিলতা এটার থেকে সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশ পায় যে নিজের ঘরের বুযুর্গদের দৃষ্টির সামনেতো দেয়াল সমূহের কোন আবরণকে প্রতিবন্ধক বলে স্বীকার করে না। অথচ নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর বেলায় আজ পর্যন্ত সেই কথাই বলে আসছে যে, তাঁর কাছে দেওয়ালের পিছনের জ্ঞানও নেই। যেমন আগের পৃষ্ঠাসমূহে এর প্রমাণ আপনারা দেখেছেন।

(৭) হাফেজ মুহাম্মদ জামিন .. সাহেবের কাহিনী কবরে রসিকতার একটি ঘটনা

মওলভী আশরফ আলী থানবী সাহেব স্বীয় জমাতের এক বুযুর্গ হাফেজ মুহাম্মদ জামিন সাহেবের কবর সম্পর্কে একটি চিত্তাকর্ষক কাহিনী বর্ণনা করেছেন। তিনি লিখেনঃ

"এক সাহেবে কাশফ ব্যক্তি হযরত হাফেজ জামিন (রহমতুল্লাহে আলাইহে) এর মাযারে ফাতিহা পাঠ করতে গেলেন। ফাতিহার পর বলতে লাগলেন, ভাই এ বুযুর্গটা কে? বড় রসিক। যখন আমি ফাতিহা পড়তে ছিলাম, তখন আমাকে বলতে লাগলেন, যান, কোন মৃত ব্যক্তির কাছে গিয়ে ফাতিহা পড়ুন, এখানে জীবিতদের কাছে কেন ফাতিহা পাঠ করতে এসেছেন? (আরওয়াহে ছালাছা ১০৩ পৃঃ)

ঘটনা বর্ণনার এ অসামঞ্জস্যতা লক্ষ্য করুনঃ

অদৃশ্য জগতের পর্দা উম্মোচন করে যার সাথে ইচ্ছে কথা বলা এবং যখন ইচ্ছে হয়, উঁকি দিয়ে ওখানকার অবস্থা জেনে নেয়াটা অন্য কারো জন্য অসম্ভব

হলেও এদের জন্য যেন নিত্য দিনের ব্যাপার আর মৃতদের ইতিহাসে সম্ভবতঃ এটা প্রথম রসিক মৃত ব্যক্তি, যিনি ফাতিহা পাঠ থেকে বারণ করে রহমত ও ছওয়াবের নিস্প্রয়োজনের কথা প্রকাশ করেছেন। ঘটনার এ দৃষ্টিকোণটাও অনুধাবন করার মত যে, নিজেদের মৃত ব্যক্তিদের মরতবা প্রমাণ করার জন্য এরা আকাশ পাতাল পার্থক্যকে মিলায়ে ফেলে কিন্তু সত্যিকার বুযুর্গগণকে দূর্বল ও নিকৃষ্ট প্রমাণ করার জন্য ওদের কলমের খোঁচা ভীষণ বিষাক্ত হয়ে থাকে।

(৮) সায়্যিদ আহমদ বেরলভীর কাহিনী

বাহ্যিক শরীরে হুযুরে আনোয়ারের তশরীফ আনয়ন এবং সায়্যিদ আহমদ বেরলভীকে ঘুম থেকে জাগানো

তাবলীগ জামাতের নেতা মওলভী আবুল হাসান আলী নদভী সাহেব সায়্যিদ আহমদ বেরলভী সম্পর্কে স্বীয় রচিত 'সীরতে সায়্যিদ আহমদ শহীদ' নামক কিতাবে ওনার এক অদ্ভুত ঘটনা উদ্ধৃত করেছেন। তিনি লিখেনঃ

> সাতাশ তারিখের রাতে তিনি মনস্থ করলেন যে সারারাত জেগে থাকবেন এবং ইবাদত বন্দেগী করবেন। কিন্তু ইশার নামাযের পর ঘুমের আধিক্য এত বৃদ্ধি পেল যে তিনি শুইয়ে পড়লেন। শেষ রাতের কাছাকাছি দু'ব্যক্তি তাঁকে হাত ধরে জাগালেন। তিনি দেখলেন যে, তাঁর ডান দিকে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এবং বাম দিকে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাদি আল্লাহু তাআলা আনহু) বসে আছেন এবং তাঁকে বলছেন, আহমদ তাড়াতাড়ি উঠ এবং গোসল কর।
>
> সায়্যিদ সাহেব ওনারা দু'জনকে দেখে দৌঁড়ে মসজিদের হাউজের দিকে গেলেন এবং হাউজের পানি ঠান্ডায় প্রায় বরফে পরিণত হওয়া সত্বেও তিনি এতে গোসল করলেন এবং গোসল থেকে ফারেগ হওয়ার পর খেদমতে হাজির হলেন। হযরত (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) ফরমালেন, বৎস! আজ শবে কদর, আল্লাহর স্মরণে নিয়োজিত হও এবং নামায পড় ও মুনাজাত কর। এরপর উভয় চলে গেলেন। সীরতে সায়্যিদ আহমদ শহীদ ৮৪

উত্তরসূরীদের প্রশংসায় সীমা ছাড়িয়ে গেলেন। মওলভী আবুল হাসান আলী নদভীর মত উচ্চবিলাসী লেখক, যিনি সারা জীবন ঐতিহ্য বিশ্বাসী মুসলমানদের

আকীদা ও ধ্যান ধারণা নিয়ে ঠাট্টা করেছেন, তাকেও স্বীয় মুরুব্বীর ফযীলত ও উচ্চ মর্যাদা প্রমান করার জন্য শিরকী আকীদাসমুহের আশ্রয় নিতে হলো।

ঘটনার সত্যতা যাচাই করার জন্য ওনার কাছে যে কেউ এ প্রশ্নটা করার অধিকার রাখে যে জাগ্রতাবস্থায় হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর আগমনের বিশ্বাস কি সেই অদৃশ্য জ্ঞান, ইখতিয়ার ও হস্তক্ষেপের ক্ষমতা প্রমান করে না, যেটা কোন মখলুকের জন্য স্বীকার করাকে মওলভী ইসমাঈল দেহলভী সাহেব শিরক সাব্যস্ত করেছেন? কিন্তু যদি হুযূরের অদৃশ্য জ্ঞান না থাকতো, তাহলে তাঁর কিভাবে জানা হলো যে সায়্যিদ আহমদ আমার বংশধর এবং সে অমুক জায়গায় ঘুমাচ্ছে। আর যদি হুযূর আনোয়ার (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর মধ্যে হস্তক্ষেপের ক্ষমতা না থাকতো, তাহলে স্বীয় রাওজাপাক থেকে জীবিতদের মত কিভাবে বাইরে তশরীফ আনলেন? এবং অবিকল আকৃতিতে আবির্ভূত হলেন এবং দর্শন লাভকারী কপালের চোখে দেখলো, চিনতে পারলো আর এ ঘটনাটা মূহুর্তের মধ্যে শেষ হয়ে যায়নি, যাকে কল্পনা বলে উড়িয়ে দেয়া যেত বরং সায়্যিদ সাহেব গোসল থেকে ফারেগ হওয়া পর্যন্ত তশরীফ রেখেছিলেন।

এ সমস্ত ইখতিয়ার ও হস্তক্ষেপ খোদা প্রদত্ত স্বীকার করলেও দেওবন্দী মাযহাব মতে সুস্পষ্ট শিরক। কিন্তু এ সমস্ত শিরকের প্রতি শুধু এ জন্য অবজ্ঞা করলো যেন নিজেদের শেখের উচ্চ মর্যাদা প্রমাণিত হয়ে যায়। কল্পনা করে দেখুন, স্বয়ং হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) যাকে হাত ধরে ঘুম থেকে উঠায়েছেন, ওর মর্যাদা কত যে উচ্চতর হবে?

(৯) একটি রহস্যজনক কাহিনী

মওলভী ইসমাঈল দেহলভী সেই সায়্যিদ আহমদ বেরলভীর শান ও মর্যাদা প্রমাণ করার জন্য স্বীয় কিতাব সিরাতুল মুস্তাকীমে একটি একান্ত বিস্ময়কর কাহিনী বর্ণনা করেছেন। কাহিনীটা হচ্ছেঃ

"হযরত গাউছুছ ছাকালাইন ও হযরত খাজা বাহাউদ্দীন নক্‌শবন্দীর রূহদ্বয়ের মধ্যে দীর্ঘ এক মাস ধরে এ কথার উপর ঝগড়া চলছিল যে উভয়ের মধ্যে কে সায়্যিদ আহমদ বেরলভীর রূহানী জ্ঞানদানের দায়িত্ব নিবে। উভয়

বুযুর্গের রূহদ্বয়ের প্রত্যেকের দাবী ছিল যে সে একাকী আমার পরিচর্যায় ইরফান ও সলুকের স্তর অতিক্রম করুক।

শেষ পর্যন্ত দীর্ঘ একমাস পর এ কথার উপর উভয়ের মধ্যে সমঝোতা হলো যে যুক্তভাবে উভয়ে এ খেদমত আঞ্জাম দিবেন। সেমতে একদিন উভয় বুযুর্গের রূহদ্বয় ওনার কাছে গেলেন এবং সর্বশক্তি নিয়োগ করে কিছুক্ষণ ওনার প্রতি ইরফানীদৃষ্টির আলো ফেললেন। ফলে এ অল্প সময়ের মধ্যে তাঁর উভয় সিলসিলার সম্পর্ক অর্জিত হয়ে যায়।" (সিরাতুল মুস্তাকীম ফার্সী –৬৬ পৃঃ)

দেওবন্দী মাযহাবের দৃষ্টিতে এ কাহিনীর সত্যতা স্বীকার করার বেলায় কয়েকটি প্রশ্ন মনে জাগে। প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে, মওলভী ইসমাঈল দেহলভীর ব্যাখ্যা মুতাবিক যখন কারো কাছে খোদা প্রদত্ত অদৃশ্য জ্ঞানের ক্ষমতা নেই, তাহলে হযরত গাউছুছ ছকলাইন ও খাজা বাহাউদ্দীন নক্‌শবন্দীর পবিত্র রূহদ্বয়ের কীভাবে খবর হলো যে, হিন্দুস্থানে সায়্যিদ আহমদ বেরলভী নামে খোদার এক নিকটতর বান্দা আছে, যার রূহানী শিক্ষা দানের জন্য ওখানে যাওয়া আমাদের উচিত। দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, এ ঘটনাটা বাহ্যিক জগতের নয় বরং সম্পূর্ণ অদৃশ্য জগতের। তাই মওলভী ইসমাঈল দেহলভী যিনি স্বয়ং এ ঘটনার বর্ণনাকারী, তাঁর কীভাবে জানা হলো যে, সায়্যিদ আহমদের রূহানী শিক্ষাদানের জন্য ওই দু'বুযুর্গের রূহদ্বয় এক মাসব্যাপী পরস্পর ঝগড়া করছেন এবং শেষ পর্যন্ত এ কথার উপর আপোষ হলো যে, উভয় যুক্ত ভাবে তাঁর দেখাশুনা করবেন। তৃতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, মওলভী ইসমাঈল দেহলভীর তকবিয়াতুল ঈমানের মতে যখন আল্লাহ ব্যতীত সমস্ত নবী ও ওলীগণও অক্ষম ও ক্ষমতাহীন বান্দা, তাহলে মৃত্যুর পর হযরত গাউছুছ ছাকালাইন ও খাজা নক্‌শবন্দের এ মহান হস্তক্ষেপের কথা কীভাবে বুঝে আসতে পারে যে, উভয় বুযুর্গ বাগদাদ থেকে সোজা হিন্দুস্থানের ওই এলাকায় তশরীফ নিয়ে গেলেন, যেখানে সায়্যিদ আহমদ বেরলভী অবস্থান করতেন এবং তার হুজরায় গিয়ে মূহর্তের মধ্যে ওনাকে বাতেনী ইরফানী সম্পর্কে ভরপুর করে দিলেন।

অধিকন্তু ঘটনার ধরন থেকে বুঝা যায় যে, এ কথাগুলো স্বপ্নের নয় বরং জাগ্রতাবস্থার। সুতরাং এ ঘটনার সত্যতা স্বীকার ওই সময় পর্যন্ত সম্ভব নয়, যতক্ষণ তকবিয়াতুল ঈমানের বক্তব্যকে বাতিল বলে ঘোষণা করে আওলিয়া

কিরামের বেলায় অদৃশ্য উপলব্ধি ক্ষমতা ও ইখতিয়ারের আকীদার সত্যতা স্বীকার করে নেয়া না হয়।

দেওবন্দী আলেমদের মাযহাবী ধোঁকাবাজীর এ তামাশা এখন আর পর্দার অন্তরালে নেই যে অস্বীকার করার সুযোগ পাবে, এখনতো ওদের ঈমান বিধ্বংসী কাজকর্ম প্রকাশ্য দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, এক জায়গায় এরা নবী ও ওলীগণের বাস্তব ফযীলত ও কামালাতকে এ বলে অস্বীকার করে যে এগুলো স্বীকার করার দ্বারা আকীদায়ে তাওহীদের উপর আঘাত আসে এবং অন্য জায়গায় এ আঘাতকে ঘরের বুযুর্গদের উচ্চ মর্যাদা প্রমাণ করার জন্য সানন্দে হজম করে ফেলে।

(১০) মওলভী ইসমাইল দেহলভীর কাহিনী। অদৃশ্য জ্ঞান ও আরোগ্যদানের দাবী

তকবিয়াতুল ঈমানের লিখক মওলভী ইসমাঈল দেহলভীর কাশফ ও বাতেনী হস্তক্ষেপ সম্পর্কিত একটি খুব সুন্দর কাহিনী আমীর খান সাহেব আরওয়াহে ছালাছা গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন। তিনি লিখেনঃ

"আমার উস্তাদ মিয়াজী মুহাম্মদ সাহেবের সাহেবজাদা হাফেজ আবদুল আজীজ ....একবার স্বীয় শৈশবকালে মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন এবং ডাক্তারেরা জবাব দিয়ে ফেলেছিলেন। তাঁর পিতা এ জন্য খুবই দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হয়ে পড়েছিলেন। হঠাৎ একদিন মিয়াজী সাহেব স্বপ্নে দেখলেন যে, মওলভী ইসমাঈল সাহেব মসজিদের মাঝ দরজায় বসে ওয়াজ করতেছেন। আমি মসজিদের ভিতরে আছি এবং আবদুল আজীজ আমার পাশে বসা আছেন। হঠাৎ সে প্রশ্রাব করার প্রয়োজন বোধ করলো। আমি ওকে প্রশ্রাব করাতে বাইরে নিয়ে যেতে চাইলাম। কিন্তু মানুষের ভিড়ের কারণে কোন দিকে বের হবার পথ ছিল না, তবে মওলভী ইসমাঈল সাহেবের দিকে কোন ঝামেলা ছিল না। তাই আমি ওকে ইসমাঈল সাহেবের দিকে নিয়ে গেলাম। যখন আবদুল আজীজ মওলভী ইসমাঈল সাহেবের সামনে গেল, তখন তিনি তিনবার ইয়া শাফী বলে ওকে ফুক দিলেন। এ স্বপ্নের পর যখন ঘুম ভেঙ্গে গেল তখন তিনি তাঁর স্ত্রীকে জাগালেন এবং বললেন, আবদুল আজীজ আরোগ্য হয়ে গেছে। আমি এখন এ রকম স্বপ্ন দেখেছি ।

সকালে মিয়া আবদুল আজীজ সত্যি সত্যি সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়ে গিয়েছিল। আরওয়াহে ছালাছা ৮৮ পৃঃ)

এটা একটা স্ববিরোধী কথা। যে ব্যক্তি সারা জীবন নবীগণের অদৃশ্য জ্ঞানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে আসছে, মৃত্যুর পর ওকে অদৃশ্য জ্ঞানী সাব্যস্ত করা হলো। কেননা ওদের মতে যদি ওনার কাছে অদৃশ্য জ্ঞান না থাকে, তাহলে স্বপ্নে ওনার কীভাবে জানা হলো যে আবদুল আজীজ অসুস্থ, ওকে ফুঁক দেয়া দরকার।

আর স্বপ্ন দ্রষ্টার বিশ্বাস কীযে জোরালো ছিল যে ঘুম ভাঙ্গার সাথে সাথে স্ত্রীকে জাগায়ে এ সুসংবাদটাও শুনায়ে দিলেন যে, ছেলে আরোগ্য হয়ে গেছে এবং সত্যি সত্যি সকালে ছেলে আরোগ্য হয়ে গিয়েছিল।

একেই বলে অদৃশ্যজ্ঞান ও আরোগ্য দানের আকীদা, যা ওদের কাছে নবী ও ওলীগণের বেলায় শিরক। কিন্তু মওলভী ইসমাঈল দেহলভীর বেলায় একেবারে ইসলাম সম্মত হয়ে গেছে।

(১১) মওলভী মাহমুদুল হাসান সাহেবের কাহিনী, স্বীয় মাযহাবের বিপরীত একটি লজ্জাষ্কর কাহিনী

দেওবন্দী জমাতের শেখুল হাদীছ মওলভী আসগর হুসাইন সাহেব স্বীয় কিতাব হায়াতে শেখুল হিন্দে মওলভী মাহমুদুল হাসান সাহেব সম্পর্কে একটি অদ্ভুত ও বিস্ময়কর কাহিনী উদ্ধৃত করেছেন। তিনি লিখেনঃ

১৩২২ হিজরীর শেষের দিকে দেওবন্দে এক মারাত্মক মহামারী দেখা দিয়েছিল। এতে অনেক ছাত্রও আক্রান্ত হয়েছিল। মুহাম্মদ সালেহ নামক একজন শিক্ষাসমাপ্ত ছাত্র সনদপত্র নিয়ে দু'এক দিনের মধ্যে বাড়ী যাবার ছিল। কিন্তু সেই রোগে সেও আক্রান্ত হলো এবং অবস্থা একেবারে সঙ্গীন হয়ে গেল।

মৃত্যুর একটু আগে সে এমন কথাবার্তা বলতে শুরু করলো যেন শয়তানের সাথে মুনাজারা করছে। শয়তানের যুক্তি খন্ডন করছে এবং স্বীয় দলীল পেশ করছে এবং এ রকম মনে হচ্ছিল যে, সে মুনাজারায় শয়তানকে ভালমতে পরাস্ত করেছে।

এরপর সে বলতে লাগলো, আফসোস! এ জায়গায় এমন কোন আল্লাহর বান্দা নেই, যে আমাকে এ শয়তান থেকে রক্ষা করে। এটা বলতে, না বলতে

হঠাৎ বলে উঠলো, বাহ! সুবহানাল্লাহ!! দেখুন আমার উস্তাদ হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসান সাহেব তশরীফ এনেছেন এবং সেই শয়তান পালিয়ে যাচ্ছে। আরে শয়তান! কোথায় যাচ্ছ? একটু পড়েই ছাত্রটি মারা গেল। হযরত মওলানা ও সময় তথায় উপস্থিত ছিলেন না। কিন্তু রূহানী হস্তক্ষেপ দ্বারা সাহায্য করেছেন। হায়াতে শেখুল হিন্দ -১৯৭ পৃঃ)

উক্ত উদ্ধৃতির শেষাংশে 'হযরত মাওলানা সেই ঘটনার সময় তথায় উপস্থিত ছিলেন না কিন্তু রূহানী হস্তক্ষেপ দ্বারা সাহায্য করেছেন'-একথাটি বর্ধিত করে এটা একেবারে পরিস্কার করে দিল যে, সে ছাত্রের কথাগুলো নিছক প্রলাপ ছিল না বরং বাস্তবেই মওলভী মাহমুদুল হাসান সাহেব ওর সাহায্যের জন্য অদৃশ্য ভাবে তথায় পৌছে গিয়েছিলেন।

কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার যে দেওবন্দের ফিৎনা পিপাসু মন এ ব্যাপারে কোন প্রশ্ন উথাপন করলো না যে উনিতো ওখানে উপস্থিত ছিলেন না, কীভাবে ওনার জানা হয়ে গেল যে একজন ছাত্র সকরাতের সময় শয়তানের সাথে মুনাজারা করছে এবং বিজলীর মত উড়ন্ত ক্ষমতা উনি কোথেকে পেলেন যে, চোখের পলকে ওখানে এসে উপস্থিত হলেন? আসলে মনে আঘাত লাগার বিষয় হচ্ছে এখানে অদৃশ্য জ্ঞানও এবং ক্ষমতা ও হস্তক্ষেপও স্বীকার করা হয়েছে। যেহেতু নিজেদের মাওলানার ব্যাপার, সেহেতু এখানে আকীদায়ে তাওহীদ কলুষিত হলো না এবং কুরআন সুন্নাহেরও বিপরীতও হলো না। কিন্তু এ ধরনের আকীদা যদি আমরা সরকারে গাউছুল ওরা বা খাজা গরীবে নওয়াজ বা কোন নবী বা ওলীর বেলায় জায়েয মনে করি, তাহলে এ তওহীদবাদীরা আমাদের বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লেগে যায়।

(১২) জনাব মওলভী রশীদ আহমদ রানী সাগেরীর ঘটনাবলী

জনাব মওলভী আবদুর রশীদ রানীসাগেরী সাহেব দেওবন্দী জমাতের একজন এলাকা ভিত্তিক পীর ছিলেন। দারুল উলুম দেওবন্দের উপদেষ্টা কমিটির সদস্য ও বালওয়ারী শরীফের শরীয়ত বিভাগের আমীর মওলভী শাহ মিন্নাত উল্লাহ রহমানী সাহেবের ব্যবস্থাপনায় প্রকাশিত নকীব পত্রিকায় 'মুসলেহে উম্মত' নামে মওলভী আবদুর রশীদ রানী সাগেরীর জীবনীর উপর একটি বড়

আকারের বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করেন। নিম্নের ঘটনাবলী সেই সংখ্যা থেকে সংগৃহিত।

নিজেদের মাযহাবী আকীদার প্রতি কুঠারাঘাত

মওলভী শমস তিবরীজ খান কাসেমী সাহেবের উদ্ধৃতি দিয়ে মওলভী আবদুর রশীদ রানী সাগেরী সাহেবের অদৃশ্য জ্ঞান সম্পর্কে এ ঘটনাটি বর্ণনা করা হয়েছেঃ

> মজলিসে প্রায় সময় এমন হতো যে, কোন ব্যক্তি মাওলানার কাছে কোন প্রশ্ন করার মনস্থ করলে, তিনি প্রশ্নের আগে জবাব দিয়ে দিতেন। একবার এক যুবক সকালে তাঁর সাথে দেখা করলো এবং কোন কিছু অবহিত না হয়ে কথা প্রসঙ্গে তিনি ওকে নসীহত করলেন যে, ফজরের নামায কক্ষনো কাযা না হওয়া চায়। সে বুঝতে পারলো যে আজ ওর যে নামায কাযা হয়েছে, এটা সেদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। অনুরূপ কল্‌টি মজলিসে বয়ানের মাঝখানে ইরশাদ করেন, মহিলা আসবে, পর্দার ব্যবস্থা কর। কথামত একটু পরেই মহিলাদের পদধ্বনি শুনা গেল। নকীবের মুসলেহে উম্মত সংখ্যা ৫পৃঃ

মনের ধারনা সম্পর্কে অবহিত হওয়ার জ্ঞানতো ছিল, তা ছাড়া অতীত ও ভবিষ্যতের জ্ঞানও তাঁর অর্জিত ছিল, তাই একদিকে যেমন কাযা হওয়া ফজরের নামাযের খবর দিলেন অন্যদিকে আগত মহিলাদের আগাম খবর দিলেন।

(১৩) অদৃশ্য জ্ঞান সম্পর্কে অনুসারীদের দৃঢ় আস্থার এক উল্লেখযোগ্য কাহিনী

হাজারীবাগ জিলার চিত্‌রা রশীদুল উলুম মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক মওলভী ওসী উদ্দিন সাহেব বর্ণনা করেন যে, একদিন তিনি জুমার নামাযের পর হযরতের হুজরায় প্রবেশ করে দেখলেন যে, হুযূর খুবই চিন্তিত অবস্থায় খাটের উপর বসে আছেন। তিনি আরয করলেন, হুযূর ব্যাপার কি? আজ আপনাকে খুবই চিন্তিত দেখাচ্ছে কেন? এর পরের ঘটনা ওনার নিজের মুখেই শুনুনঃ

> হযরত (কুঃ সিঃ) ফরমালেন, পাকিস্তানে দু'টি বড় ঘটনা ঘটে গেল। আল্লামা শাব্বির আহমদ উছমানী (রহমতুল্লাহে তাআলা আলাইহে) ইন্তেকাল হয়ে গেলেন এবং একটি বিমান পতিত হয়ে ধ্বংস হয়ে গেল, যেটায় পাকিস্তানের কয়েকজন দায়িত্বশীল ব্যক্তি মারা গেলেন। মওলানা ওসী উদ্দীন সাহেব বলেন,

এতে আমি বিস্মিত ও আশ্চর্যান্বিত..হলাম যে, সংবাদপত্রের সাথে তাঁর কোন সম্পর্ক নেই। কীভাবে তিনি জানতে পারলেন, তা মোটেই বুঝে আসছিল না। শেষ পর্যন্ত জিজ্ঞাসা করে নিলাম, হুযূর আপনি এ খবর কিভাবে পেলেন? এতে তিনি বললেন, এখানকার পত্রিকায় খবর দেখ, সম্ভবত পত্রিকা এসে গেছে। আমি বললাম, পত্রিকা এখনও আসেনি, এখনতো হকার আসার সময়ও হয়নি। তবুও মাওলানা ওসী উদ্দীন বের হয়ে দেখলেন যে ঠিকই হকার আসতেছে। এ ঘটনায় হযরতের দু'টি কাশফ প্রকাশ পেল-প্রথম কাশফ হচ্ছে আল্লামা শাব্বির আহমদ উছমানী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) এর ইন্তেকাল এবং বিমান দুর্ঘটনা এবং দ্বিতীয় সদ্য কাশফ হচ্ছে পত্রিকা নিয়ে হকারের আগমন। যখন দেখা গেল যে ঘটনা দু'টি লাল কালিতে মুদ্রিত হয়েছে। এর আগে কোন পত্রিকায় আলোচিত হয় নি। এবং ওই সময় চিত্‌রায় রেডিওরও ব্যাপক প্রচলন ছিল না, যার মাধ্যমে খবর পাওয়া যেত। (নকীবের মুসলেহে উম্মত সংখ্যা ১৮ পৃঃ)

এ ঘটনায় দৃষ্টিকোণের একটি বিশেষ বিষয় লক্ষ্য করুন।

ঘটনা বর্ণনাকারী মাঝে মাঝে এ ধরনের বাক্য যেমন 'ওনার সাথেতো সংবাদপত্রের কোন সম্পর্ক নেই, কীভাবে অবহিত হলেন?" 'পত্রিকাতো এখনও আসেনি' "হুযূর, এখনতো হকার আসার সময় হয়নি" "এর আগে এটা কোন পত্রিকায় আলোচিত হয়নি এবং ওসময় চিত্‌রায় রেডিওর ব্যাপক প্রচলন হয়নি" সংযোগ করে কলমের সর্বশক্তি এ বিষয়ের উপর ব্যয় করেছেন যেন যে কোনভাবে প্রমাণিত হয়ে যায় যে, তাঁর অদৃশ্য জ্ঞান ছিল। কিন্তু এ দেওবন্দী আলেমগণ যখন রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর অদৃশ্য জ্ঞান সম্পর্কিত কোন ঘটনার উপর আলোচনা করে, তখন প্রতিটি লাইনে সেই চেষ্টায় থাকে, যেন যেভাবে সম্ভব এটা প্রমাণ করা যায় যে, হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর অদৃশ্য জ্ঞান ছিল না। হযরত জিব্রাইল আমীন খবর দিতেন।

দৃষ্টিকোণের এ পার্থক্যের কারণ প্রকাশ না করলেও আশা করি, কারো বুঝার অসুবিধা হবে না।

(১৪) স্বীয় বুযুর্গীর প্রথম ঘটনা

এ রানীসাগরী সাহেব সম্পর্কে একটি চিত্তাকর্ষক ঘটনা শুনুন। মওলভী শাহাব উদ্দীন রশীদী নামে তাঁর অন্য এক মুরীদ নকীবের সেই মুসলেহে উম্মত সংখ্যায় একটি দূর্লভ ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন। তিনি বর্ণনা করেনঃ

আমার একান্ত বন্ধু ও হুযূরের আত্মীয় আলহাজ্ব মাওলানা আশরাফ আলী সাহেব আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত (রহমতুল্লাহে আলাইহে) বর্ণনা করেছেন, এক সৌখিন যুবক ছিল। তার জীবনটা খুবই উচ্ছৃংখলতার মধ্যে অতিবাহিত করেছিল। সে যখন মারা গেল, তখন আমি একদিন কবরস্থানে গিয়ে দেখলাম যে, সে কবরে উলঙ্গ বসে আছে এবং খুবই উদাস মনোভাবাপন্ন অবস্থায় আছে। যখন আমি কাছে পৌছলাম তখন সে আমাকে দেখে উভয় হাত দ্বারা স্বীয় সতর ঢেকে নিল। আমি ওকে বললাম, এ জন্যইতো আমি তোমাকে বলতাম, কিন্তু তুমি স্বীয় জিন্দেগীটা উচ্ছৃংখলভাবে অতিবাহিত করেছ এবং আমার কথার প্রতি কর্ণপাত করনি। 'নকীবের মুসলেহে উম্মত সংখ্যা ১৯ পৃঃ)

এঘটনাটি পড়ার পর একেবারে এরকম মনে হয় যে ওনার এ ঘটনাটা কোন মৃতব্যক্তির সাথে নয় বরং জীবিত ব্যক্তির সাথে হয়েছিল এবং আলমে বরযখে নয় বরং আলমে দুনিয়ায়। যদি ঘটনাটি আলমে বরযখের হয়ে থাকে, তাহলে মানতেই হবে যে, অদৃশ্য জগতের সাথে এদের সম্পর্ক একেবারে ঘর ও আঙিনার মত। অদৃশ্য জগতের কোন পর্দা ওদের দৃষ্টির সামনে প্রতিবন্ধক নয়। যে দিকেই দৃষ্টিপাত করেছে অদৃশ্য জিনিষসমূহ অনায়াসে উম্মুক্ত হয়ে গেছে। ইনসাফ করুন, একদিকেতো আপন বুযুর্গদের কাশফ ক্ষমতার এ অবস্থায় বর্ণনা করা হয়, অন্যদিকে সায়্যিদুল আম্বিয়া (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর বেলায় আজ পর্যন্ত বলতেছে যে তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) দেয়ালের পিছনের জ্ঞানও নেই।

(১৫) পার্থিব কাজকর্মে হস্তক্ষেপ করার ঘটনা

পার্থিব কাজকর্মে ওসব হযরতের ক্ষমতা ও স্বাধীন হস্তক্ষেপ করার তামাশা দেখতে চাইলে, এ কিতাবের এ শেষ কাহিনীটা পড়ুন। সেই রানী সাগরী সাহেবের সাহেবজাদী ছামিনা খাতুনের স্মৃতিচারণ থেকে নকীবের সেই মুসলেহে উম্মত সংখ্যায় এ ঘটনাটি উদ্ধৃত করা হয়েছে। তিনি বর্ণনা করেনঃ

"যখন আমাদের ঘর তৈরী করা হচ্ছিল, আব্বাজানের পরামর্শ মুতাবিক তখন সবার আগে শৌচাগার নির্মাণে হাত দেয়া হয়েছিল। সেই সময় বর্ষাকাল ছিল কিন্তু বৃষ্টি হচ্ছিল না। ধান রোপার সময় হয়েছিল, কৃষকেরা খুবই চিন্তিত ছিল। আমি আব্বাজানের কাছে আবেদন করলাম, আব্বাজান! বৃষ্টির জন্য দুআ করুন, অনেক লোক পেরেশান এবং ফসল ক্ষতির সম্মূখীন। আব্বাজান মুচকি হেসে বললেন, বৃষ্টি কেমনে হবে? আমাদের যে শৌচাগার তৈরী হচ্ছে, সেটা বিনষ্ট হয়েযাবে।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কবে নাগাদ শৌচাগারের কাজ শেষ হবে? বললেন, দেয়াল সম্পূর্ণ হয়ে গেছে, রাত্রে ছাদ ঢালাই হয়ে যাবে। আমি নিশ্চুপ হয়ে গেলাম। দু'দিন পর খুব জোরে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। আব্বাজান ঘরেই ছিল। আমি বললাম, বৃষ্টি হচ্ছে। এখনত শৌচাগারের ক্ষতি হবে। তিনি বললেন, না বেটী, এখনতো উপকারই হবে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তাহলে কি শৌচাগারের জন্যই বৃষ্টি বন্ধ ছিল? আব্বাজান কোন উত্তর দিলেন না, শুধু মুচকি হাসলেন। ওসময় আব্বাজান সুস্থ ছিলেন।" নকীবের মুসলেহে উম্মত সংখ্যা ৪ পৃঃ

এ ঘটনাটি বর্ণনার দ্বারা যে আকীদাটা প্রকাশ করা উদ্দেশ্য, সেটা হয়তো ওনার এ বিষয়ে জানা ছিল যে, বৃষ্টি হবে না এবং তিনি এটাও জানতেন যে বৃষ্টি কেন বন্ধ হয়ে আছে? অথবা এটা প্রকাশ করা উদ্দেশ্য যে পার্থিব কাজকর্মে ওনার ব্যক্তিগত ইচ্ছা এত প্রভাবান্বিত ছিল যে, যদিওবা জমীন উত্তপ্ত হয়ে গেল, ফসল জ্বলে যাচ্ছিল এবং কৃষকেরা বৃষ্টির জন্য হাহুতাশ করছিল, তবুও যতক্ষণ পর্যন্ত শৌচাগার তৈরী হয়নি, বৃষ্টি বন্ধ থাকতে হলো। 'বৃষ্টি কেমনে হবে'-এ বাক্যাংশ দ্বারা সুস্পষ্ট ভাবে সে দৃষ্টিকোণটাই নিশ্চিত করে যে, তিনি যতক্ষণ পর্যন্ত চায়নি, বৃষ্টি হয়নি। এখন আপনারাই বিচার করুন যে, পার্থিব কাজকর্মে ঘরের বুযুর্গদের প্রভাব প্রতিপত্তিরতো এ অবস্থা বর্ণনা করা হচ্ছে কিন্তু রসূলে খোদা (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর বেলায় এদের আকীদার ভাষ্য হচ্ছেঃ

পার্থিব সমস্ত কাজকর্ম আল্লাহরই ইচ্ছায় হয়ে থাকে। রসূলের ইচ্ছায় কিছুই হয় না। (তকবিয়াতুল ঈমান)

আকীদাগত ঔদ্ধত্যতো আছেই। শব্দ ও বর্ণনাগত বাহ্যিক ঔদ্ধত্যটাও একটু লক্ষ্য করুন। "পার্থিব সমস্ত কাজকর্ম আল্লাহর ইচ্ছায় হয়ে থাকে।" এ বাক্যটাই আকীদায়ে তাওহীদের উদ্দেশ্য প্রকাশ করার জন্য যথেষ্ট ছিল। কিন্তু "রসুলের ইচ্ছায় কিছু হয় না' এ অংশটার সংযোজন কেবল সেই অবজ্ঞাটাই প্রকাশ করার জন্য, যা রসূলে খোদার প্রতি ওদের মনে রয়েছে।

نہ تھی دل میں تو کیوں آئی زبان پر

(অর্থাৎ মনের মধ্যে না থাকলে মুখে কেন আসলো)

দেওবন্দী জমাতের তিন নতুন বুযুর্গদের ঘটনাবলীর সংযোজন

কারী ফখরুল হাসন গয়াভী সাহেব, যিনি মাওলানা হুসাইন আহমদ শেখুল হিন্দ সাহেবের মুরীদ ছিলেন এবং বিহার প্রদেশে দেওবন্দী মাযহাবের অনেক বড় মুবাল্লিগ ও নেতা হিসেবে বিবেচিত ছিলেন। তিনি দরসে হায়াত নামে একটি কিতাব রচনা করেন, যেটা মদনী কুতুবখানা গয়া থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

সেই কিতাবে তিনি স্বীয় মাযহাবের তিনজন বুযুর্গের জীবনবৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করেন। তাদের মধ্যে একজন হচ্ছে তার নানা মওলভী আবদুল গফফার সরহদী, দ্বিতীয় জন হচ্ছে তাঁর পিতা মওলভী খায়রুদ্দীন (মওলভী মাহমুদুল হাসান সাহেবের শাগরীদ) এবং তৃতীয় জন হচ্ছে ওনার উস্তাদ ও বাপের বন্ধু মওলভী বেশারত করীম সাহেব। এ তিন জন তাঁদের সময়ে দেওবন্দী মাযহাবের এলাকা ভিত্তিক নেতা ও বলিষ্ট মুবাল্লিগ ছিলেন। পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহে ধারাবাহিক ভাবে এ তিনজনের ঘটনাবলী পড়ুন। যেগুলো সঠিক মনে করলে দেওবন্দী চিন্তাধারার ভিত্তি টলটলায়মান হয়ে যায় এবং একজন ন্যায় পরায়ণ ব্যক্তি এটা ধারনা করতে বাধ্য হয়ে যায় যে, এ কিতাব সম্ভবত এ জন্য লিখা হয়েছে, যেন দেওবন্দীদের মিথ্যা ফাঁস হয়ে যায়।

(১) মওলভী আবদুল গফফার সরহদী সাহেবের ঘটনাবলী

দরসে হায়াতের লিখক স্বীয় নানা মওলভী আবদুল গফফার সাহেব সম্পর্কে এ দাবী করেছেন যে মানুষ ছাড়া জ্বীনও ওনার থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতো এবং অনেক জ্বীন ওনার খাদেমদের অন্তর্ভূক্ত ছিল।

এক জ্বীন ছাত্রের কাহিনী বর্ণনা পূর্বক তিনি লিখেন যে, ওর সাথীদের মধ্যে এক ছেলে কোন এক প্রকারে জানতে পারলো যে সে জ্বীনের ছেলে। বন্ধুত্বের সম্পর্কতো আগের থেকেই ছিল কিন্তু এটা জানার পর সে ওর পিছু নিল এবং বলতে লাগলো, আমি একজন গরীব লোক। তুমি আমাকে আর্থিক সাহায্য করে বন্ধুত্বের হক আদায় কর। এ কাজ তোমার জন্য মোটেই অসম্ভব নয়। সে অপারগতা প্রকাশ করে উত্তর দিল, এটা কেবল ওই অবস্থায় সম্ভব যে, আমি তোমার জন্য চুরি করি কিন্তু মওলভী হয়ে আমি এ কাজ কক্ষনো করতে পারবোনা।

সেই জ্বীনের শিক্ষার শেষ বছর বুখারী শরীফ শেষ করে যখন বাড়ী চলে যাচ্ছিল, তখন ওর বন্ধু ওর সাথে একাকী সাক্ষাত করলো এবং শোকাতর হয়ে বললো, এখনতো তুমি চলে যাচ্ছ, বিদায় বেলায় কমপক্ষে এতটুকু বলে যাও যে, পরবর্তীতে তোমার সাথে সাক্ষাতের সুযোগ কীভাবে হতে পারে? উত্তরে সে বললো, আমি তোমাকে কয়েকটি নির্দিষ্ট বাক্য বলে দিচ্ছি। যখনই তোমার সাক্ষাত করার ইচ্ছে হয়, এগুলো পড়লে আমি উপস্থিত হয়ে যাব। সেমতে সে চলে যাবার পর যখনই সাক্ষাত করার ইচ্ছে হতো, উল্লেখিত বাক্যগুলো পড়ে নিত এবং সে উপস্থিত হয়ে যেত।

এখন এর পরের ঘটনা স্বয়ং লিখকের মূখেই শুনুনঃ

একবার সে টাকা পয়সার জন্য খুবই দুশ্চিন্তায় পতিত হলো। মেয়ে বিয়ে দেয়ার ছিল। কিন্তু ওর কাছে কোন টাকা পয়সা ছিল না। সেই সময় সেই জ্বীন বন্ধুর কথা মনে পড়লো এবং সেই নির্দিষ্ট বাক্যগুলো উচ্চারণ করার সাথে সাথে জ্বীনবন্ধু এসে গেল। সে স্বীয় দুশ্চিন্তার কথা ওকে শুনালো।

সে বললো ঠিক আছে, আমি তোমার জন্য চুরিতো করবই না। এ হারাম পথ আমি কিছুতেই অবলম্বন করতে পারি না। তবে বৈধ উপায়ে কিছু টাকা সংগ্রহ করে তোমাকে নিশ্চয়ই সাহায্য করবো। তুমি নিরাশ হয়ো না। পরদিন সেই জ্বীন এসে ওর দুশ্চিন্তা গ্রস্থ বন্ধুকে উল্লেখযোগ্য টাকা দিয়ে গেল কিন্তু সতর্ক কুরে গেল যে, একথা যেন কারো কাছে প্রকাশ না করে। (দরসে হায়াত-২৬ পৃঃ)

এ টাকা দ্বারা সে শান শওকত ও জাক জমক করে

ওর মেয়ের বিয়ে দিল। রাজকীয় এ অবস্থা দেখে লোকেরা ভীষণ আশ্চর্য হয়ে গেল এবং সবাই বলাবলি করতে লাগলো যে হঠাৎ সে এত টাকা কোথায় পেল। অন্যরাতো জিজ্ঞাসা করার সাহস পেল না কিন্তু স্ত্রী নাছোর বান্দা, যতই গোপন রাখতে চাইলো, স্ত্রীর জানার আগ্রহ ততই বৃদ্ধি পেল। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে ওর কাছে সম্পূর্ণ গোপন কথা প্রকাশ করতে হলো। এর পরের ঘটনা একান্ত বিস্মিত সহকারে শুনুন। তিনি লিখেনঃ

"এর পরিণতি এটাই হলো যে, এখন সে যখনই সেই বাক্যগুলো এ আশায় উচ্চারণ করে যে সেই জ্বীন বন্ধু উপস্থিত হবে এবং ওর সাথে দেখা করবে। কিন্তু আর কখনো ওর এ আশা পূর্ণ হলো না এবং জ্বীন ওর সাথে সাক্ষাতের সিলসিলাটা বন্ধ করে দিল।" (দরসে হায়াত ৬৩ পৃঃ)

এখন একদিকে এ ঘটনাটি স্মরণ রাখুন এবং অন্যদিকে দেওবন্দী মাযহাবের মুল কিতাব তকবিয়াতুল ঈমানের এ বক্তব্যটা পড়ুনঃ

"আল্লাহ সাহেব পয়গম্বর (সলআম)কে বলেছেন, লোকদেরকে এটা বলে দাও যে গায়বী কথা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ জানে না-সে ফিরিশতা হোক, মানুষ হোক বা জ্বীন হোক। তকবিয়াতুল ঈমান-২২

এটা হচ্ছে মাযহাব এবং ওটা হল ঘটনা। উভয় একে অপরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে।

এখন আপনারা ন্যায়সঙ্গত ভাবে বলুন যে, সেই জ্বীন যদি অদৃশ্য জ্ঞানী না হতো, তাহলে ঘরের অভ্যন্তরে স্ত্রীর সাথে আলোচনার খবর ওর কীভাবে জানা হয়ে গেল? আর যদি জানা না হয়ে থাকে, তাহলে সে সাক্ষাতের সম্পর্ক কেন ছিন্ন করলো? এটা কিছুতেই অগ্রাহ্য করার উপায় নেই যে অবগতি ও আগমনের এ ঘটনা একবারের নয়, যাকে দৈব ঘটনা বলে উড়িয়ে দেয়া যায়। বরং ঘটনার সুস্পষ্ট বর্ণনার দ্বারা বুঝা যায় যে ওই বাক্যগুলো উচ্চারণ করা মাত্রই হাজার হাজার মাইল দূর থেকে ওর জানা হয়ে যেত যে অমুক জায়গায় অমুক ব্যক্তি আমাকে স্মরণ করছে।

এখন এর ভাবার্থ এটা ছাড়া আর কী হতে পারে যে, অদৃশ্য জ্ঞানটা ওর সব সময় ছিল। একেবারে ওয়ারলেসের মত এদিকে সিগন্যাল দিল, ওদিকে জানা হয়ে গেল।

যুদ্ধ বিগ্রহে দু'বাহিনীর মধ্যে প্রায় সময় সংঘর্ষ হয়। কিন্তু আপন বাহিনীর সাথে এ ধরণের মারাত্মক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ ইতিহাসে খুবই বিরল।

খুবই আশ্চর্য ব্যাপার যে এত কিছুর পরও দেওবন্দী আলেমগণ পৃথিবীতে তারাই একমাত্র আকীদায়ে তাওহীদের ঝান্ডাবাহী বলে গর্ববোধ করে।

মাযহাবী ধ্যান ধারনার আর এক রক্তপাত, পার্থিব ব্যবস্থাপনার সাথে মাওলানার সম্পর্ক

সেই কিতাবের লিখক একটু অগ্রসর হয়ে স্বীয় নানার বেলায় খোদায়ী ক্ষমতার একটি সুস্পষ্ট দাবী করেছেন। এখন একান্ত বিস্মিত হয়ে সেই অংশটুকু পড়ুনঃ

> "বিশ্ব পরিচালনার জ্ঞানের সাথেও মাওলানার সম্পর্ক ছিল এবং বিশ্ব পরিচালনার কর্মকর্তাদের মাওলানার সাথে সাক্ষাত, পরামর্শ করা এবং ওনার সাথে গভীর সম্পর্কের কথাও মাঝে মধ্যে প্রকাশ পাচ্ছিল।" (দরসে হায়াত – ৮৫ পৃঃ)

আপনারা কি বুঝলেন? এটাই বলতে চেয়েছেন যে তাঁর নানাজান ছিলেন বিশ্ব ব্যবস্থাপনা বিভাগের অফিসার ইন-চার্জ এবং তার অধীনস্থ কর্মকর্তাগণ তাঁরই পরামর্শ মুতাবিক বিশ্ব ব্যবস্থাপনার কাজ আঞ্জাম দিতেন। এ কথাগুলো আমার নিজের থেকে বলছিনা বরং লিখক স্বয়ং তার কিতাবে এ দাবী করেছেন। যেমন তিনি বলেনঃ

> আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে বিশ্বের যাবতীয় ব্যবস্থাপনার জন্য কর্মকর্তাগণ নিয়োজিত আছে। ওরাই সবকিছু করে। ওদেরকে এ বিদ্যার পরিভাষায় আসহাবে খেদমত বলা হয়। (দরসে হায়াত-৮৯ পৃঃ)

এ প্রশ্নটা যেটা প্রায় সময় করা হয় যে, আল্লাহ তাআলা কি তোমাদের সাহায্য করতে পারে না, যা তোমরা নবী ও ওলীদের কাছে কামনা কর। যদি এটা সঠিক হয়, তাহলে আমাদেরও যেন এ প্রশ্নটা করার অনুমতি দেয়া হয় যে, ওরাই যখন সব কিছু করে, তাহলে আল্লাহ তাআলা কি করে? তিনি কি একাকী বিশ্বের ব্যবস্থাপনা করতে পারে না, যার জন্য তিনি মানব জাতি থেকে জায়গায় জায়গায় কর্মকর্তা নিয়োগ করেছেন?

কথা প্রসঙ্গে এটা এসে গেল। মূলতঃ আমাদের বক্তব্য হচ্ছে একদিকে নানাজানের বিশ্ব পরিচালনায় এ ইখতিয়ার অবলোকন করুন এবং অপর দিকে তকবিয়াতুল ঈমানের এ বক্তব্যটুকু পড়ুন। তওহীদ পূজা ও খোদা পূজার সমস্ত জারিজুড়ি ফাঁস হয়ে যাবেঃ

"আল্লাহ সাহেবকে দুনিয়াবী বাদশাহদের মত মনে কর না যে, বড় বড় কাজ নিজে করেন এবং ছোটখাট কাজ অন্যান্য চাকর কর্মচারীদের উপর ছেড়ে দেন। সুতরাং ছোট খাট কাজ সমূহের জন্য ওদের কাছে নিশ্চয় ধর্ণা দিতে হয়। কিন্তু আল্লাহর কারখানায় এ রকম নেই। তকবিয়াতুল ঈমান-৩৬

এটা হচ্ছে আকীদা এবং ওটা হচ্ছে আমল, আর এ দু' এর মধ্যে যে আকাশ পাতাল পার্থক্য, তা বলার অবকাশ রাখে না। এ পার্থক্যের সমন্বয় কীভাবে করবে, তা তারাই জানে। আমি এ মূহুর্তে ওসব কর্মকর্তাদের এক জনের কাহিনী শুনাতে চাই, যেটা লিখক এজন্যই প্রকাশ করেছেন যে, পদবীর সাথে ওনার নানাজানের গভীর সম্পর্ক ছিল। কাহিনীর সূচনায় লিখেনঃ

'মাওলানা আবদুর রাফে সাহেব মরহুম (লিখকের খালু) বর্ণনা করেছেন যে মাওলানার (নানাজান) ঘরের পণ্যদ্রব্য আমিই আনতাম। তরিতরকারী আনতে হলে মাওলানা আমাকে একটি নির্দিষ্ট সবজী বিক্রেতার ঠিকানা বলতেন যেন ওখান থেকে আনি। ওনার সেখানে ভাল হোক বা মন্দ হোক,তবুও ওনার কাছ থেকে যেন ক্রয় করা হয়।' (দরসে হায়াত-৮৬ পৃঃ)

এখন জানার বিষয় হলো সেই বিক্রেতা কে ছিল? এবং ওনার কি বৈশিষ্ট্য ছিল? এ প্রসঙ্গে তিনি লিখেনঃ

মাওলানা আবদুর রাফে সাহেব বর্ণনা করেন যে, আমি আরয করলাম, গয়ার ব্যবস্থাপনা কাজকর্ম আজকাল খুবই খারাপ। আজকাল এখানকার সাহেবে খেদমত কে? মাওলানা রাগান্বিত হলেন (এবং বললেন) তোমার এ রোগ যে অনর্থক কথা জিজ্ঞাসা কর। কিন্তু আমি নাছোর বান্দা, বার বার বলতে লাগলাম, আমাকে বলুন। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে বললেন, সেই সবজী বিক্রেতা, যার কাছ থেকে তরিতরকারী আনার জন্য তোমাকে তাগিদ দিয়ে থাকি এবং তুমি বারবার আমার কাছে এ ব্যাপারে কারণ জিজ্ঞেস কর। আমি এটা শুনে আশ্চর্য হয়ে

গেলাম যে আল্লাহগনী সেই সবজী বিক্রেতা এত উচ্চ স্তরের। দরসে হায়াত-৮৯ পৃঃ

এ ঘটনার প্রেক্ষাপটে এর থেকে অধিক কিছু বলার নেই যে, পার্থিব ব্যবস্থাপনা এবং দেখা শুনার ভার আল্লাহ তাআলা যখন মানব সন্তানের কয়েক জনের উপর সোপর্দ করে দেন, তাহলে ওদেরকে কর্মসম্পাদনকারী ও হাজত পূর্ণকারী মনে করা হলে, শিরকের অপবাদ কেন দেয়া হয়? এটা বিদ্রোহ নয় বরং এটা যথার্থ আনুগত্যতা যে প্রভুর পক্ষ থেকে নিয়োজিত কর্মকর্তাদেরকে ওনাদের পদমর্যাদা মাফিক আকীদা ও আমল উভয়ভাবে যেন গ্রহণ করে নেয়া হয়। কেননা যার হাতে কাজের ব্যবস্থাপনা ও দ্বায়িত্বভার অর্পিত হয়ে থাকে, নিজের কাজকর্মের জন্য ওনার কাছে ধর্না দেয়াটা দ্বীন ও ন্যায় নীতিরও কাম্য এবং যুক্তিও তা-ই বলে।

এ ঘটনায় নিজেদের মাযহাবের বিপরীত বক্তব্যতো আছেই কিন্তু সবচে বড় দুঃখজনক ব্যাপার হচ্ছে, নানাজানের পদমর্যাদা প্রমান করার জন্য একজন সবজী বিক্রেতাকে পার্থিব জগতের অন্যতম ব্যবস্থাপক হিসেবে মেনে নিয়েছেন কিন্তু হুসাইনের নানার (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) ব্যাপারে ওদের আকীদার ভাষা হচ্ছেঃ

যার নাম মুহাম্মদ বা আলী, সে কোন কিছুর শক্তি রাখে না। (তকবিয়াতুল ঈমান ৪২ পৃঃ

বিশ্বের সমস্ত কাজকর্ম আল্লাহর ইচ্ছায় হয়ে থাকে, রসূলের ইচ্ছায় কিছুই হয় না। (তকবিয়াতুল ঈমান-৫৮ পৃঃ)

মওলভী খায়রুদ্দীন সাহেবের ঘটনা
সন্তানের আশায় শিরকী আকীদার সাথে সমঝোতা

দরসে হায়াতের লিখক স্বীয় পিতা সম্পর্কে একটি ঘটনা উদ্ধৃত পূর্বক লিখেনঃ

"শুরুতে পিতার কোন সন্তান জীবিত থাকতো না। কয়েকটি সন্তান জন্ম হয়েছিল। কিন্তু আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে গেছে। সৌভাগ্যক্রমে একজন পাঞ্জাবী

আলেম, যিনি আমল-তদবীরেও বড় পারদর্শী ছিলেন, গয়ায় তশরীফ আনেন। মাওলানা (লিখকের পিতা) সন্তান জীবিত না থাকার কথা ওনাকে বললেন।

তিনি বললেন, একটি আমল আছে, সেটা করুন। ইনশাআল্লাহ সন্তান স্বাস্থ্যবান ও জীবিত থাকবে। আমলটা হচ্ছে যখন গর্ভধারণের সময় চার মাস হবে, তখন গর্ভধারিনীর পেটের উপর কালি ছাড়া স্বীয় আঙুল দ্বারা مُحَمَّد (মুহাম্মদ) লিখে দিবেন এবং ডাক দিয়ে বলবেন- আমি তোমার নাম মুহাম্মদ রাখলাম এবং যখন শিশু জন্ম হবে, তখন ওর নাম মুহাম্মদ রাখবেন। সেমতে আমলের পর সবার আগে যে সন্তানটি জন্ম হয়ে জীবিত রয়েছে সেটা হলাম আমি কারী ফখর উদ্দীন, এ কিতাবের লিখক। (দরসে হায়াত ১৯৬ পৃঃ)

দৃষ্টির বাইরে কাউকে সম্বোধন এবং আহবান দেওবন্দী মযহাব মতে শিরক। কিন্তু সন্তানের লালসায় এখানে কোন বাঁধার সম্মূখীন হলো না যে "আমি তোমার নাম মুহাম্মদ রাখলাম" এ বাক্যাংশে অদৃশ্যকে সম্বোধন কি করে শুদ্ধ হয়ে গেল?

এবং সবচে বড় দুঃখজনক ব্যাপার হচ্ছে সেই অকৃতজ্ঞতার জন্য যে, যে বিশ্বাসের বদৌলতে জিন্দেগীর মত নেয়ামত হাতে এসেছে, সেই বিশ্বাসকে ভুল ও শিরক প্রমাণিত করার বেলায় ওদের মনে সেই নেয়ামতের কথা মোটেই স্মরণ হলো না। নিজের বেলায় এ রকম ঘটনা ঘটার পরও এটা উপলব্ধি করে না যে যখন নামের বরকতে হায়াত দান প্রমাণিত হলো, তাহলে সেই নামধারীর হস্তক্ষেপসমূহের অনুমান কি করা যেতে পারে?

হস্তক্ষেপ ও অদৃশ্য জ্ঞানের অনন্য ঘটনা

দরসে হায়াতের লিখক জ্ঞান অর্জন কালে তাঁর পিতার একটি ভ্রমন কাহিনী উদ্ধৃত করেছেন। ঘটনা বর্ণনাকারী স্বয়ং লিখকের পিতা। তিনি বর্ণনা করেন যে, আমি কয়েকজন সাথীসহ জ্ঞানার্জনের জন্য ঘর থেকে বের হলাম এবং কয়েকদিন ধরে পথ চলতে রইলামঃ

'শেষ পর্যন্ত একদিন দুপুরে আমরা একটি শহরে প্রবেশ করলাম। জানতে পারলাম যে এটা করনাল শহর। আমি জিজ্ঞাসা করে জেনে নিলাম যে, সবার আগে কোন মসজিদে যোহরের নামায হয়। সেই মসজিদে গিয়ে যোহরের নামায

জমাত সহকারে আদায় করলাম। নামাযের পর মসজিদ থেকে বের হয়ে পড়লাম যেন সহসা শহরের বাইরে চলে যেতে পারি,যাতে পথে কোন অসুবিধা না হয়।

মসজিদ সংলগ্ন বারান্দায় এক অন্ধ হাফিজ বসা ছিল। আমি যখন ওর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন তিনি বললেন, খায়রুদ্দিন, 'আসসালামু আলাইকুম' আমার কাছে এসো। বাজে কথা বলে আমার সময় নষ্ট করবে, এ ধারণা করে ওনার সেই ডাকের প্রতি কোন সাড়া দিলাম না এবং সালামের জবাব দিয়ে দ্রুত বের হয়ে গেলাম। তিনি তাঁর কয়েকজন শাগরীদকে আমার পিছ পিছ পাঠালেন যেন আমাকে ধরে নিয়ে যায়। কিন্তু ওরা আমাকে ধরতে পারলো না। আমি সবার থেকে শক্তিশালী ছিলাম। সবাইকে ধাক্কা দিয়ে দূরে ফেলে দিলাম এবং সামনে এগিয়ে চললাম।' (দরসে হায়াত ১৫৫ পৃঃ)

যে মাত্র শহরের সীমানার বাইরে পা রাখলাম, হঠাৎ জমীন আমার পা ধরে রাখলো। অনেক চেষ্টা করলাম কিন্তু পা একটুও আগে বাড়াতে পারলাম না। আমার সাথীরাও সবাই মিলে অনেক জোরে চেষ্টা করলো কিন্তু ওরাও আমার পাকে জমীনের ধরা থেকে মুক্ত করতে পারলো না। শেষ পর্যন্ত আমি বাধ্য হয়ে শহরের দিকে ফিরে আসলাম এবং ওখান থেকে সাথীদেরকে বিদায় দিলাম।

"শহরে ফিরে আসার পর সেই অন্ধ হাফেজজীর কথা স্মরণ হলো, যিনি অজ্ঞাত, অপরিচিত ও অন্ধ হওয়া সত্বেও আমাকে আমার নাম ধরে ডাকছিল। ওনার কাছে গিয়ে ব্যাপারটা জেনে নেয়া দরকার। আমি যখন ওনার কাছে পৌছলাম, তিনি জোরে হাসলেন এবং বললেন, শেষ পর্যন্ত এসে গেলে। অনেক প্রাণ পণ চেষ্টা করে পালিয়ে ছিলে। আমি ওনাকে বললাম, এ সব কথা বাদ দিন, আপনি এটা বলুন যে, আপনি আমাকে কিভাবে চিনলেন এবং আমার নাম কিভাবে জানলেন? তিনি বললেন, তোমার নাম কেন আমার কাছে তোমার চিন্তাধারাও জানা আছে যে কি উদ্দেশ্যে বের হয়েছ। তুমি কি মনে করেছ যে যেভাবে তুমি এদিকে বাঁধাপ্রাপ্ত হয়েছ, ওদিকে বাঁধাপ্রাপ্ত হবে না? তোমার বিদ্যার একটি অংশ এ শহরে অবধারিত। যতক্ষণ তুমি সেটা অর্জন করবে না, এ শহর থেকে বের হতে পারবে না।" (দরসে হায়াত -১৫৬ পৃঃ)

এ কাহিনীতে অন্ধ হাফিজের আচরণ একান্ত সুস্পষ্ট ভাবে দেওবন্দী মাযহাবকে অস্বীকার করছে। কেননা কোন অন্ধ ব্যক্তির পক্ষে কেবল পায়ের

আওয়াজ শুনে একজন অপরিচিত ব্যক্তিকে চেনা এবং ওর নাম ধরে ডাকা আর এ দাবী করা যে 'শুধু নাম নয়, তোমার চিন্তাধারা ও সফরের উদ্দেশ্যেও জানা আছে এবং তকদীরের এ লিখনটা বলে দেয়া যে এ শহরে তোমার বিদ্যার একটি অংশ অবধারিত। যে পর্যন্ত তুমি সেটা অর্জন করে নিবে না, সে পর্যন্ত এ শহর থেকে তুমি বের হতে পারবে না।' এগুলো হচ্ছে সেসব বিষয়, যে গুলো দেওবন্দী মাযহাবে কেবল খোদার জন্য স্বীকার করা হয়েছে এবং যত বড় বান্দাই হোক না কেন, ওদের বেলায় এ ধরণের বক্তব্য সমূহের বিশ্বাস রাখাকে শিরকে জলী বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে।

কোন এক ব্যক্তি ঠিকই বলেছেন্ যে দুনিযাতে খুন খারাবীর কোন কমতি নেই। কিন্তু দেওবন্দী আলেমদের প্রতি স্বীয় মাযহাবের মূলনীতিসমূহের উপর আক্রমনের বদনাম ইতিহাসের নিকৃষ্টতম বদনাম।

হস্তক্ষেপ ও অদৃশ্য জ্ঞানের আর এক অদ্ভুত ঘটনা

লিখক স্বীয় কিতাবে তাঁর পিতার এক সফরের অবস্থা বর্ণনা পূর্বক লিখেছেন যে, একবার আপন পীর মুর্শিদের সাথে দেখা করার জন্য তিনি সোয়াত যাচ্ছিলেন। সেটা সিন্দু প্রদেশের এক কিনারে অবস্থিত। মাঝপথে পাহাড়ী ও বনাঞ্চলের দীর্ঘ রাস্তা অতিক্রম করতে হতো। যেতে যেতে তিনি এক সরু গিরিপথের সামনে পৌছলেন, যেটা খুবই সরু এবং গাধায় আরোহন ব্যতীত অতিক্রম করাটা অসম্ভব ছিল। এবার এর পরবর্তী ঘটনা স্বয়ং সফরকারীর মূখেই শুনুনঃ

> আমি গাধায় আরোহন করে সামান্য পথ অতিক্রম করেছি, দেখি পাহাড় থেকে একদল ডাকাত বের হয়ে আসলো এবং আমাকে খুবই অপদস্ত করলো। আমার কাছে যা কিছু ছিল, সব নিয়ে নিল। এরপর জানের ভয় হলো। ওদের কাছে করুণার কোন নামগন্ধ ছিল না।
>
> আমি পেরেশানী অবস্থায় মাথানত করলাম এবং আমলে-বরযখ্ শেখের ধ্যান করলাম। তখন দেখি সেই জালিম ডাকাতদল আপাদমস্তক দয়া পরবশ ও সহানুভূতিশীল হয়ে থর থর করে কাঁপতেছে এবং কেউ হাতে চুমু দিচ্ছে, কেউ পায়ে চুমু দিচ্ছে। দরসে হায়াত-১৭২ পৃঃ

এরপর বর্ণনা করেছেন যে, ডাকাত দলের মধ্যে ডাকাতের সর্দারও ছিল। সে আমাকে ওর ঘরে নিয়ে গেল এবং আমার খুবই খেদমত করলো। ওরা আমার কাছে বার বার ক্ষমা চাচ্ছিল এবং স্বীকৃতি নিচ্ছিল যেন বলি আমি ওদেরকে ক্ষমা করে দিলাম। আমি বিস্মিত হয়ে ওদেরকে জিজ্ঞাসা করলাম, কি ব্যাপার, প্রথমে তোমরা আমার সাথে সেই জঘন্য আচরণটা করলে আর এখন এমন কি হয়ে গেল যে, তোমরা আমার প্রতি এত সহানুভূতিশীল হয়ে গেলে? ওরা উত্তরে বললোঃ

'হুযুর! আমরা আপনাকে প্রথমে চিনতে পারিনি। যখন আপনি চোখ বন্ধ করে মাথা নিচু করে বসে ছিলেন, তখন আমরা আপনাকে গভীরভাবে লক্ষ্য করে চিনতে পারলাম যে আপনি হযরত মিয়া সাহেব। দরসে হায়াত -১৭৩ পৃঃ

এর পর বর্ণনা করেন, বর্ণনা নয়, দেওবন্দী মাযহাবের কিতাবাদিতে আগুন লাগিয়ে দিলঃ

"তখন আমি বুঝতে পারলাম যে, শেখের ধ্যানের বরকতে হযরতের বিশেষ দৃষ্টি পতিত হয়ে আমার আকৃতি হযরত পীর মুর্শিদের আকৃতিতে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। সেটা আমি মোটেই জানতাম না ডাকাতদের বলার পর বিশ্বাস হলো। (দরসে হায়াত -১৭৩ পৃঃ)

এ পর্যন্ত রাস্তার অবস্থা বর্ণনা করা হলো, এবার পীর সাহেবের দরবারের কাহিনী শুনুন এবং অদৃশ্য ক্ষমতা ও হস্তক্ষেপের শান দেখুন। তিনি বর্ণনা করেনঃ

"হযরত আমাকে দেখে বললেন, আরে খোদার বান্দা! আসার আগে আমাকে জানালে আমি ডাকাতদলের সরদারকে খবর দিতাম। তখন কোন বিপদের সম্মুখীন হতে হতো না। এ রাস্তাটা খুবই বিপদসঙ্কুল। আল্লাহর বড় মেহেরবানী তুমি সহি সালামতে চলে এসেছ।" (দরসে হায়াত-১৭৪ পৃঃ)

এবার স্বীয় হযরতের অদৃশ্য জ্ঞানের আর এক কাহিনী শুনুন। তিনি বর্ণনা করেনঃ

(হযরত) অনেকক্ষণ থেকে অপেক্ষা করছিলেন এবং আমার জন্য খিচুরী রান্না করায়ে রাখা হয়েছিল, কেননা ওসময় আমার পেটে কিছুটা গন্ডগোল ছিল।

অথচ আমি এ ব্যাপারে কোন কিছু জানাইনি। খুবই যত্ন করে আমাকে খিচুরী খাওয়ালেন। (দরসে হায়াত-১৭৪ পৃঃ)

লক্ষ্য করুন, এ একটি ঘটনায় স্বীয় পীর সাহেব সম্পর্কে অদৃশ্য জ্ঞান ও হস্তক্ষেপের কয়টি দাবী করা হয়েছে।

প্রথম দাবী হচ্ছে, পাহাড়ী ঘাটিতে মুরীদের নীরব প্রার্থনা অনেক মাইলের দূরত্ব থেকে তিনি শুনেছেন এবং ওখানে বসেই স্বীয় আকৃতিটা মুরীদের আকৃতির উপর সংযোজন করে দিয়েছেন এবং এটা ওই সময় পর্যন্ত সংযোজিত ছিল, যতক্ষন মুরীদ তাঁর ঘর পর্যন্ত পৌঁছেনি।

দ্বিতীয় দাবী হচ্ছে, পাহাড়ী ঘাঁটিতে মুরীদের যে বিপদ হয়েছিল, অদৃশ্য ভাবে এর বিস্তারিত বিবরণ পীরের জানা হয়ে গিয়েছিল। তাই পৌছামাত্র পীর সাহেব বললেন, "আরে আল্লাহর বান্দা! আসার আগে আমাকে জানালে আমি ডাকাতদেরকে খবর দিতাম। তখন কোন বিপদের সম্মূখীন হতে হতো না।"

তৃতীয় দাবী হচ্ছে, স্বীয় অদৃশ্য জ্ঞানের বদৌলতে পীর সাহেবের কাছে এ বিষয়টাও জানা হয়ে গিয়েছিল যে আগমনকারী মুরীদের পেট খারাপ। এ জন্য আগে থেকে খিচুরী রান্না করায়ে রেখে ছিলেন।

চিন্তা করতে গেলে, চোখ রক্তলাল হয়ে যায় যে, এরা নিজেদের বুযুর্গদের ব্যাপারে যা বর্ণনা করে, তা যদি বাস্তব ঘটনা হয় এবং তাদের ঈমানী চিন্তাধারার সঠিক বিশ্লেষণ হয়, তাহলে শত বছর থেকে নবী ও ওলীগণের ব্যাপারে আকাইদের প্রশ্নে যে যুদ্ধ চালু রয়েছে, সেটার হেতু কি?

কীযে করুণ বিদ্রুপ! মুসলমানদের ভাবাবেগ নিয়ে খেল তামাশা করা হচ্ছে।

দেওবন্দী মাযহাবের ওসমস্ত লিখনি, যেগুলো কুফর ও শিরকের শাস্তি সংক্রান্ত, খানকাসমূহেতো আগে থেকেই অপছন্দনীয় ছিল। এখন যখন নিজেদের ঘরের মধ্যে অগ্রাহ্য করা হচ্ছে, তাহলে সেটাকে বলবৎ রাখার কি যুক্তি থাকতে পারে?

আমার এ প্রশ্ন দেওবন্দী জমাতের বড় ছোট সকলের কাছে রইলো। যে কেউ যদি আমাকে যুক্তি সঙ্গতঃ উত্তর দিয়ে সন্তুষ্ট করতে পারেন, আমি সারা জীবন ওর কাছে কৃতজ্ঞ থাকবো।

বাপের অদৃশ্য জ্ঞানের কাহিনী

এতক্ষণ পর্যন্ত তো অন্যদের কথা হচ্ছিল। এবার স্বয়ং লিখকের বুযুর্গ পিতার অদৃশ্য জ্ঞানের কাহিনী শুনুন। তিনি লিখেনঃ

> আমার ছোট ভাই কারী শরফুদ্দীন বর্ণনা করেছেন, মাওলানা ওযু করে জায়নামাযে উভয় হাত কান পর্যন্ত উঠায়ে ছিলেন; আমি নামাযের প্রস্তুতির পরিবর্তে এভেবে ওনার পিছনে খেলায় মশগুল হয়ে গেলাম যে, এখনতো তিনি তকবীর তাহরীমা বলে দীর্ঘক্ষণ নামাযে নিয়োজিত থাকবেন এবং আমার খেলার খবর থাকবে না। কিন্তু ওনার সঙ্গে সঙ্গে কাশফ হয়ে গেল এবং হঠাৎ কান থেকে হাত সরায়ে পিছনে ফিরে দেখলেন এবং আমাকে জোরে বকুনি দিলেন।'' (দরসে হায়াত –২২৬ পৃঃ)

এ ঘটনায় অতিবিশ্বাসের ধরণটা দেখুন যে তকবীর তাহরীমা বলার সময় পিছনে ফিরে দেখাটা ঘটনাক্রমেও হতে পারে এবং কাতার সোজা হলো কিনা, তা দেখার উদ্দেশ্যও হতে পারে। কিন্তু লিখকের জোর দাবী হলো, আমার পিতা কেবল এজন্য পিছে ফিরে দেখলো যে, তিনি অদৃশ্য উপলব্ধি ক্ষমতা বলে এটা জেনে নিয়েছিলেন যে পিছনের কাতারে আমার ভাই খেলতেছিল।

বাপের অদৃশ্য জ্ঞানের প্রমাণ করার জন্য এখানে যে দৃঢ় বিশ্বাসটা রয়েছে, যদি এর হাজার ভাগের এক ভাগও রসূলে আরবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর বেলায় থাকতো, তাহলে আকীদাগত এ মতভেদ, যেটা উম্মতে মুহাম্মদীকে দু'ভাগ করে রেখেছে, কক্ষণো সৃষ্টি হতো না।

শত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সত্বেও দেওবন্দী কিতাবাদির মাধ্যমে এ বাস্তবটা এখন এত সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, সমাজের ন্যায় পরায়ন ব্যক্তিরা এ করুণ অবস্থার জন্য বিচলিত না হয়ে থাকতে পারে না।

একটি কথার বিশ্লেষণ এ কিতাবে দেওবন্দী জমাতের বিতাবের উদ্ধৃতি দিয়ে কাশফের কথা বারবার বলা হয়েছে। এ জন্য আমি এখানে সুস্পষ্ট করে দিতে চাই যে দেওবন্দী মাযহাবে কাশফের দাবী কতটুকু বৈধ?

এর জন্য দেওবন্দী মাযহাবের ইলহামী কিতাব তকবিয়াতুল ঈমানের এ ফরমানটা অবলোকন করুনঃ

"এ আয়াত থেকে বুঝা গেল যে, এরা সব, যারা অদৃশ্য জ্ঞানের দাবী করে, কেউ কাশফের দাবী করে, কেউ ইস্তেখারার আমল শিখায়, এসব মিথ্যা এবং ধোঁকাবাজী। ওদের এ ফাঁদে কক্ষণো না পড়া চায়। (তকবিয়াতুল ঈমান-২৩ পৃঃ)

তকবিয়াতুল ঈমানের এ নির্দেশনার পর দেওবন্দী সম্প্রদায়ের কোন ব্যক্তি যদি নিজের বা আপন কোন বুযুর্গের বেলায় কাশফের দাবী করে, তাহলে এখন ওর সম্পর্কে এটা ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে যে, সে মিথ্যুক। ধোঁকাবাজ, ওর ফাঁদে কক্ষনো না পড়া চায়।

মাওলানা বেশারত করীমের ঘটনাবলী

(১) খোদায়ী ইখতিয়ারের কাহিনী

মাওলানা করীম বিহার প্রদেশের অন্তর্গত মোজাফ্ফর পুর জিলার গডহোল নামে এক গ্রামের অধিবাসী। দরসে হায়াত এর লিখক স্বীয় উস্তাদ ও একজন বিশিষ্ট বুযুর্গ হিসেবে একান্ত আন্তরিকতার সাথে তাঁর জীবনীর উপর আলোকপাত করেন।

তাঁর দরবারে একজন স্থায়ী অবস্থানরত পন্ডিত সম্পর্কে এক অদ্ভুত ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে, যা পড়ার মত। পন্ডিত মশাই কোন এক কামিল মুর্শিদের সন্ধানে এদিক সেদিক ঘুরাফেরা করতেছিল। হঠাৎ এক মজযুব মহিলার সাথে ওনার দেখা হলো। মহিলাটি ওনাকে গডহোলের কথা বললো 'ওখানে যাও, ওখানে তোমার ব্যথার ঔষধ আছে।' তখন তিনি রাস্তার ঠিকানা নিয়ে গডহোলের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে গেলেন। পরবর্তী ঘটনা স্বয়ং লিখকের মুখেই শুনুনঃ

দ্বিপ্রহরের সময় ছিল এবং গরম কাল ছিল। তিনি গেয়ারা ষ্টেশন থেকে হেটে গডহোল যাচ্ছিলেন। গরমের কালে দ্বিপ্রহরের সময় প্রায় লোকেরা ঘরে অবস্থান করে। রাস্তা দিয়ে যাবার সময় লোকের সাক্ষাৎ মিলে না। তিনি কয়েক জায়গায়

পথ হারিয়েছিল কিন্তু প্রত্যেক জায়গায় একই আকৃতির এক ব্যক্তি আবির্ভাব হয়ে পথ দেখিয়ে দিয়েছেন। (দরসে হায়াত ২৯৯ পৃঃ)

এবার এর পরের ঘটনা শুনুন। বর্ণনার এ অংশে মুর্শিদে কামিলের হস্তক্ষেপ ও অদৃশ্য জ্ঞানের খোদায়ী ক্ষমতার কথা বিশেষ ভাবে অনুধাবন করার মত। তিনি বলেনঃ

"যখন গডহোল পৌঁছলেন এবং হযরতের উজ্জ্বল চেহারার উপর দৃষ্টি পড়লো, তখন দেখলেন যে, এতো সেই ব্যক্তি, যিনি রাস্তায় কয়েক জায়গায় আবির্ভূত হয়ে পথ দেখিয়েছিলেন। আস্থা বেড়ে গেল। কোন চিন্তাভাবনা ছাড়াই আরয করলেন–মহারাজ, আমার প্রতি রহম করুন এবং আমাকে পথ প্রদর্শন করুন'' (দরসে হায়াত–৩০০ পৃঃ)

আলোচনার এ অংশে অনুরাগ ও মনমানসিকতার কথা সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশ পায়। মনুষ্য স্বভাবের এ রহস্যটা যদি বুঝে আসে যায়, তাহলে দৃষ্টির সামনে অগণিত আবরণ অনায়াসে অপসারিত হয়ে যাবেঃ

"হযরত জিজ্ঞাসা করলেন, কি ব্যাপার? কি চাও? আরয করলেন, গডহোল আসার সময় যেখানে রাস্তা হারিয়েছি, সেখানে আপনি আবির্ভাব হয়ে রাস্তা দেখিয়েছেন। আর এখন আপনি জিজ্ঞাসা করছেন যে আমি কি চাই? আমি কি চাই, আপনিতো সব কিছু জানেন। (দরসে হায়াত–৩০০ পৃঃ)

এ ঘটনাটি শুনার পর প্রত্যেক নিরপেক্ষ ব্যক্তির মনে নিম্নে বর্ণিত প্রশ্নগুলো উদিত হয়।

প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে, যদি হযরত অদৃশ্য জ্ঞানী না হতেন, তাহলে ঘরে বসে ওনার কীভাবে জানা হয়ে গেল যে একজন যোগী আমার দরবারে আসার সময় পথ ভুলে গেছে, গিয়ে ওকে পথ দেখিয়ে দেয়া দরকার।

দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, পথ ভুলে যাবার ঘটনাটা কয়েকবার হয়েছে এবং প্রত্যেকবার তিনি সে জায়গায় পৌঁছে গেছেন, যেখানে পথ হারিয়ে ফেলেছিল। মোট কথা উনি স্বীয় খানকায় বসে যোগীর প্রতিটি নড়াচড়া অবলোকন করছিলেন এবং যেখানে প্রয়োজন মনে করেছেন, সঙ্গে সঙ্গে সেখানে পৌঁছে পথ দেখিয়েছেন।

তৃতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, পথ দেখানোর জন্য রোগীর সামনে একই আকৃতিতে যে ব্যক্তি বার বার আবির্ভূত হয়েছিল, উনি কে ছিল? সেটা কি স্বয়ং হযরত ছিল, নাকি অন্য কেউ? যদি সেই ব্যক্তি স্বয়ং হযরত ছিল, তাহলে বিদ্যুৎ গতিতে এ দ্রুত গমন ওনার কি করে সম্ভব হলো যে মুসাফির পথে থাকতেই কয়েকবার আসা যাওয়া করলো। যদি সেই ব্যক্তি হযরত না হয়ে অন্য কেউ ছিল, তাহলে হযরতের অনুরূপ দ্বিতীয় অস্থিত্ব কার হস্তক্ষেপের পরিণাম ছিল?

চতুর্থ প্রশ্ন হচ্ছে, যোগী যখন বললো, মহারাজ, গডহোল আসার পথে যেখানেই আমি পথ হারিয়েছি, আপনি আবির্ভূত হয়ে পথ দেখিয়েছেন। এর পরেও আপনি জিজ্ঞাসা করতেছেন যে, আমি কি চাই। আমি কি চাই, আপনিতো সব জানেন, তখন তিনি কথার কথা হিসেবেও এটা বলেন নি যে, ইসলামে কোন মখলুকের বেলায় এ রকম আকীদা রাখা শিরক, এটা কেবল আল্লাহরই হক। যখন আমরা পয়গম্বরের বেলায় এরকম বিশ্বাস রাখাকে ভ্রান্ত মনে করি, তখন আমার বেলায় এ বিশ্বাস কি করে সঠিক হতে পারে?

এ প্রশ্নগুলোর উত্তরের ব্যাপারে আপনাদের বিবেকের সুবিচার কামনা করি।

(২) অদৃশ্য অবলোকনের আর এবং অদ্ভুত কাহিনী

দরসে হায়াতের লিখক স্বীয় হযরতের অদৃশ্য উপলব্ধি ক্ষমতার প্রতি আস্থা জ্ঞাপন পূর্বক তাঁর পিতার বরাত দিয়ে একটি ঘটনা উদ্ধৃত করেছেনঃ

"মরহুম আব্বাজান একবার বলেছিলেন যে, হযরত মাওলানা বেশারত করীম সাহেব বলতেন যে, আমি অনেকবার আপনার কলবের প্রতি দৃষ্টিপাত করেছি, তখন একে আপনার শেখের তওয়াজজুতে ভরপুর পেয়েছি। আপনার শেখের পূর্ণ হস্তক্ষেপ আপনার কলবের উপর এবং আপনার কলবের পূর্ণ সম্পর্ক শেখের সাথে।

সুবহানাল্লাহ! এ ঘটনাটা কলব সমূহে কাশফের কী আশ্চর্যকর উদাহরণ! (দরসে হায়াত -৩৩২ পৃঃ)

বাহবা দিন সেই দৃষ্টি শক্তিকে, যেটা বুকের এক দিকে ছিদ্র করে মুরীদের কলব পর্যন্ত গিয়ে পৌছে এবং কলবের অভ্যন্তরস্থ সব কিছু দেখে নেয়, অন্যদিকে অনবরতঃ অদৃশ্যে তওয়াজজু দৃষ্টিগোচর হয়েছে, যা অনেক মাইল দূর থেকে

শেখের কলবের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল। আরও মজার ব্যাপার হলো দৃষ্টিপাতের এ ঘটনা শুধু একবার সংঘটিত হয়নি, যাকে দৈব ঘটনা বলে উড়িয়ে দেয়া যেত। বরং সুস্পষ্ট বর্ণনা মুতাবিক অনেকবার এ রকম হয়েছে এবং যখন ইচ্ছে করেছে তখনহয়েছে।

আল্লাহ থেকে পানা! অতি বিশ্বাসের প্রভাব কত যে মারাত্মক যে একজন সাধারণ উম্মতের জন্য মূখ ও কলমের এ স্বীকৃতি। অথচ রসূলে আনোয়ার (সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর বেলায় ওরা সবাই একমত যে, তাঁর দৃষ্টি শক্তি দেয়ালের পিছনের জিনিষও দেখতে পেতেন না।

(৩) এক মজযুবের অদ্ভুত কাহিনী

দরসে হায়াতের লিখক স্বীয় এক ছাত্র বন্ধুর বরাত দিয়ে এক মজযুবের কাহিনী বর্ণনা করেছেন। তিনি লিখেন যে মোজাফ্‌ফর পুর জিলার জংগ রোডে তাঁর ছাত্রবন্ধুর বাড়ীর পাশে এক মজযুব বাস করতো। ওর সাথে ওনার ভাল সম্পর্ক ছিল। একদিন রাত্রিবেলা সে প্রস্রাব করার জন্য ঘর থেকে বের হলে দেখলো যে, ওর সামনে দিয়ে সেই মজযুব যাচ্ছিল। সেও ওর পিছু নিল। আবাসিক এলাকা থেকে বের হয়ে কিছুদুর যাবার পর মজযুব দাঁড়িয়ে গেল এবং গডহোলের দিকে মূখ করে বলতে লাগলোঃ

> আরে দেখ! ওদিকে দেখ! ওটা দেখ! গডহোলে মাওলানা বেশারত করীম সাহেব যিকর করতেছেন এবং ওনার ঘরে নুরের বারিধারা বর্ষিত হচ্ছে এবং ওনার ঘর থেকে আরশ পর্যন্ত শুধু নুর আর নুর। দরসে হায়াত–৩৪২ পৃঃ

একে মজযুবের পাগলামী বলে উড়ায়ে দিলেও সেই দেওবন্দী বুদ্ধিজীবীদের বেলায় কি বলা যাবে, যারা পূর্ণ আস্থা সহকারে এর প্রতিটি শব্দ স্বীকার করে নিয়েছে।যেমন

> আল্লাহ! আল্লাহ! এটা হচ্ছে যিকর আর ইনি হচ্ছেন যিকরকারী, যার নূর কেবল কোন চক্ষুস্মান ব্যক্তি দেখতে পান। শুধু নিকট থেকে নয় বরং আট/নয় মাইল দূর থেকে এভাবে দেখতে পান, যেভাবে কোন দৃশ্যমান জিনিষকে একান্ত নিকট থেকে কেউ দেখতেছে। দরসে হায়াত ৩৪২ পৃঃ

এখানেও আপনাদের ন্যায় বিচার কামনা করি যে হুযূর (আলাইহিস সালাম) এর বেলায় দেয়ালের পিছনের জ্ঞানটা এখনও দেওবন্দী বুদ্ধিজীবীদের বিশ্বাস হয় না। অথচ একজন মজযুবের বেলায় ওদের ধ্যান ধারনা দেখুন, নয় মাইল দূর থেকে অন্ধকার রাতে ফরশ থেকে আরশ পর্যন্ত অদৃশ্য নূর ও আলোকছটা সে এমনভাবে দেখতেছে যেমন কোন দৃশ্যমান জিনিষকে খুবই নিকট থেকে কেউ দেখতেছে। মাঝখানের আবরণ ওর দৃষ্টিতে কোন বাঁধা সৃষ্টি করলো না এবং রাতের অন্ধকারও প্রতিবন্ধক হলো না।

দেওবন্দীদের অদ্ভুত মন মানসকিতার জন্য আশ্চর্য লাগে যে, অদৃশ্য উপলব্ধি জ্ঞানের যে ক্ষমতা ওরা সাধারণ এক নগণ্য উম্মতের বেলায় স্বীকার করে, সেটা স্বীয় রসুলের বেলায় স্বীকার করতে গেলে ওদের কাছে শিরকের গন্ধ লাগে।

দেওবন্দীদের এ পক্ষপাত মূলক চিন্তাধারা থেকে আমরা সুস্পষ্ট ভাবে উপলব্ধি করতে পারি যে, ওদের মধ্যে আপন পরের যে বৈষম্যমূলক চিন্তাধারা বিরাজমান, তা ওদের কাজকর্ম ও ঘটনাবলীতেই প্রকাশ পায়।

(৪) আকীদা সমূহের রক্তপাত

মওলভী আবদুর শাকুর নামে কোন এক মওলভী মাদ্রাসায়ে শামসুল হুদা পাটনায় শিক্ষকতা করতেন। তিনি মাওলানা বেশারত করীম সাহেবের বিশিষ্ট মুরীদদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে দরসে হায়াতের লিখক লিখেছেন যে তিনি একবার স্বীয় শেখের দরবারে এ ধারণা নিয়ে রওয়ানা হলেন যে, হযরত থেকে জিজ্ঞাসা করবো যে অনেক বুযুর্গদের বেলায় শুনা যায় যে, ওনারা নাকি একই সময় কয়েক জায়গায় উপস্থিত হয়ে যেতেন। এটা কতটুকু সত্য? এখন এর পরের ঘটনা স্বয়ং মুরীদের মুখেই শুনুনঃ

"যখন (ওখানে) পৌছলাম, তখন নামাযের সময় হয়েছিল। ওসময় স্বয়ং হযরত নামায পড়াতেন ।আমিও জমাতে শরীক হলাম। নামায শুরু হবার সাথে সাথে আমার মধ্যে একটি ভাবাবেগের সৃষ্টি হলো এবং আমি দেখলাম যে, এক অনেক বড় ময়দান এবং সেই বিস্তৃত ময়দানের সবখানে বিভিন্ন জমাতে কাতারবন্দি হয়ে নামাযে নিয়োজিত এবং প্রত্যেক জামাতের ইমাম হযরত সাহেব এবং প্রত্যেক জমাতের মুক্তাদীও ওরাই, যারা সেই জমাতে ছিল, যে জমাতে আমিও শামিল হয়ে হযরতের পিছনে নামায পড়ছিলাম।

এটা দেখার পর চোখের সামনে থেকে পর্দা সরে গেল এবং আমার প্রশ্নের জবাব আমি পেয়ে গেলাম এবং সব সন্দেহের অবসান হলো। হযরতের রূহানী হস্তক্ষেপ দ্বারা এমনভাবে দেখিয়ে দিলেন যে, হযরতের কাছে জিজ্ঞাসা করার ও বুঝার প্রয়োজন হলো না। (দরসে হায়াত ৩৫৪ পঃ)

আমার মধ্যে একটি ভাবাবেগের সৃষ্টি হলো"-এর অর্থ ঘুম নয় যে এ ঘটনাকে স্বপ্ন বলে চালিয়ে দেয়া যেত বরং জাগ্রতাবস্থায় তিনি অদৃশ্য হস্তক্ষেপের এ কারামতি দেখলেন।

এ ঘটনায় একদিকে এ হযরতের অদৃশ্য উপলব্ধি ক্ষমতার বাহাদুরী দেখুন যে, নামাযরত অবস্থায় তিনি স্বীয় মুরীদের সেই ধারণা পর্যন্ত জেনে নিলেন, যেটা সে মনে ধারণ করে এসেছিল এবং সাথে সাথে এটাও জেনে নিলেন যে, সেই মুরীদ তাঁর পিছনের কাতারে দাঁড়িয়েছে। অন্য দিকে হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতা দেখুন যে, নামায শুরু হতেই রহস্যময় দৃশ্যের মত তিনি স্বীয় মুরীদকে একটি ময়দানে পৌছিয়ে দিলেন এবং ওখানে পরিস্কার ভাবে দেখায়ে দিলেন যে, একই ব্যক্তি একই সময় বিভিন্ন জায়গায় উপস্থিত হতে পারেন।

এ ঘটনা যদি সত্য হয়, তাহলে আমি বলতে চাই যে দেওবন্দী মাযহাবের মিথ্যা ফাঁস করার এখন আর কোন নতুন কিতাবের প্রয়োজন হবে না। এ খেদমতের জন্য স্বয়ং দেওবন্দী লিখকগণই যথেষ্ট।

(৫) আর এক বিস্ময়কর কাহিনী

দরসে হায়াতের লিখক এক নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীর উদ্ধৃতি দিয়ে সেই পন্ডিতের সম্পর্কে এক বিস্ময়কর কাহিনী বর্ণনা করেছেন। সেই বর্ণনাকারীর বর্ণনা মতে হযরতের খাস হুজরায় আমি ও পন্ডিতজী ব্যতীত অন্যদের অবাধে প্রবেশাধিকার ছিল না। বর্ণনাকারী বলেন, একদিন মগরিবের পর স্বীয় খাস হুজরায় হযরত কুরআন তিলাওয়াত করছিলেন, এক কোণায় পন্ডিতজী মুরাকাবা রত ছিলেন এবং অন্য কোণায় আমি বসা ছিলাম। হঠাৎ পন্ডিতজী চিৎকার দিয়ে উঠলেন, অতঃপর কাঁপতে কাঁপতে বেহুঁস হয়ে গেলেন। হযরত তিলাওয়াত বন্ধ করে ওর দিকে তাকালেন। যখন হুঁস ফিরে আসলো, তখন জিজ্ঞাসা করলেন, কি ব্যাপার? কি দেখেছ? 'কি দেখেছে, এর বিস্তারিত বিবরণ স্বয়ং বর্ণনাকারীর মূখে শুনুনঃ

"পন্ডিতজী আরয করলেন, হুযূর, আমি দেখলাম যে কিয়ামত সংঘটিত হচ্ছে, হাশরের ময়দানে আল্লাহ তাআলা আরশের উপর আসীন আছেন, হিসেব নিকেশ হচ্ছে, সৃষ্টিকূলের সীমাহীন কোলাহল। আপনিও উপস্থিত আছেন। আমিও উপস্থিত আছি। আপনি আমাকে ধরে আরশে ইলাহীর দিকে অগ্রসর হলেন। যখন কাছে গেলেন, আপনি আমাকে দু'হাতে উঠায়ে আরশে ইলাহীর দিকে ঠেলে দিলেন। আমি হক তাআলার শান ও জালালিয়াত দেখে ভয়ে চিৎকার দিয়ে উঠলাম।" (দরসে হায়াত-৩০৪)

এটাতো পন্ডিতজীর প্রত্যক্ষদর্শন। কিন্তু হযরত যে শব্দসমূহ দ্বারা এর প্রত্যায়ন করেছেন, সেটাও পড়ার মত। বর্ণনাকারী বলেনঃ

"হযরত এটা শুনে তাঁর নিয়মমাফিক কিছুক্ষণ নিশ্চুপ রইলেন। এরপর ঠান্ডা নিশ্বাস নিয়ে বললেন, ধন্যবাদ নূরুল্লাহ! (পন্ডিতজীর নাম) এর থেকে বেশী আর কি চাও। (দরসে হায়াত ৩০৪ পৃঃ)

নও মুসলিম পন্ডিতের আধ্যাত্মিক মর্যাদাতো ঠিকই আছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঘটনার সম্পূর্ণ কৃতিত্ব হযরতেরই পাওয়া চায়, যার ফয়জের বরকতে এক নওমুসলিম পন্ডিতকে অদৃশ্য জ্ঞানী করে দিয়েছে। এমনকি অদৃশ্যের অদৃশ্য খোদার সত্বাও ওর দৃষ্টির অগোচরে থাকেনি, যেটা জাগ্রতাবস্থায় আজ পর্যন্ত কেউ দেখেননি।

এখন আপনারাই বিচার করুন যে এমন একটা সুস্পষ্ট শিরক দেওবন্দী মহারথীরা হজম করে ফেললো এবং এ ব্যাপারে কেউ উচ্চবাচ্য করলো না। কিন্তু আমরা যখন ঈমানী জযবা দেখাই, তখন আমাদের হত্যার পরিকল্পনা করা হয়।

(৬) হযরতের কবরের আশ্চর্যজনক ও অদ্ভুত ঘটনাবলী

এতক্ষণতো আপনারা হযরতের বাহ্যিক জিন্দেগীর কাহিনী শুনছিলেন, এবার তাঁর মৃত্যুর পরের দু'টি কাহিনী শুনুন। দরসে হায়াতের লিখক তাঁর কবরের অবস্থা বর্ণনা পূর্বক লিখেন।

'মৃত্যুর পর অনেক দিন পর্যন্ত মাযার শরীফে লোকের সমাগম ছিল। লোকেরা পানি, তৈল, লবন ইত্যাদি কবরের পাশে নিয়ে রেখে দিত এবং

কিছুক্ষণ পর উঠায়ে নিত। এতে অনেক লোকের উপকার হতো।'' দরসে হায়াত ৩৫৭ পৃঃ

এতো হলো সাহেবে কবরের প্রভাব। কবরের মাটির প্রভাব দেখুনঃ

"মৃতুর পর যে সব লোকেরা মাযারে আসতো, ওরা পানি ইত্যাদি রাখতো। পরে ফুঁক দেয়ার আবেদন করে কিছু কিছু মাটিও প্রত্যেকে নিয়ে যেতে লাগলো। ফলে কয়েকদিন পর পর মাযার শরীফে নতুন মাটি দেয়ার প্রয়োজন হতো। মাওলানা আয়ুব সাহেব মরহুম (হযরতের ছেলে) বেশ কিছু দিন পর্যন্ত মাটি কম হয়ে গেলে, নতুন মাটি দ্বারা ভরাট করে দিতেন।' দরসে হায়াত -৩৫৮ পৃঃ

মাটি দিতে দিতে যখন তিনি অতিষ্ট হয়ে গেলেন এবং এটা তাঁর জন্য একটা বিরাট বোঝায় পরিণত হলো, তখন তিনি একদিন মাযার শরীফে গিয়ে একান্ত সম্মান পূর্বক আরয করলেনঃ

"হযরত! জিন্দেগীতে আপনিতো খুবই কঠোর ছিলেন কিন্তু এখন মাযার শরীফে এগুলো কি হচ্ছে! এবার আমি শেষ বারের মত মাটি দিচ্ছি। এর পরে যদি গর্তও হয়ে যায়, আমি আর মাটি দেব না। এ অবস্থা বন্ধ করে দিন। (দরসে হায়াত-৩৫৮ পৃঃ)

কলিজার টুকরা আক্ষেপ করে বলেছিল। তাই শেষ পর্যন্ত সাড়া দিতে হলো। অগণিত আশাবাদীদের আশা বিফল করলেন কিন্তু ছেলের মন ভাংতে পারলেন না।

"এরপর কেউ মাটি নিয়ে যায়নি। স্থায়ী ভাবে সেই রেওয়াজ বন্ধ হয়ে গেল। এর পর আর কখনো মাটি দেয়ার প্রয়োজন হয়নি এবং কারো মনে মাযারের পাশে পানি, তৈল, লবন ইত্যাদি রেখে ফুঁক লওয়ার ধারণাও সৃষ্টি হলো না এবং সেই প্রচলনটাও বন্ধ হয়ে গেল।'' (দরসে হায়াত-৩৫৮ পৃঃ)

সাহেবযাদা যা কিছু বলেছিলেন, তা সাহেবে মাযারকে বলেছিলেন। আগমনকারীদের আনাগোনা হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাওয়াটাও সাহেবে মাযারের প্রভাব। তাই স্বীকার করতেই হবে যে এটা সাহেবে মাযারের হস্তক্ষেপ ছিল যে যখন চেয়েছেন, লোকদের সমাগম হয়েছে এবং যখন অনিহা প্রকাশ করেছেন, আনাগোনা বন্ধ হয়ে গেছে। যেন হাজত প্রার্থনাকারীদের আত্মাসমূহ ওদের

বুকসমূহে নয় বরং সাহেবে মাযারের হাতের মুঠেই। যখন বন্ধ ছিল সবাই সমবেত হতো এবং যখন খুলে দিল, সবাই চলে গেল।

এ ঘটনার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টের বেলায় আপনাদের বিবেকের কাছে ন্যায় বিচার কামনা করি।

প্রথম পয়েন্ট হচ্ছে, কবরের মধ্যে যদি বিচরণকারী ক্ষমতাবান ও ফয়েজদানকারীর কোন অস্থিত্ব না থাকতো, তাহলে সাহেবযাদা কাকে সম্বোধন করেছিলেন এবং কার কাছে আবেদন করেছিলেন এবং কার হস্তক্ষেপে হাজত প্রার্থীদের আনাগোনা হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল?

দ্বিতীয় পয়েন্ট হচ্ছে, মাযারের আশেপাশে সাহেবে মাযারের সম্পর্কের প্রভাব যদি ফলদায়ক না হতো, তাহলে কবরের মাটি এবং এর পাশে রক্ষিত তৈল ও পানির দ্বারা অধিকাংশ লোকের ফায়দা কি করে হতো?

তৃতীয় পয়েন্ট হচ্ছে, সাহেবে মাযার স্বীয় হস্তক্ষেপের ক্ষমতা বলে যে প্রচলনটা বন্ধ করে দিল, সেটা কি শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকেও কাম্য ছিল কিনা? যদি কাম্য ছিল, তাহলে এ অভিযোগের কি জবাব হবে যে শরীয়তের কারণে তো বন্ধ করা হয়নি বরং সাহেবযাদার আবেদনে বন্ধ করা হয়েছে।

চতুর্থ পয়েন্ট হচ্ছে, স্বীয় জিন্দেগীতে সাহেবে মাযারের যখন এটা অপছন্দ ছিল, তাহলে মৃত্যুর পর কি করে পছন্দ হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত ওখানে গিয়ে কোন্ সত্যের সন্ধান পেলেন, যার কারণে আকীদা পরিবর্তন করে ফেললেন এবং যে রীতির বিরুদ্ধে সারা জীবন সংগ্রাম করলেন, মৃত্যুর পর ওটার সাথে আপোষ করতে হলো।

পঞ্চম পয়েন্ট হচ্ছে, সাহেবযাদা ও অনুসারীদের যদি একথাটি আগ থেকে জানা ছিল যে শরীয়ত বিরোধী হওয়ার কারনে হাজত প্রার্থীদের এ সমাগম সাহেবে মাযারের পছন্দ নয়, তাহলে ওনারা দ্বীনি জযবার বলে বলিয়ান হয়ে প্রথম থেকে কেন বাঁধা দেননি? যখন মাটি দিতে দিতে অতিষ্ট হয়ে গেলেন, তখনই বাঁধা দেয়ার ধারণা সৃষ্টি হলো এবং সেই বাঁধাটাও তাঁরা নিজেরা দেন নি বরং সাহেবে মাযারের কাছে আবেদন করেছেন যেন তিনি বন্ধ করে দেন।

ষষ্ঠ পয়েন্ট হচ্ছে, সাহেবযাদার অনুরোধে যেই হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতা বলে সাহেবে মাযার এ প্রচলন বন্ধ করে দিলেন, সেই ক্ষমতা অন্যান্য সাহেবে

মাযায়েরও আছে কি না? যদি থাকে, তাহলে বাঁধা দেয়ার ক্ষমতা থাকা সত্বেও যেহেতু ওনারা বাঁধা দেন না, সেহেতু এর থেকে বুঝা যায় ওনারা এসব কাজ সুনযরে দেখেন এবং যখন নেকবান্দাদের সবাই এটা পছন্দ করেন, তাহলে আল্লাহ ও রসূলের কাছেও অপছন্দ হওয়ার কোন কারণ নেই।

(৭) মৃত্যুর পর অদৃশ্য উপর্লব্ধি ক্ষমতার আর একটি কাহিনী

দরসে হায়াতের লিখক হযরতের মৃত্যুর পরের আরও একটি কাহিনী বর্ণনা করেছেন, তিনি লিখেন যে হযরতের অনুসারী ঐক ব্যক্তি একটি কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়!

> যখন সব রকমের চিকিৎসা করে নিরাশ হয়ে গেল তখন একদিন হযরতকে স্বপ্ন দেখলেন। তিনি বলছেন, সালমানকে (হযরতের ছেলে) গিয়ে বল যে হোমিওপ্যাথির অমুক নম্বরের অমুক ওষুধটা যেন দেয়।
>
> সে সকালে ঘুম থেকে উঠে সালমান বাবুর কাছে গেলেন এবং নিজের রোগের কথা বললো। তিনি ইউনানীর সাথে হোমিও চিকিৎসাও করতেন। তিনি উঠে আলমারী থেকে সেই নম্বরের ওষুধটা বের করে দিলেন, যেটার কথা হযরত বলছিলেন, অথচ সে তখনও স্বপ্নের কথা বলেনি। (দরসে হায়াত-৩৬২ পৃঃ)

মৃত্যুর পরও যদি হযরতের অদৃশ্য উপলব্ধি ক্ষমতার জ্ঞান অর্জিত না থাকতো, তাহলে তিনি কবরে শুইয়ে শুইয়ে কি করে জানতে পারলেন যে, আমার অমুক মুরীদ কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়েছে। এটাও জেনে নিয়েছে যে ওর অমুক রোগ হয়েছে এবং সে চিকিৎসা থেকে নিরাশও হয়ে গেছে এবং এও জেনে নিয়েছে যে হোমিওপ্যাথিতে এর ওষুধ এটা এবং এত নম্বরের। অথচ তিনি কখনও হোমিও ডাক্তার ছিলেন না।

সাথে সাথে হস্তক্ষেপের এ ক্ষমতাও দেখুন যে তিনি স্বপ্নে স্বীয় মুরীদের কাছে তশরীফও এনেছেন এবং পরামর্শও দিয়ে গেছেন যে সালমান বাবু থেকে অমুক নম্বরের অমুক ওষুধটি সংগ্রহ করে নিও।

দুনিয়াতে যদি এখনও বিচার আচার থাকে, তাহলে ন্যায় বিচার কারীগণ এর নিশ্চয় ফয়সালা করবেন যে, যখন নিজেদের ওফাত প্রাপ্ত বুযুর্গদের বেলায় দেওবন্দীদের আকীদা হচ্ছে ওনারা জীবিত, ক্ষমতাবান এবং সব রকমের

হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতা রাখেন, তাহলে নবী ও ওলীগণের বেলায় সেই আকীদার প্রশ্নে ওরা আমাদের সাথে শত বছর যাবত কেন ঝগড়া করে আসতেছে, ওদের প্রকাশনী বিষোদগীর করতেছে এবং ওদের বক্তাগণ আমাদের প্রতি কেন অগ্নিবান নিক্ষেপ করতেছে? কেন আমাদেরকে ওরা কবর পূজারী ও শিরককারী বলে থাকে? আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আজ নয়তো কাল, ওদের ইসলামের মুখোশ ও তাওহীদবাদীতার ভোজবাজী ফাঁস হয়ে যাবে এবং দীর্ঘ দিন এরা সজাগ দুনিয়াকে বিমোহিত করে রাখতে পারবে না।

বিবেকের রায়

কিতাবের উপসংহারে এখন আমি আপনাদের বিবেকের এমন সুস্পষ্ট রায় কামনা করি, যেটা বাহ্যিক কোন চাপের প্রভাবে প্রভাবান্বিত না হয়ে কেবল ইনসাফ ও সততা ভিত্তিক হওয়া চায়।

আগের পৃষ্ঠাসমূহে দেওবন্দী বুযুর্গদের যে ঘটনাবলী ও অবস্থাদি আপনারা পড়েছেন, যেগুলোর বর্ণনাকারীও যেহেতু দেওবন্দী আলেমগণ, সেহেতু এ অভিযোগ অস্বীকার করার উপায় নেই যে, যে আকীদাসমূহকে এরা নবী ও ওলীদের বেলায় শিরক সাব্যস্ত করে, ওগুলোকে স্বীয় ঘরের বুযুর্গদের বেলায় কি করে জায়েয মেনে নিল? এবং সেটাও কেবল কোন এক আধজনের বেলায় নয়, যেটাকে ভুলবশত বা মুদ্রণগত ভুল বলে ধরে নিতে পারতাম, কিন্তু হযরত শাহ ইমদাদুল্লাহ সাহেব থেকে শুরু করে মওলভী সৈয়দ আহমদ বেরলভী, শাহ ইসমাইল দেহলভী শাহ আবদুল কাদের দেহলভী, মওলভী মুহাম্মদ ইয়াকুব সাহেব, মওলভী কাসেম নানুতুবী, মওলভী রশীদ আহমদ গাঙুহী, মওলভী মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী, মওলভী আশরাফ আলী সাহেব থানবী এবং মওলভী হুসাইন আহমদ মদনী পর্যন্ত সমস্ত দেওবন্দী মুরব্বীদের সম্পর্কে একই রকমের ঘটনাবলীর পুনরাবৃতি করা হয়েছে, যার ফলে আমরা এটা চিন্তা করতে বাধ্য হয়েছি যে যেভাবে এরা নবীগণের হক অস্বীকার করার বেলায় একমত ছিল, অবিকল সেই রকম ওদের ঘরের বুযুর্গদের বেলায় স্বীকার ও প্রমান করার প্রশ্নেও সবাই একমত। ওখানেও কলমের ভুল ছিল না এবং এখানেও কোন ভুল হয়নি।

এখন এটা একটা পৃথক প্রশ্ন যে একই রকমের আকীদাসমূহকে এরা নবীগণের বেলায় শিরক সাব্যস্ত করেছে এবং ওনাদের বেলায় অস্বীকার করেছে। অথচ সেই একই আকীদাসমূহকে নিজেদের বুযুর্গদের বেলায় জায়েয বলে প্রমাণিত করেছে।

যদি সত্যিই সেই গুণাবলী ও কামালাত খোদার জন্য খাস ছিল না এবং কোন মখলুকের বেলায় স্বীকার করাটা শিরক ছিল না, তাহলে নবী ও ওলীগণের বেলায় কেন শিরকের হুকুম জারী করলো? আর যদি ও সমস্ত গুণাবলী ও কামালাত যদি আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট ছিল এবং কোন মখলুকের বেলায় স্বীকার করাটা নিঃসন্দেহে শিরক ছিল, তাহলে নিজেদের ঘরের বুযুর্গদের বেলায় কেন জায়েয সাব্যস্ত করা হলো?

এসব প্রশ্নের উত্তরের জন্য আমি আপনাদের বিবেকের রায় কামনা করি। তাছাড়া এ ব্যাপারেও যদি কোন উত্তর থাকে, তাহলে বলুন যে যাদেরকে আপন মনে করা হয়েছে, ওদের ফযীলত ও কামালিয়াত প্রমাণ করার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করা হয়নি এবং যারা তাদের দৃষ্টিতে পর ছিল, ওনাদের বাস্তব মর্যাদা ও ফযীলত প্রকাশ করার বেলায়ও ওদের মনের কৃপণতাকে গোপন করতে পারেনি।

কিতাবের শেষ লাইন লিখতে গিয়ে আমি আনন্দ বোধ করছি যে, আমি স্বীয় জ্ঞান, অনুসন্ধান, ঈমান ও আকীদার নৈতিক দায়িত্ব পালন থেকে আজ মুক্ত হলাম।

আমি সাক্ষ্য প্রমাণ সহকারে আমার আবেদন জনতার আদালতে পেশ করলাম। রায় প্রদান করার সময় এ বিষয়টা খেয়াল রাখবেন যে, কবর থেকে হাশর পর্যন্ত কোন আদালতে যেন আপনাদের রায় বাতিল ঘোষিত না হয়।

আমাদের প্রকাশিত ও পরিবেশিত গ্রন্থাদি পড়ে ঈমান আক্বীদা মজবুত করুন

১। জা'আল হক	মুফ্‌তী আহমদ ইয়ার খান নঈমী
২। শানে হাবীবুর রহমান	"
৩। সালতানতে মুস্তাফা	"
৪। আউলীয়া কিরামের ওসীলায় খোদার রহমত	"
৫। দরসুল কুরআন	"
৬। অপব্যাখ্যার জবাব	"
৭। হযরত আমীরে মুয়াবিয়া (রাঃ)	"
৮। ইসলামী জিন্দেগী	"
৯। কনযুল ঈমান (তরজুমা কুরআন)	আলা হযরত শাহ আহমদ রেযা খান বেরলভী
১০। ঈমানের সঠিক বিশ্লেষণ	"
১১। মাতা-পিতার হক	"
১২। বাহারে শরীয়ত	মুফ্‌তী আমজাদ আলী
১৩। কানুনে শরীয়ত	মুফ্‌তী শামসুদ্দীন আহমদ রিজভী
১৪। কারবালা প্রান্তরে	আল্লামা শফি উকাড়বী
১৫। যলযালা	আল্লামা আরশাদুল কাদেরী
১৬। আমাদের প্রিয় নবী	আল্লামা আবেদ নিযামী
১৭। ইসলামের বাস্তব কাহিনী	আল্লামা আবুন-নূর-বশীর
১৮। যিয়ারতে আজমীর	অধ্যাপক লুৎফুর রহমান
১৯। ইসলাম ও গান বাজনা	মাওলানা নুরুল হক
২০। হামদে খোদা ও নাতে রসূল	মাওঃ মুহাম্মদ আলী

মুহাম্মদী কুতুব খানা

আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

ফোন ঃ ৬১৮৮৭৪

www.Facebook.com/Y.BICS

Www.Facebook.com/Hafezyusuf90

Www.Twitter.com/Aayqadri

Www.Instagram.com/Aayqadri

Www.Yqadri.tumblr.com

Www.Yqadri.blogspot.com

Www.Yqadri.WordPress.com